আমার দেখা পৃথিবী-৭

পৃথিবীর দেশে দেশে



শাইখুল ইসলাম

মুফতী মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

দামাত বারাকাতুহুম

আমার দেখা পৃথিবী-৭

পৃথিবীর দেশে দেশে

[ফিজি, ইরান, নিউজিল্যান্ড, সিরিয়া, কিরগিজিস্তান, আলবেনিয়া রাশিয়া, জাপান, ল্যাটিন আমেরিকা, তাজিকিস্তান, হিন্দুস্তান ও জর্দানের বিস্ময়কর সফরনামা]

মূল
শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, দাঈ, বহু কালজয়ী গ্রন্থের রচয়ীতা
ভাইস প্রেসিডেন্ট : ইসলামী ফিকহ্ একাডেমী, জেদ্দা, সৌদী আরব
শাইখুল হাদীস ও নায়েবে মুহতামিম : দারুল উলূম, করাচী

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
ইমাম ও খতীব: আহালিয়া জামে মসজিদ, উত্তরা, ঢাকা
মুহাদ্দিস: টঙ্গি দারুল উলূম মাদ্‌রাসা, টঙ্গী, গাজীপুর



মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েবসাইট: www.maktabatulashraf.net

Contents

আমার দেখা পৃথিবী-৭

পৃথিবীর দেশে দেশে

মূলঃ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

[অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান]

ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫

১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

প্রকাশকাল

যিলক্বদ ১৪৩৩ হিজরী

অক্টোবর ২০১২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ISBN: 978-984-8950-22-7

মূল্য ঃ একশত নব্বই টাকা মাত্র

PRITHIBIR DESHE DESHE

By: Shaikhul Islam Mufti Muhammad Taqi Usmani

Translated by: Maulana Muhammad Jalaluddin

Price: Tk. 190.00 US$ 10.00

ইনতেসাব

জগদ্বিখ্যাত মর্দে মুজাহিদ ইমাম শামেল রহ.-এর
জিহাদী স্মৃতির উদ্দেশ্যে।
যিনি নিজের কলজে ছেচাঁ লহুতে রচনা করেছেন
মিল্লাতের জিহাদী ইতিহাস।

\- প্রকাশক



প্রকাশকের কথা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন−

(অর্থ) তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর, অতঃপর দেখ যে, মিথ্যা সাব্যস্তকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছে। (নাহল : ৩৬)

বর্তমান যুগের পর্যটকদের মতো কেবলমাত্র বিনোদনের উদ্দেশ্যে আল্লাহওয়ালা কোন বুযুর্গ পৃথিবী ভ্রমণ করেননি। বরং তাঁরা ইলমে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষাদান, দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও জিহাদের জন্য পৃথিবীতে সফর করে উপোরক্ত আয়াতের উপর আমল করার প্রয়াস পেয়েছেন।

ঐ একই ধারাবাহিকতায় বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আলেম শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী (দামাত বারাকাতুহুম) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী সেমিনার, সভা ও মাহফিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রায় অর্ধশতাধিক দেশের অসংখ্য শহরে উপস্থিত হয়ে পথহারা মানুষকে দিয়েছেন পথের দিশা। এই নব্য জাহেলী যুগ-সৃষ্ট অনেক জটিল সমস্যার ইসলামী সমাধান পেশ করে মানবতাকে সিরাতে মুস্তাকীমের রাহনুমায়ী করেছেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন-

> “বিগত প্রায় বিশ বছর যাবত আমি ঠিকানাবিহীন পত্রের ন্যায় সফর করে চলছি। এ সকল সফরে অসংখ্য দেশ ও শহরের মাটি পায়ে লাগিয়েছি। তন্মধ্যে যে সকল সফরে উল্লেখযোগ্য জ্ঞানার্জন হয়েছে অথবা এ সুবাদে ইসলামী ইতিহাসের হারানো কোন অধ্যায় উল্টিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছে, তার বিবরণ ‘সফরনামা’ রূপে লিবিবদ্ধ করেছি। যার প্রথম খণ্ড বিশটি দেশের সফরনামা ‘জাহানে দীদাহ্’ নামে প্রকাশিত হয়েছে এবং আমার ধারণাতীত পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেছে। এরপরও আমার সফরের ধারা

> অব্যাহত রয়েছে এবং এখনো সফরেই আছি। সফরনামার প্রথম খণ্ড 'জাহানে দীদাহ্' প্রকাশিত হওয়ার পরও আমার অনেক দেশ সফর করা হয়েছে সেগুলোর বিবরণও লিপিবদ্ধ করেছি এবং তা 'দুন্ইয়া মেরে আগে' নামে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে আপনাদের হাতে যে কিতাব তা মূলতঃ এ সফরনামার তৃতীয় খণ্ড 'সফর দর সফর'।
>
> দু'আ করি আল্লাহ পাক এই কিতাবকে পাঠকদের জন্য উপকারী বানান। আমীন।"

হযরতের বর্তমান এ সফরনামাটি তেরটি দেশের সফরের কাহিনী সমন্বয়ে রচিত। বর্তমান সফরনামাটি পূর্বোক্ত সফরনামার চেয়েও আকর্ষণীয়। কারণ এ গ্রন্থে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবাররুকাতসহ কিছু স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত দেশের সফরকাহিনী এবং সেখানের বিরল, বিচিত্র ও বিস্ময়কর ইলমী ব্যক্তিত্বের অবস্থা ও ঘটনার বিবরণ এসেছে যা পাঠ করে পাঠকমাত্রই পুলকিত ও বিস্মিত হয়ে আল্লাহপাকের অপূর্ব কুদরতের স্বীকৃতি স্বরূপ বলে উঠবেন 'সুবহানাল্লাহ'।

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী কিতাবটি ত্রুটিমুক্ত ও সুন্দর করার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া বিচিত্র নয়। বিশেষতঃ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জায়গা, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। এ ধরনের ত্রুটি যদি কারো দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে তা আমাদেরকে অবগত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে দিবো ইনশাআল্লাহ।

বইটির প্রকাশনার ক্ষেত্রে যারা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহপাক তাদের সবাইকে জাযায়ে খায়র দান করুন। আমীন।

তারিখ
১৪ যিলক্বদ ১৪৩৩ হিজরী
১ অক্টোবর ২০১২ ঈসায়ী

বিনীত
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
৭ এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

প্রথম কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ইহজগতের পুরো জীবনটাই মূলত একটি সফর। এটি এমন একটি সফর, যার শেষ কারো জানা নেই। জীবনের এ সফরের মাঝে ছোট ছোট যে সব সফর হয়, সেগুলোকে 'সফর দর সফর' বা 'সফরের মাঝে সফর' বলাই বাঞ্ছনীয়। এ কারণে আমি আমার ভ্রমণবৃত্তান্তের এ নতুন সংকলনের নাম 'সফর দর সফর' বা 'সফরের মাঝে সফর' রেখেছি। ইতিপূর্বে 'জাহানে দীদাহ' ও 'দুনিয়া মেরে আগে' নামে আমার আরো দু'টি ভ্রমণকাহিনী ছেপে বের হয়েছে। আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে সেগুলো অত্যন্ত পাঠক সমাদৃত হয়েছে। এর পরে আরো অনেক দেশের সফরনামা লেখার সুযোগ হয়েছে এবং যথাসময়ে সেগুলো 'মাসিক আল বালাগে' প্রকাশিতও হয়েছে। এখন সেগুলোর সংকলন পাঠক সমীপে পেশ করা হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা আমাকে কোন না কোন কাজের সূত্রে ছয় মহাদেশেই যাওয়ার সুযোগ দান করেছেন। তার মধ্যের অনেক দেশের সফরনামা এ কারণে লেখা হয়নি যে, সফরনামা লেখার জন্যে আমি সে সব দেশকেই মনোনীত করেছি, যেগুলোর সফরনামা ইসলামের ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বগণের উপর আলোকপাত করার একটি উপলক্ষ্য হয়। কিংবা তার মাধ্যমে পাঠক মহোদয় কল্যাণকর কিছু তথ্য-উপাত্ত জানার সুযোগ লাভ করেন। যে সব ক্ষেত্রে এ ধরনের বিশেষ কোন ফায়দা বুঝে আসেনি, সে সব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আমার ব্যক্তিগত ঘটনাবলী বর্ণনা করার জন্যে সফরনামা লেখার কোন আগ্রহ আমার মধ্যে পাইনি। তবে কিছু দেশ এমনও রয়েছে, যেগুলোর সফরনামা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যস্ততার কারণে লিখতে পারিনি। যেমন, উজবেকিস্তানের সফরে যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থানে যাওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে, সেগুলোর উপর আলোচনা করার আগ্রহ ছিলো, কিন্তু সে সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তবে সবচেয়ে

বড়ো আক্ষেপের কথা হলো, 'হিজাযে মুকাদ্দাসে'র সফরনামা- যা অন্য যে কোন সফরনামার আগে লেখা উচিৎ ছিলো- তা থেকে আমি বঞ্চিত রয়েছি। 'জাহানে দীদাহ'র শুরুতে তার কারণ আমি উল্লেখ করেছি।

যাইহোক, এটা আমার সফরনামার তৃতীয় সংকলন, যার মধ্যে সিরিয়া, ইরান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান, আলবেনিয়া, রাশিয়া, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ফিজি, আয়ার ল্যান্ড ও সব শেষে ভারতের সফরনামা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আশা করি এ সংকলনটিও আগ্রহী পাঠকমহলে সমাদৃত হবে এবং এর দ্বারা তারা উপকৃত হবেন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

বিনীত
বান্দা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
জামেয়া দারুল উলূম করাচী
৬ জিলহজ ১৪৩১ হিজরী

পৃথিবীর দেশে দেশে

[ফিজি, ইরান, নিউজিল্যান্ড, সিরিয়া, কিরগিজিস্তান
আলবেনিয়া, রাশিয়া, জাপান, ল্যাটিন আমেরিকা
তাজিকিস্তান, হিন্দুস্তান ও জর্দানের
বিস্ময়কর সফরনামা]

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচীপত্র

Contents

Contents

জাপানে দশদিন (১৬৩-১৮২)

ল্যাটিন আমেরিকার সফর (১৮৩-২১৩)

তাজিকিস্তান সফর (২১৫-২৪২)

হিন্দুস্তান সফর (২৪৩-২৮৮)

সূর্যোদয়ের দেশ ফিজিতে

(জানুয়ারী, ২০০৫ ঈসায়ী, যিলহজ ১৪২৫ হিজরী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، والصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وعلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পৃথিবীর মানচিত্রে দৃষ্টি দিলে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের একেবারে পূর্বপ্রান্তে নিউজিল্যান্ড থেকে কিছুটা উত্তরদিকে ছোট একটি বিন্দু চোখে পড়ে, এটাই 'ফিজি'। এটা পৃথিবীর একমাত্র বসতিপূর্ণ অঞ্চল যা International Date Line বা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার উপর অবস্থিত। পৃথিবীতে এখানেই প্রতিদিন সর্বপ্রথম সূর্য উদিত হয়। ছোট-বড়ো তিন শতাধিক দ্বীপসমন্বিত সুদৃশ্য এ দেশটির এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ। প্রায় আট লক্ষ অধিবাসির এ দেশে ষাট হাজারের মতো মুসলমানও বাস করেন। গত বছর আমি যখন দ্বিতীয়বার অস্ট্রেলিয়া যাই, তখন ফিজির মুসলমানগণ আমাকে ফিজিতে আসার জন্যেও দাওয়াত করেন। কিন্তু অনেকগুলো কারণে তখন আমি সেখানে সফর করতে পারিনি।

প্রায় ছয় মাস পূর্বে ফিজির 'লাম্বাসা' শহর থেকে মাওলানা গোফরান সাহেব অত্যন্ত মর্মস্পর্শী একটি পত্র লেখেন। তাতে তিনি পৃথিবীর দূর প্রান্তে অবস্থিত এ দেশটির বিভিন্ন অবস্থা তুলে ধরেন এবং কেমন প্রতিকূল পরিবেশে তাঁরা একটি দ্বীনী মাদরাসা সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছেন তাও উল্লেখ করেন। আল্লাহর মেহেরবানিতে মাদরাসাটি উন্নতির ধাপসমূহ অতিক্রম করতে করতে এখন এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, ১৪২৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষের শাওয়াল মাস থেকে 'দাওরায়ে হাদীসে'র শিক্ষা দান আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক ও ব্যবস্থাপকগণের সম্মিলিত বাসনা, তারা আমার মাধ্যমে 'দাওরায়ে হাদীসে'র পাঠদান আরম্ভ করাবেন। এ বিষয়টির পুরোপুরি

উপলব্ধি আমার ছিলো যে, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলোতে প্রয়োজন সত্ত্বেও নিয়মতান্ত্রিক কোন মাদরাসা নেই। এ সমস্ত অঞ্চলে যোগ্য আলেমের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। এ সমস্ত দেশের যে কোন জায়গায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হওয়া অনেক বড়ো নেয়ামত। যাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো উচিৎ। সে প্রেক্ষিতে আমি তাঁদের দাওয়াত কবুল করি। বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে সফরের তারিখ পরিবর্তন হতে থাকে। অবশেষে আমি ২০০৫ ঈসায়ীর ৬ ও ৭ই জানুয়ারীর মধ্যবর্তী রাত একটার সময় ক্যাথে প্যাসিফিক (Cathay Pacific) এয়ারলাইনসযোগে দীর্ঘ এ সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। এ পর্যন্ত আমি অনেক লম্বা লম্বা সফর করেছি, কিন্তু এটি ছিলো আমার আকাশ পথের দীর্ঘতম বিরতিহীন সফর। রাত একটার সময় রওয়ানা হয়ে ভোর ছয়টার কাছাকাছি বিমান ব্যাংকক পৌঁছে। সেখান থেকে যাত্রা করে সাড়ে বারোটার সময় হংকংয়ের বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সেখানে দু' ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর একই এয়ারলাইনসের অপর একটি বিমানে আরোহণ করে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এটি বিশাল-বিস্তৃত এবং আধুনিক সবধরনের সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত সুন্দর একটি বিমানবন্দর। তাপমাত্রা এখানে শূন্য ডিগ্রীতে নেমে এসেছিলো। এখানের দু' ঘণ্টার অপেক্ষাকালে আমরা প্রথমে মাগরিব এবং পরে ইশার নামায আদায় করি। এখান থেকে কোরিয়ান এয়ারলাইনসে আরোহণ করি। এটি ছিলো দশ ঘণ্টাব্যাপী এবারের আকাশ পথের দীর্ঘতম ভ্রমণ। বিমান সারা রাত প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে উড়তে থাকে এবং সকাল নয়টায় ফিজির আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর 'নাদি'তে অবতরণ করে। ফিজি বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত। তাই ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে এখানে গ্রীষ্মকাল। সিউল পর্যন্ত ছিলো ভীষণ শীত, আর এখানে নামতেই প্রচন্ড গরম অনুভূত হয়।

মাওলানা গোফরান সাহেব ও তাঁর সঙ্গীগণ স্বাগত জানানোর জন্যে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। পঁচিশ ঘণ্টার অধিক সময় ধরে আমার সফর অব্যাহত ছিলো। তদুপরি সফর তখনো বাকি ছিলো। কারণ, ফিজির 'লাম্বাসা' নামক অপর একটি শহর ছিলো আমাদের গন্তব্য। আজ জুমার দিন। জুমার নামাযের পর লাম্বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো। মধ্যবর্তী এ সময়টুকু আমার একান্ত প্রিয় বন্ধু আসেফ সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করি। আসেফ সাহেব পাকিস্তানের লোক। তিন বছর ধরে ফিজিতে গাড়ির ব্যবসার সাথে জড়িত আছেন। দ্বীনী জযবার কারণে তিনি দ্বীনদার মহলে সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। এ পুরো সফরে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে আমার আরামের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। জুমার নামাযের পর আমরা

তাড়াতাড়ি বিমান বন্দরে চলে যাই। সোয়া দু'টার সময় ফিজি এয়ারের ছোট একটি বিমানে আধা ঘণ্টা ওড়ার পর রাজধানী 'সুভা'র বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এখানে লাম্বাসাগামী বিমানের জন্যে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। দুই রাতের নির্ঘুম ও দীর্ঘ সফরের ফলে প্রতীক্ষার এ দুই ঘণ্টা সময় প্রায় অসহ্য মনে হচ্ছিলো। তাই আসেফ সাহেব তাঁর সুভার অফিস থেকে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি আনিয়ে পার্কিংয়ে দাঁড় করিয়ে দেন। গাড়ির সীটে প্রায় দেড় ঘণ্টা ঘুমানোর সুযোগ পাই। বিমানে আরোহণের সময় হতে হতে শরীর অনেকটা চাঙ্গা হয়ে উঠে। সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে ফিজির সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা মোনাসেব মনে করছি।

ফিজি ছোট-বড়ো তিন শ' ছত্রিশটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ। সেগুলোর অধিকাংশ দ্বীপ খুবই ছোট এবং জনবসতিশূন্য। তবে দু'টি দ্বীপ অনেক বড়ো। দেশের অধিকাংশ বড়ো শহর এ দ্বীপদু'টিতেই অবস্থিত। সবচেয়ে বড়ো দ্বীপ হলো 'ভিটি' (Viti)। রাজধানী সুভা (Suva) এর মধ্যেই অবস্থিত। এর দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর 'নাদি'(Nadi)। লিখতে 'নাদি' লেখা হলেও স্থানীয় লোকেরা এর উচ্চারণ করে 'ছানিদি'।

'নাদি'তে বিশাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। তাই সারা দুনিয়া থেকে আগত অধিকাংশ লোকই 'নাদি'তে এসে অবতরণ করে যা রাজধানী হতে ১৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ হলো 'ভেনুয়া' (Vanua)। এ দ্বীপের সবচেয়ে বড়ো শহর 'লাম্বাসা'। এখানেই ফিজির পর্যটন শহর 'সাভুসাভু' অবস্থিত। ফিজির দ্বীপগুলোতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে যে জাতি বাস করে আসছে তাদেরকে 'কাভিতি' বলা হয়। প্রসিদ্ধ আছে যে, এরা আফ্রিকার টাঙ্গানিকা (বর্তমান কেনিয়া) থেকে এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করে। কতক ঐতিহাসিক বলেন, তারা ইন্দোনেশিয়া থেকে এখানে এসেছিলো। আর বাস্তবেও তাদের দৈহিক গঠন ও আকার-আকৃতির মধ্যে আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া উভয়টির সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। ইংরেজদের ভাষ্য হলো, এরা ছিলো বন্য ও মানুষখেকো জাতি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা এখানে এসে দ্বীপগুলো জয় করে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করে।

কাভিতি সম্প্রদায়ের অনেক আচার-অভ্যাসের ভিত্তিতে ধারণা হয় যে, হয়তো তাদের পূর্বপুরুষ একসময় মুসলমান ছিলো। তারা মাটিতে দস্তরখান বিছিয়ে খাবার খায়। তাদের জামার ঝুল মধ্য-গোছা পর্যন্ত প্রলম্বিত। শুরুর দিকে তারা তপন পরতো, এখন পুরুষরাও স্কার্ট জাতীয় এক ধরনের পোষাক পরে। তবে তা গোছার মাঝ বরাবর হয়ে থাকে। তাছাড়া এরা খুব

—২

অতিথীবৎসল। কেউ তাদের কাছে কিছু চেয়ে বসলে তারা তা দিতে অস্বীকার করাকে দোষণীয় মনে করে। মোটকথা, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এখানকার মুসলমানগণ ধারণা করেন যে, এরা শুরুর দিকে মুসলমান ছিলো। সঠিক অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক অবগত।

১৯৯৬ সনের আদমশুমারী মতে এদেশের জনসংখ্যা ছিলো সাত লক্ষ বাহাত্তর হাজার ছয় শ' পঞ্চান্ন। যা এখন নিশ্চয়ই আট লাখ অতিক্রম করেছে। বর্তমানে মোট জনসংখ্যার ৬.৪৭ শতাংশ হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভূত। তাদের অধিক সংখ্যক হিন্দু। প্রায় ষাট হাজার লোক মুসলমান। হিন্দুস্তানী বংশোদ্ভূত এ লোকদেরকে প্রথমে যেভাবে এখানে আনা হয় তা ইংরেজ আধিপত্যবাদের বর্বরতার এক জঘণ্য দৃষ্টান্ত। যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা এ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে, তখন তারা বুঝতে পারে যে, এ অঞ্চল নারকেল ও আখ চাষের জন্যে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু স্থানীয় লোকদের এধরনের চাষাবাদের অভিজ্ঞতা ছিলো না। তাই তৎকালীন ইংরেজ সরকারের মনে ভারত থেকে (যা তখন ইংরেজদেরই উপনিবেশ ছিলো) অভিজ্ঞ কৃষকদের এখানে নিয়ে আসার চিন্তা জাগে। সে মতে গরিব হিন্দুস্তানীদেরকে ফিজি পাঠানোর এক অভিযান মাদ্রাজ, কেরালা, বাংলা ও ইউপিতে আরম্ভ হয়। হিন্দুস্তানী কৃষকদেরকে এ কথা বলে ধোঁকা দেওয়া হয় যে, তাদেরকে ভালো বেতনে চাকুরি দেওয়ার জন্যে কলকাতা থেকে অল্প দূরের একটি দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে তাদের দ্বারা হালকা-পাতলা কাজ নিয়ে ভালো বেতন দেওয়া হবে। গরিব হিন্দুস্তানী লোকগুলো ধোঁকায় পড়ে তাদের সাথে যেতে সম্মত হয়। জাহাজে আরোহণ করার পর তারা জানতে পারে যে, তাদেরকে হাজার হাজার মাইল দূরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদেরকে জাহাজে মানবেতর অবস্থায় রাখা হয়। সমুদ্রের লবনাক্ত পানি দ্বারা খাবার তৈরী করা হতো। চাউলের মধ্যে পোকা থাকতো। থাকার জায়গা ছিলো খুবই সংকীর্ণ। অনেকে পথের মধ্যেই মারা যায়। অবশিষ্টরা নানা রকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ফিজি পৌঁছে। ফিজিতে তাদেরকে পশুর খোয়াড়ের মতো ক্যাম্পে রাখা হয়। সত্তর বর্গফুটের একেকটি কক্ষে কয়েকজন করে লোককে একত্রে রাখা হয়। সে সব কক্ষে বাতাস প্রবেশ করতে পারতো না। তাদের দ্বারা ভোর পাঁচটা থেকে অনেক রাত পর্যন্ত অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ নেয়া হতো। কাজের ফাঁকে বিশ্রামের জন্যে কেউ সামান্য সময় হাত গুটিয়ে নিলে ইংরেজ ওভারসেজ তাকে বেত্রাঘাত করতো। শুধুমাত্র সে সমস্ত নারীকে কিছুটা ছাড় দেয়া হতো, যারা ঐ ওভারসিজদের কুবাসনা পূরণ করার জন্যে নিজেদের মান-সম্ভ্রম বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হতো। অনেক হিন্দুস্তানী- যাদেরকে ফিজির ইংরেজ গভর্ণর 'কুলি' বলতো- এ সমস্ত জুলুম-অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর

কোলে ঢলে পড়ে। অনেকে আত্মহত্যা করে। আজ ফিজির দ্বীপগুলোতে পদে পদে অসংখ্য নারকেল গাছের যে ঘণ ও নিবিষ্ট সারি দেখা যায়- যার উপর ফিজির অর্থনীতি বিরাট অংশে নির্ভরশীল- তা সে অসহায় হিন্দুস্তানীদের রক্ত ও ঘাম দ্বারা সঞ্জীবিত হয়েছে। তারা এখানে অনেক বছর যাবৎ মানবেতর দাসত্বের জীবন যাপন করে। হিন্দুস্তানীদের এখানে আগমন এবং তাদের দাসত্বকালের বিস্তারিত এ বিবরণ ফিজির এক ঐতিহাসিক কিম গ্রাভেল (Kim Gravelle) তার 'ফিজির উত্তরাধিকার' (Fiji's Herritage) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বইটি নাদি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

যাইহোক, ফিজিতে হিন্দুস্তানীদের আগমন ঘটে এভাবে। ফিজির ভূমি যখন নারকেলবাগান ও আঁখক্ষেত দ্বারা সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে, তখন হিন্দুস্তানী এ লোকগুলো সেখানের অধিবাসী হয়ে যায়। তাদের দাসত্বের জীবনের ইতি ঘটে। এখানে তারা সম্মানজনক জীবিকা খুঁজে নেয়। যখন এরা কিছুটা সচ্ছল হয়ে ওঠে, তখন ব্যবসা ও চাকুরীর উদ্দেশ্যে হিন্দুস্তান থেকে অনেকে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। এভাবে এখানকার মোট জনসংখ্যার ৪৬%-এর অধিক অধিবাসী সেই হিন্দুস্তানীদের। তাদের মধ্যে বহু সংখ্যক মুসলমানও ছিলেন। তাদের মাধ্যমে এ অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম পরিচিত হয়ে ওঠে। শুরুতে যে সকল মুসলমান এখানে এসেছিলেন, তারা মোটামুটিভাবে নামায, রোযা, আমল-আখলাক এবং ইসলামের নিদর্শন ও প্রতীকসমূহের অনুগামী ছিলেন। এখানে তারা মসজিদও নির্মাণ করেন। কিন্তু নতুন প্রজন্মের জন্যে তা'লীম-তারবিয়াতের কোন ব্যবস্থা ছিলো না, অপরদিকে হিন্দু, খ্রিস্টান ও শিখদের সংগে মেলামেশা ছিলো অবাধ। ফলে ইসলামী ঐতিহ্য ক্রমান্বয়ে ম্লান হয়ে আসে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাবলীগ জামাতকে এখানে দ্বীনের পুনরুজ্জীবনের মাধ্যম বানান। সর্ব প্রথম জাম্বিয়া থেকে একটি জামাত (সম্ভবত ১৯৬৭ ঈসায়ীতে) এখানে আসে। তারা মানুষের মধ্যে দ্বীনের দিকে প্রত্যাবর্তনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এভাবে মানুষ তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। আরো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মসজিদগুলোতে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে মকতব প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি আল্লাহর মেহেরবানিতে এখন সারা দেশে গুরুত্বের সাথে ধর্মীয় তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

লাম্বাসায়

বিকাল সাড়ে চারটায় ফিজি এয়ারের ছোট একটি বিমান আমাদেরকে সুভা থেকে লাম্বাসা নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ফিজির দ্বীপগুলোকে আল্লাহ তাআলা অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। উপর থেকে নিচের দিকে তাকালে দেশটিকে সবুজ-শ্যামলিমা ও ফুল-মালঞ্চে পরিপূর্ণ দৃষ্টিগোচর

হয়। কয়েক মুহূর্তেই বিমান 'ভিটি' দ্বীপ অতিক্রম করে সমুদ্রে প্রবেশ করে। প্রশান্ত মহাসাগরের এ অঞ্চলটি ছোট ছোট সবুজ-শ্যামল দ্বীপে পরিপূর্ণ। সাগর-বুকের ডুবো পাহাড়গুলো (Reefs) এর সৌন্দর্য বহু গুণ বৃদ্ধি করেছে। নানা রংয়ের পাথরে এগুলো পরিপূর্ণ। পাহাড়গুলো সমুদ্রের তলদেশ থেকে অনেক উঁচুতে হওয়ার ফলে স্বচ্ছ পানির নিচে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। এ সব পাহাড়ে অনেক দামী দামী পাথরও পাওয়া যায়। যা ফিজির শিল্প ও বানিজ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। দামী দামী পাথরের বিচিত্র রং পানির উপর বিচ্ছুরিত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে বিমান নিচ দিয়ে উড়ে গেলে সে দৃশ্য খুবই মনোরম মনে হয়। প্রায় চল্লিশ মিনিটের আকাশ পথের এ সফর ছিলো অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর। পাঁচটার পর আমরা লাম্বাসার ছোট্ট বিমান বন্দরে অবতরণ করি। এটি ফিজির দ্বিতীয় বৃহত্তম দ্বীপ ভেনুয়ার সব চেয়ে বড়ো শহর। তাকে ইংরেজিতে (Labasa) লেখা হয়, কিন্তু উচ্চারণ করা হয় 'লাম্বাসা'। হিন্দুস্তানীরা বলেন যে, বাস্তবেও শহরটি 'লম্বাসা'। অর্থাৎ, শহরটি চওড়ার তুলনায় লম্বা অধিক। সবুজ পাহাড়ে পরিবেষ্টিত এ শহরটি বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে ওখানকার তুলনায় বসতি কম হওয়ার ফলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও প্রশস্ত। এ শহরেই সেই ইসলামিয়া আরাবিয়া মাদরাসা অবস্থিত, যেখানে 'দাওরায়ে হাদীসে'র উদ্বোধনের জন্যে আমাকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। মাদরাসাটি শহরের সুন্দরতম কেন্দ্রীয় মসজিদের সীমানায় অবস্থিত। লাম্বাসা মুসলিমলীগের তত্ত্বাবধানে আগে থেকেই এখানে মক্তব চালু ছিলো। কয়েক বছর পূর্বে বাংলাদেশের মাওলানা গোফরান সাহেবকে দাওয়াত করে এখানে আনা হয়। তিনি জামেয়াতুল উলূমিল উসলামিয়া বিন্নুরী টাউন থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে একটি নিয়মতান্ত্রিক মাদারাসা প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করেন। তিনিই বাংলাদেশ থেকে মাওলানা জাফর সাহেব ও মাওলানা কামরুয্যামান সাহেবকে এনে এখানে ইসলামী উলূমের মানসম্পন্ন তালীমের ব্যবস্থা করেন। মাশাআল্লাহ, তাঁদের দেখে খুবই আনন্দিত হই। কারণ, তাঁরা তিনজনই সুযোগ্য ও পারদর্শী উস্তায। যাঁরা চরম প্রতিকুল পরিবেশে শিশুদের উপর মেহনত করে তাদেরকে মানসম্পন্ন দ্বীনী তালীম দ্বারা গড়ে তোলার প্রশংসনীয় খেদমত আনজাম দিচ্ছেন। আমি ছাত্রদের পর্যবেক্ষণ করে উস্তাযদের শ্রম-সাধনা অনুধাবন করতে সক্ষম হই। শিক্ষক-স্বল্পতার কারণে তাঁদেরকে দিন-রাত ছাত্রদের তালীম-তারবিয়ত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁদের মেহনতের নগদ পুরস্কার এই দিয়েছেন যে, এ মাদরাসা থেকে বহু সংখ্যক হাফেয তৈরী হয়েছে এবং আরবী ও ইসলামী ইলমের তালিবে ইলমদের একটি জামাত 'দাওরায়ে হাদীসে'র জন্যে গড়ে উঠেছে।

৮ জানুয়ারী আছরের নামাযের পর থেকে নিয়ে ইশা পর্যন্ত দাওরায়ে হাদীসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ঘোষণা হয়েছিলো। এ দেশের মুসলমানগণ দূর-দূরান্ত থেকে দলে দলে এসে সমাবেশে অংশ গ্রহণ করেন। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত উপস্থিত লোকদের সামনে মাদরাসার তালিবে ইলমদের আকর্ষণীয় শিক্ষা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। মাগরিব নামাযের পর এ বান্দার সামনে দাওরায়ে হাদীস সহ প্রত্যেক শ্রেণীর এক একটি কিতাব থেকে পাঠ করে সবক উদ্বোধন করা হয়। সকল ছাত্র কিতাব থেকে বিশুদ্ধভাবে পাঠ করে। তারপর প্রায় দেড় ঘণ্টা আমি আমার বক্তব্য পেশ করি। উপস্থিত লোকেরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করেন। পরে এখানকার লোকেরা বলে যে, লাম্বাসায় সম্ভবত মুসলমানদের এতো বড়ো সমাবেশ ইতিপূর্বে আর কখনো হয়নি। শ্রোতাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত লোকও উপস্থিত ছিলেন। তাদের কেউ কেউ এ অভিব্যক্তি জানান যে, তাদের মাথায় বহুদিন ধরে যে সমস্ত প্রশ্ন ও সংশয় ঘুরপাক খাচ্ছিলো, আল্লাহর মেহেরবানিতে তার অনেকগুলোর উত্তর তারা পেয়েছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এ অঞ্চলে (অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডসহ) দ্বীনী ইলম শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ কোন প্রতিষ্ঠান নেই। তাই এ মাদরাসায় দাওরায়ে হাদীসের তালীমের এ সূচনা নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। যার দ্বারা এ অঞ্চলের মুসলমানদের ইনশা আল্লাহ অনেক উপকার হওয়ার আশা রয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ মাদরাসাকে আরো উন্নতি দান করুন। এখান থেকে দ্বীনের সত্যিকারের খাদেম তৈরী করুন, যারা এ অঞ্চলের দ্বীনী প্রয়োজনসমূহ পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন। আমীন।

৯ জানুয়ারী রবিবার দিনও লাম্বাসাতেই অতিবাহিত হয়। সেদিন মহিলাদের বড়ো একটি সমাবেশে বয়ান হয়। মাদরাসার উস্তায-ছাত্রদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠক হয়। মাদরাসার নেসাব ও নেযাম নিয়েও পরামর্শ হয়।

আমাদের মেযবানগণ ১০ জানুয়ারী সোমবার দিনের প্রোগ্রাম এমনভাবে বিন্যস্ত করেছিলেন, যেন এদিন ফিজির বিভিন্ন শহরে ওয়াযের মজলিসও হয় এবং এখানকার দর্শনীয় জায়গাসমূহের ভ্রমণও হয়। সেগুলোর মধ্যে International Date Line বা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আমরা ফজরের নামাযের পর তাড়াতাড়ি সড়কপথে ভেনুয়া দ্বীপের আরেকটি শহর 'সাভুসাভু'র (Savusavu) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। শহরটি লাম্বাসার দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় নব্বই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পুরো পথটি অত্যাধিক সবুজ-শ্যামল ও সুদৃশ্য পাহাড়সমূহের উপর দিয়ে চড়াই-উৎরাই পার হয়ে চলে গেছে। সবুজ গাছপালা ও ফুল দ্বারা পরিপূর্ণ বনসমূহ দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে

আছে। আমের গাছ এখানে নিজে নিজেই জন্মায়। জানুয়ারী এখানে গরম কাল। যে কারণে এসব গাছ ছিলো আমে পরিপূর্ণ। নারকেল ও দেবদারু গাছ পাহাড়ের উপর সিঁড়ির ধাপের মতো দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। নানা প্রকার ফল ও ফুল দ্বারা পাহাড়-মধ্যবর্তী উপত্যকাসমূহ ছিলো পরিপূর্ণ। এখানকার মওসুমও ছিলো তুলনামূলক ঠান্ডা। হালকা বৃষ্টিপাত পরিবেশকে অধিক সুন্দর করে তুলেছিলো। এভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টার সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর সফরের পর আমরা দ্বীপের উপকূলীয় শহর 'সাভুসাভু' পৌঁছি। এটি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের ছোট একটি শহর। যার দু' দিকে রয়েছে সবুজ-শ্যামল পাহাড়, অপর দু' দিকে রয়েছে সমুদ্রোপকূল। ছোট একটি সমুদ্রবন্দরও রয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে ফিজিতে এটি পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণের জায়গা। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলামানের বাসও রয়েছে। একটি মসজিদও রয়েছে। আজ আছরের নামাযের পর এ মসজিদে আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। কিন্তু সকাল বেলা এখান থেকে বিমানযোগে 'তাভিউনি' (Taveuni) নামক আরেকটি দ্বীপে যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিলো। যেখানে International Date Line (আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা) অবস্থিত। বিমান আরো কিছুক্ষণ পর রওয়ানা করবে। তাই লাম্বাসা লীগের সভাপতি জনাব আযীয সাহেব- যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন- এ অবসরে আমাদেরকে সাভুসাভুর সুদৃশ্য উপকূলীয় অঞ্চল ঘুরিয়ে দেখান।

নয়টার দিকে আমরা বিমানবন্দর পৌঁছি। বিমানবন্দরটি খুবই ছোট। লাউঞ্জের পরিবর্তে এখানে বাসটার্মিনালের মতো বেঞ্চ বসানো রয়েছে। তবে পরিবেশ ছিলো পরিচ্ছন্ন। ছোট একটি বিমান আমাদেরকে নিয়ে রওয়ানা হয়। সমুদ্রের উপর দিয়ে মাত্র পনেরো মিনিটে তাভিউনি দ্বীপে পৌঁছে। এখান থেকে আমরা গাড়িতে সমুদ্রের তীর ধরে অনেক দূর যাওয়ার পর International Date Line (আন্তর্জাতিক তারিখ রেখায়) পৌঁছি।

International Date Line (আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা)

Date Line টি ঠিক একশ' আশি দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখানে দু'টি বোর্ড এমনভাবে বসানো আছে যে, উভয়ের মধ্যে আধা ইঞ্চি জায়গা খালি রয়েছে। এ খালি জায়গাটিই 'Date Line' (তারিখ রেখা)। আজ তারিখ রেখার বাম দিকে ছিলো রবিবার, আর ডান দিকে ছিলো শনিবার। বোর্ডে লেখা ছিলো যে, আপনি যদি ডান পা ডান বোর্ড বরাবর এবং বাম পা বাম বোর্ড বরাবর রেখে দাঁড়ান, তাহলে একই সংগে আপনি দুই দিনে অবস্থান করবেন। ডান পা থাকবে গত কাল শনিবারে, আর বাম পা থাকবে আজ রবিবারে।

যারা ভৌগলিক এ তথ্যের সাথে পরিচিত নন, তাদের বোঝার জন্যে বলছি যে, পৃথিবী গোল হওয়ার কারণে সূর্য সব সময় কোথাও উদিত হচ্ছে, তো

কোথাও অস্ত যাচ্ছে। তাই পৃথিবীর সব ভূ খন্ডে দিন ও তারিখের সূচনা এক সময়ে হওয়া সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেক ভূ খন্ডে পৃথক পৃথক সময়ে দিনের সূচনা হয়ে থাকে। তবে সারা পৃথিবীতে দিন, তারিখ ও সময় একভাবে নির্ধারণের জন্যে আন্তর্জাতিকভাবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর গ্লোবটাকে তিনশ' ষাটটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি অংশকে এক ডিগ্রী বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে এ সমস্ত ডিগ্রী নির্ধারণের জন্যে পৃথিবীর পুরো গ্লোবের উপর দিয়ে একটি রেখা টানা হয়েছে। একে দ্রাঘিমাংশ বলা হয়। এই রেখার সূচনা হয় বৃটেনের গ্রীণীচ থেকে। যা শূন্য দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এখান থেকে পূর্ব দিকে একশ' আশি ডিগ্রিতে গিয়ে পৃথিবীর অর্ধেক অংশ পূর্ণ হয়। অপর দিকে পশ্চিমে একশ' আশি ডিগ্রীতে গিয়ে পূর্ণ হয় দ্বিতীয় অর্ধেকাংশ। পৃথিবী গোলাকার হওয়ার কারণে এভাবে একশ' আশি দ্রাঘিমাংশে গিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের রেখাসমূহ এক হয়ে যায়।

সূর্য যেহেতু পূর্ব থেকে পশ্চিমদিকে সব সময় ভ্রমণরত থাকে, এ কারণে সারা পৃথিবীতে এভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যে, গ্রীণীচে (শূন্য দ্রাঘিমাংশে) যে সময় থাকে, পূর্ব দিকে দ্রাঘিমাংশের প্রত্যেক পনেরো ডিগ্রী পর সময় তার চেয়ে এক ঘণ্টা কমে যায়। আর পশ্চিম দিকে প্রত্যেক পনেরো ডিগ্রী পর এক ঘণ্টা বেড়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ, গ্রীণীচে যদি রাত বারোটা বেজে থাকে তাহলে পূর্বে পনেরো ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে এগারোটা বাজবে এবং পশ্চিমে পনেরো ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে বাজবে একটা। এভাবে পূর্ব দিকে একশ' আশি ডিগ্রীতে গিয়ে গ্রীণীচের সময় থেকে বারো ঘণ্টা কমে যাবে এবং পশ্চিম দিকে একশ' আশি ডিগ্রীতে গিয়ে বারো ঘণ্টা বেড়ে যাবে। পৃথিবী যেহেতু গোলাকার, তাই উভয় দিক থেকে একশ' আশি ডিগ্রী এক জায়গায় গিয়ে এক হয়ে যায়। এভাবে পূর্বের শেষ বিন্দু এবং পশ্চিমের শেষ বিন্দুতে এসে সময়ের ব্যবধান হয়ে যায় পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা। অর্থাৎ এখানে এসে দিন পরিবর্তিত হয়ে যায়।

আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম ঠিক এক শ' আশি দ্রাঘিমাংশ ডিগ্রীর রেখার উপর। এখানে এসে পূর্ব ও পশ্চিমের দ্রাঘিমাংশের রেখাসমূহ এক হয়ে গেছে। এভাবে পূর্ব দিকের একশ' আশি ডিগ্রী এবং পশ্চিম দিকের একশ' আশি ডিগ্রীর মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। যে কারণে পূর্বদিকে ছিলো একদিন কম, আর পশ্চিমদিকে ছিলো একদিন বেশি। যে রেখাটি পূর্ব ও পশ্চিম দিকের রেখাসমূহকে পৃথক করে, তাকে 'International Date Line' (আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা) বলা হয়। এ তারিখ রেখার অধিকাংশটাই সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে গেছে, কিংবা গেছে সাইবেরিয়া ও এন্টার্কটিকার উপর দিয়ে, যেগুলোর বেশিরভাগই জনবসতিশূন্য। জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলসমূহের মধ্যে একমাত্র ফিজির

তিনটি দ্বীপের উপর দিয়ে তারিখ রেখা অতিক্রম করেছে। আর 'তিভিউনি' দ্বীপের একমাত্র বৈশিষ্ট্য যে, আমরা এ দ্বীপের যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা ঠিক একশ' আশি দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। যার একদিকে ছিলো শনিবার, আর আরেক দিকে ছিলো রবিবার। তাই একথা বলা যথার্থ যে, পৃথিবীতে প্রতিদিন এখান থেকে নতুন তারিখের সূচনা হয় এবং প্রতিদিনের নতুন সূর্য সর্বপ্রথম এখান থেকে উদিত হয়। এ দিক থেকে এটি مطلع الشمس বা 'সূর্যোদয়ের দেশ'। আমি ইতিপূর্বে গ্রীণীচে শূন্য দ্রাঘিমাংশের বিন্দুতে গিয়ে ছিলাম, আর আজ একশ' আশি দ্রাঘিমাংশে এসে পৃথিবীর দ্রাঘিমাংশের উভয় প্রান্তে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হলো। দু'আ করি, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর এ প্রান্তসমূহকে বান্দার গুনাহসমূহকে গোপন করে ঈমান ও ইতাআত এবং তাওবা ও ইস্তি গফারের সাক্ষী বানিয়ে দিন। আমীন।

এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার পশ্চিমে দ্বীপের প্রায় শেষ প্রান্তে মুসলমানগণ একটি মসজিদ বানিয়েছেন। সেখানে এ সময় আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। Date Line (তারিখ রেখা)-র পশ্চিমে অবস্থিত এটি প্রথম মসজিদ। এর ব্যবস্থাপকগণ ঠিকই মন্তব্য করেন যে, আপনি এখন এমন একটি মসজিদে বয়ান করতে যাচ্ছেন, যেখানে প্রতিদিন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব প্রথম ফজরের আযান ঘোষিত হয়। বাস্তবেও তাদের কথা ছিলো সঠিক। সত্যিকার অর্থেই মসজিদটির এ গর্ব রয়েছে।

মসজিদের মধ্যে নারী-পুরষ উভয়েরই যথেষ্ট সমাবেশ ঘটেছিলো। তবে নারীদের সংখ্যা ছিলো অধিক। পর্দার সাথে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এখানে প্রায় এক ঘণ্টা আমার বয়ান হয়। যোহরের নামায আমরা এ মসজিদেই আদায় করে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সাড়ে তিনটার সময় পুনরায় বিমানে আরোহণ করে চারটার দিকে 'সাভুসাভু' পৌঁছি। এখানকার একটি মসজিদে আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত বয়ান হয়। তাতে বহু সংখ্যক নারী-পুরুষ অংশ গ্রহণ করেন। সাভুসাভুর অন্যতম দর্শনীয় জিনিস হলো, উত্তপ্ত পানির প্রাকৃতিক ঝর্ণা। গরম পানির ঝর্ণা আমি অনেক জায়গাতেই দেখেছি। সাধারণত সেগুলো হয়ে থাকে গন্ধকের ঝর্ণা। করাচীর মঙ্গুপীর এলাকাতেও এমন ঝর্ণা রয়েছে। কিন্তু সাভুসাভুর ঝর্ণা সেগুলো থেকে ব্যতিক্রম। এখানকার ঝর্ণা থেকে যে পানি বের হয় তা অত্যন্ত স্বচ্ছ। পানি এতো বেশি উত্তপ্ত যে, তাতে হাত দেয়া সম্ভব নয়। এ ঝর্ণা সমুদ্র থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে ছোট একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। এ ঝর্ণার পানি এতো গরম যে, তার উপরে সব সময় বাস্প উড়তে দেখা যায়। স্থানীয় লোকেরা ঐ পানিতে ডিম, মাছ ও গোশত সিদ্ধ করে থাকে। আমাদের একজন

সঙ্গী এক ডজন ডিমের একটি থলে এনে একটি ঝর্ণার উপর রেখে দেন। পাঁচ মিনিট পর তিনি সে থলে বের করেন। থলের সবগুলো ডিম সিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। ডিমগুলো তিনি সাথীদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

সমুদ্রের একেবারে নিকটে ভূমি থেকে উত্তপ্ত পানি বের হওয়া আল্লাহ তাআলার কুদরতের এক বিরাট বহিঃপ্রকাশ। এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এই দেয়া হয় যে, মূলত পার্শ্ববর্তী পাহাড়টির হাল্কা মাত্রার লাভার স্বমন্বয়ে গঠিত যা ফেটে বের হতে সক্ষম নয়, তবে তা পাহাড়ের ঝর্ণাগুলোকে উত্তপ্ত করে রেখেছে।

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهٗ اَعْلَمُ وَ تَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ এবং সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ কল্যাণসিক্ত।'

সাভুসাভু থেকে সে রাতেই আমাদেরকে লাম্বাসায় ফিরে যেতে হবে। এখানকার এক প্রভাবশালী মুসলমান নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। তার বাড়িতে খানা খাওয়ার পর আমরা ফিরতি যাত্রা করি। লাম্বাসায় পৌঁছতে অনেক রাত হয়ে যায়।

'সুভা'য়

পরদিন সাড়ে নয়টায় আমরা লাম্বাসা থেকে ফিজির রাজধানী 'সুভা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। 'নাসুরী' ও 'সুভা'র সমন্বয়ে সুদৃশ্য এ শহরটি। বিমানবন্দর অবস্থিত নাসুরীতে, আর রাজধানী হলো সুভায়। সুভায় আমাদের প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলো ফিজি মুসলিম লীগ। এটি ফিজির মুসলমানদের সব চেয়ে বড়ো সংগঠন। বিমানবন্দর থেকে তারা আমাদেরকে সর্বপ্রথম নাসুরীর বড়ো একটি স্কুল পরিদর্শনে নিয়ে যায়। এটি মুসলমান শিশুদের শিক্ষাদানের বিরাট সুসংহত প্রতিষ্ঠান। প্রায় দেড় হাজার ছাত্র এখানে শিক্ষারত আছে। এখানে ইন্টার মিডিয়েট পর্যন্ত প্রচলিত সরকারী পাঠ্যক্রমের সাথে সাথে কুরআনে কারীম এবং দ্বীনের বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। স্কুলের ছুটি চলছিলো। তবে স্কুলের প্রিন্সিপাল, ব্যবস্থাপক ও শিক্ষকগণ লাইব্রেরীর হলকক্ষে আমাদেরকে স্বাগত জানান। স্কুল সম্পর্কে আমাদেরকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। এ পদ্ধতিরই আরেকটি স্কুল সুভাতেও আছে বলে আমরা জানতে পারি। এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে মুসলমান শিশুদেরকে অমুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠানোর অনিষ্ট থেকে বাঁচার অনেকটাই প্রতিবিধান হয়েছে।

মেযবানগণ আছরের নামাযের পর সুভা শহর ঘুরে দেখার প্রোগ্রাম বানিয়ে ছিলেন। এটি ফিজির সর্বাধিক উন্নত ও সুন্দর শহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে সাথে এর ভবনসমূহের সৌন্দর্য শহরটিকে বড়ো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। আবহাওয়ায় উষ্ণতা না থাকলে একে সুইজারল্যান্ডের কোন শহর বলে মনে হতো। মধ্য শহর অতিক্রম করে আমরা সমুদ্রোপকূলে পৌঁছি। আমাদের সামনে

প্রশান্ত মহাসাগর দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। ডান দিকে সবুজ-শ্যামল দ্বীপসমূহ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। ফিজি মুসলিম লীগের সহ সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম সাহেব মূলত পাকিস্তানী। অনেক বছর ধরে ফিজিতে বাস করছেন। একটি দ্বীপের দিকে ইশারা করে তিনি বলেন- এখানে যে গোত্র বাস করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিস্ময়কর এক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। তা হলো, তাদের হাত-পায়ের চামড়া আগুনে জ্বলে না। তারা অবলিলায় উত্তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যায়। সুভার ফাইভ স্টার হোটেলগুলোতে প্রতি বৃহস্পতিবার তাদের আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার প্রদর্শনী করা হয়। পর্যটকদের জন্যে ফিজির পরিচিতিমূলক বই প্রকাশ করা হয়েছে। তাতেও 'আল্লাহর দান' শিরোনাম দিয়ে ঐ গোত্রের এ বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আগুনের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার প্রদর্শনী আরো কতক অঞ্চলে হয়ে থাকে। কিন্তু তা হয়তো নযরবন্দীর মাধ্যমে করা হয়, না হয় চামড়ার উপর আগুন-প্রতিরোধক কিছু লাগিয়ে করা হয়। এখানকার লোকেরা বলে যে, ফিজির এ গোত্রের প্রদর্শনীতে এ ধরনের কৃত্রিম কোন ব্যবস্থা থাকে না। বাস্তবেই তাদের চামড়া এমন যে, তা আগুনের প্রভাব গ্রহণ করে না। আব্দুল কাইয়ুম সাহেব নিজে এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, তার সামনে একটি মেয়ে গরম পানিতে পড়ে জ্বলে যায়। মানুষ তাকে নিয়ে হাসপাতালে না গিয়ে ঐ গোত্রের এক লোকের নিকট চলে যায় এবং অল্প কিছু সময় পর তাকে নিয়ে আসে, তখন তার জ্বালা দূর হয়ে যায়। আল্লাহই সঠিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত।

মাগরিবের নামায আমাদেরকে শহরের সবচেয়ে বড়ো মসজিদে আদায় করতে হবে। সেখানে মাগরিবের নামাযের পর আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। মসজিদে যাওয়ার পথে কাদিয়ানীদের একটি কেন্দ্রও নজরে পড়ে। প্রসিদ্ধ আছে যে, ফিজিতে তারা নিজেদের মিশন খুব জোরেশোরে চালু রেখেছে। প্রায় প্রত্যেকটি বড়ো শহরে তাদের কেন্দ্র রয়েছে। তবে এখানকার মুসলমানগণ জানান যে, আলহামদু লিল্লাহ! বেশিরভাগ মুসলমান তাদের প্রতারণা সম্পর্কে অবগত রয়েছে। তাদের ধোঁকার জাল খুব একটা কার্যকর হতে পারেনি।

আমরা জামে মসজিদে পৌঁছে দেখি, মাগরিবের আযানের পূর্বেই পার্কিংয়ের সব জায়গা ভরে গেছে। সড়কের উপর গাড়ির সারি দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদটি দোতলা এবং বেশ বিস্তৃত। কিন্তু তার মধ্যে তিল ধারণের জায়গা ছিলো না। অতি কষ্টে আমাদেরকে মেহরাব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক লোক সড়কের উপর নামায আদায় করে। বাস্তবিকই ফিজির হিসেবে এটি অসাধারণ এক সমাবেশ ছিলো। লোকেরা বলছিলো যে, এ দেশে মুসলমানদের এতো বড়ো

সমাবেশ ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। প্রায় দেড় ঘণ্টা এখানে আমার বয়ান হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে মানুষ মনোযোগ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শ্রবণ করে। আমি সে দেশের মুসলমানদের কাছে যে পয়গাম পৌঁছাতে চাচ্ছিলাম, আলহামদু লিল্লাহ তা পৌঁছে দেই। তার মধ্যে তাদের জন্যে অনেকগুলো আমলের প্রস্তাব ছিলো। আমার অবস্থানকালে সংশোধনযোগ্য যে সব বিষয় আমার চোখে পড়ে সেগুলোও তুলে ধরি। ইশার নামাযের পর নৈশভোজে এখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং স্থানীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে এ দিক থেকে সমাবেশটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

ফিজির কিছু প্রভাবশালী লোক মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্যে একটি কো অপারেটিভ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে নৈশভোজে আমি তাদেরকে সুদের লানত থেকে মুসলমানদেরকে মুক্ত করার জন্যে কিছু কাজ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। সুতরাং তারা পরের দিন নয়টার সময় এ বিষয়ে বিস্তারিত পরামর্শ করার জন্যে সময় নেন। সকাল নয়টায় তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সেখানে কর্মপদ্ধতির বুনিয়াদী রূপ-রেখা নির্ধারণ করা হয়। অবশিষ্ট বিস্তারিত দিকনির্দেশনা স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে নির্ধারণ করার পরামর্শ দেই।

সে দিনই এগারোটার সময় মহিলাদের এক সমাবেশে বয়ান করার প্রোগ্রাম ছিলো। সে সমাবেশেও মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো অস্বাভাবিক। দশটা থেকে সমাবেশস্থলে মহিলাদের আগমন শুরু হয়। আয়োজকগণ তাদের জন্যে যে জায়গার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ে। আয়োজকদের অনুমান ছিলো যে, আটশ' থেকে এক হাজার মহিলা এখানে অংশ নিয়েছেন। যা ছিলো এ দেশের জন্যে অসাধারণ। যে মসজিদসংলগ্ন হলকক্ষে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিলো, সেখানে পাকিস্তানের মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভ করা একজন স্থানীয় আলেম- যার স্ত্রী একজন পাকিস্তানী আলেমা- এই প্রথম মেয়দের দ্বীনী তা'লীমের জন্যে একটি মাদরাসা আরম্ভ করেছেন। মাশাআল্লাহ! মাদ্রাসাটি দ্রুত উন্নতি লাভ করছে। সমাবেশে যে সকল মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকে মাদরাসার কার্যক্রম দেখে নিজেদের মেয়েদেরকে এখানে তালীম দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

'নাদি'তে

যোহরের নামাযের পর আমরা এখান থেকে সড়ক পথে 'নাদি' যাবো। আমাদের মেযবান জনাব আসেফ সাহেব নাদিতেই ছিলেন। (যার কল্যাণময় আলোচনা শুরুতে করা হয়েছে।) তিনি আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একদিন

পূর্বে সুভায় এসেছেন। তার আরামদায়ক গাড়িতে আমরা সুভা থেকে রওয়ানা হই। নাদি পর্যন্ত প্রায় তিন ঘন্টার পথ। এ পুরো পথটি অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। সবুজ-শ্যামল ময়দান, ঘন বন, সবুজাবৃত পাহাড় ও পানির ঝর্ণাসমূহ চোখ জুড়িয়ে দেয়। মাগরিবের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্বে আমরা আসেফ সাহেবের বাড়িতে পৌঁছি। কিন্তু মাগরিবের নামায আমাদেরকে 'লোটোকা' (Lautoka) নামের অপর একটি শহরে পড়তে হবে। এটি 'ভিতি' দ্বীপের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। শহরটি 'নাদি' থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে। জামেয়া ফারুকিয়া করাচী থেকে শিক্ষাসমাপনকারী কতিপয় আলেম শহরের উপকণ্ঠে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাগরিবের নামায আমরা সেই মাদরাসার মসজিদে আদায় করি। মাগরিবের পর সেখানে ইশা পর্যন্ত আমার বয়ান হয়। তাতে লোটোকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান অধিবাসীগণ অংশগ্রহণ করেন। এখান থেকে অনেক রাতে নাদিতে প্রত্যাবর্তন করি।

গত তিনদিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। আগামী দিন বৃহস্পতিবার। ফিজিতে অবস্থানের এটি আমার শেষ দিন। এর পর দীর্ঘ ফিরতি সফর রয়েছে। এ কারণে এ দিন আসর পর্যন্ত নির্দিষ্ট কোন প্রোগ্রাম রাখা হয়নি। তাই এ সময় কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ লাভ হয়। আছরের নামাযের পর নাদির মুসলিম স্কুলে যাই। নাসুরির মুসলিম স্কুলের পদ্ধতিতে ফিজি মুসলিম লীগ এটি প্রতিষ্ঠা করেছে। এটি মুসলিম স্কুল হলেও এর প্রিন্সিপাল সাহেব বলেন যে, সরকারী আইনের ভিত্তিতে অমুসলিম শিশুদেরকে এখানে ভর্তি হতে আমরা নিষেধ করতে পারি না। মোট সতেরো শ' ছাত্রের মধ্যে প্রায় আড়াই শ' অমুসলিম ছাত্র এখানে শিক্ষাধীন রয়েছে। অমুসলিম শিশুদের জন্যে ইসলামিয়াতের শিক্ষা যদিও আবশ্যকীয় নয়, কিন্তু মজার বিষয় এই যে, এ অমুসলিম শিশুরা নিজেদের আগ্রহে ইসলামিয়াত পড়তে চায়। বরং কিছু শিশুকে যখন বলা হয় যে, ইসলামিয়াতের শিক্ষা তোমাদের জন্যে আবশ্যকীয় নয়, তখন তারা তাদের পিতা-মাতার কাছে অভিযোগ করে। তাদের পিতা-মাতারা নিজেরাই এসে স্কুলের ব্যবস্থাপকগণের নিকট আবেদন করেন যে, তাদেরকে ইসলামিয়াতের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করবেন না।

মাগরিবের নামাযের পর নাদির কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে- যেটা তাবলীগেরও মারকায- জুমার রাতের ইজতিমা ছিলো। সেখানে আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। সুতরাং ঐ ইজতিমাতেও প্রায় দেড় ঘণ্টা বয়ান করার সুযোগ হয়। এটি ছিলো ফিজিতে আমার এ সফরের শেষ বয়ান। পরের দিন আমি নাদি থেকে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ফিরতি পথ ধরি। বত্রিশ ঘণ্টার দীর্ঘ সফরের পর পনেরো জানুয়ারী শনিবার দিন আল্লাহর মেহেরবানীতে করাচী পৌঁছি।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

ফিজিতে আমি এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করি। এ সময় দেশটির বড়ো বড়ো শহরে যাওয়া, সেখানকার লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং বিভিন্ন জায়গায় বয়ান করার সুযোগ লাভ হয়। আমি সে দেশের মুসলমানগণকে একেবারে সহজ-সরল ও সভ্য-ভদ্র পেয়েছি। তাদের উপর দিয়ে এমন এক সময় অতিবাহিত হয়েছে, যখন তারা দ্বীনী রাহনুমায়ী না পাওয়ার কারণে বাস্তব জীবনে দ্বীন থেকে দূরে সরে গিয়েছিলো। তার মারাত্মক বহিঃপ্রকাশ এভাবে ঘটে যে, মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ পর্যন্ত হয়েছে। মুসলমান মেয়েরা খ্রিস্টানদের সাথে বিবাহ ঘটিয়েছে। এ জঘণ্যতম পরিস্থিতির প্রভাব এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। যা এ দেশের মুসলমানদের জন্যে চরম দুশ্চিন্তার বিষয়। যার সমাধানের জন্যে এখানকার প্রভাবশালী মুসলমানদেরকে আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ দেই। আল্লাহ করুন, তারা যেন এর উপর আমল করে এ জটিল পরিস্থিতির পথ রোধ করতে সক্ষম হন। আমীন।

তবে যখন থেকে এ দেশে তাবলীগ জামাতের কাজ আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে মাশাআল্লাহ পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। মুসলমানদের দ্বীনী অনুভূতির উন্নতি হয়েছে। সব জায়গায় তাবলীগের মারকায প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার ফিজিতে অবস্থানকালেও পাকিস্তান থেকে তিনটি জামাত কয়েক মাসের জন্যে সে দেশে গিয়ে অবস্থান করছিলো এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেদের ফয়েয বিস্তার করছিলো।

একই সঙ্গে পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ থেকে শিক্ষাসমাপণ করে কিছু আলেম এখানে এসেছেন। তাঁরা মুসলমানদের দ্বীনী তা'লীম-তারবিয়াত ও মন-মানসিকতা গড়ার পিছনে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। যার সুফল চোখে পড়ে।

ফিজির সরকার দ্বীনী তৎপরতার উপর কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করে না। এখানে মুসলিম ও অমুসলিমদের সম্মিলিত মহল্লাতেও মাইকে আযান দেয়া হয়। তাবলীগ ও তা'লীমের কাজে এমন কোন বিধি-নিষেধ নেই, যা এ সব কাজে প্রতিবন্ধক হবে। মুসলমানদের মধ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক ও ব্যবসায়িক কায়কারবারকে শরীয়তসম্মত বানানোর উপলব্ধি জাগ্রত হচ্ছে। তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও রয়েছে যে, তারা অনেক দূরের একটি দেশে বসবাস করছে, যার দিকে সহযোগিতার দৃষ্টি খুব কম প্রসারিত হয়। তাই তারা ভিনদেশী কোন মুসলমানের আগমনকে খুব মূল্যায়ন করে থাকেন। সে দেশের মুসলমানদেরকে দেয়ার মতো আমার নিকট কিছু ছিলো না। তা সত্ত্বেও সেখানে গেলে তারা যে পরিমাণে কৃতজ্ঞতা, মূল্যায়ন ও আবেগ-উদ্দীপনা প্রকাশ করেন, তা অবিস্মরণীয়।

এখানকার মুসলমানগণ সহজ-সরল মানসিকতার অধিকারী হওয়ায় তাদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ও বিবাদ-বিতর্কের মনোভাব নেই। তাদের স্বভাবের মধ্যে কথা গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে। এ কারণে তাদের পর্যন্ত দ্বীনের কথা পৌঁছানো এবং তাদেরকে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা অন্যান্য জায়গার তুলনায় সম্ভবত অধিক সহজ। ফিজিতে দ্বীনী কিতাবের প্রয়োজন যতো অধিক, তার স্বল্পতাও ততো বেশি। যার একটি কারণ এই যে, এখানে সমুদ্র পথের ডাক পৌঁছতে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। এমন কি ডি. এইচ. এল. এর মতো বিশ্বমানের কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে কোন জিনিস পাঠালেও প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে। বিমানের ডাকের ব্যয় অনেক বেশি পড়ে যায়। এখানকার বেশিরভাগ মুসলমান উর্দু বলতে ও বুঝতে পারে। তবে তাদের সে উর্দু হিন্দির সাথে মিশ্রিত এবং তাদের বলার ভঙ্গি স্থানীয় ভাষার দ্বারা প্রভাবিত। যার ফলে তা এক নতুন ধরনের ভাষায় পরিণত হয়েছে। তাই এখানে কেবল সে সব কিতাবই কাজে আসতে পারে, যেগুলো খুব সহজ ও সাদামাটা ভাষায় লেখা হয়েছে। এসব বিষয়কে সামনে রেখে ফিজিগামী তাবলীগ জামাত এবং সেখানে খেদমতরত ওলামায়ে কেরামের সেখানকার দ্বীনী প্রয়োজনসমূহ পুরো করার জন্যে এখনো অনেক কিছু করার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে সে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ইরানে এক সপ্তাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বিগত পঁচিশ বছরে আমি পৃথিবীর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দেশে সফর করেছি। পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সর্বশেষ প্রান্তেও গিয়েছি। কিন্তু ঘটনাচক্রে প্রতিবেশী দেশ ইরানে এখনো পর্যন্ত কোন সফর হয়নি। গত দশ বছরে ইরানের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের পক্ষ থেকে বারবার দাওয়াতও আসতে থাকে। যে দেশের প্রতিটি কোণ ইসলামী জ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের স্বর্ণস্মারক, সেখানে যাওয়ার বাসনা আমার মনেও ছিলো। কিন্তু কোন না কোন সমস্যা এমন দেখা দিয়েছে, যে কারণে আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

ইরানী বেলুচিস্তানের রাজধানী যাহেদানে 'দারুল উলূম যাহেদান' নামে একটি মাদরাসা রয়েছে। আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষাসমাপনকারী কয়েকজন আলেম সেখানকার সফল ও স্বনামধন্য উস্তায। তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুফতী আব্দুল কাদের আরেফী সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেব ইরানের নেতৃস্থানীয় তৎপর আলেম। এঁরা কয়েক বছর যাবৎ তাঁদের বর্ষিকসভায় আমাকে দাওয়াত করে আসছিলেন। গত বছরও তাঁদের পক্ষ থেকে দাওয়াত এসেছে। কিন্তু অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই দারুল উলূম করাচীর সদর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী' উসমানী সাহেব (মু.যি.) সেখানে তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। প্রায় এক সপ্তাহ তিনি ইরানের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন। আর আমি এ বছর (রজব ১৪২৬ হিজরী) যাওয়ার ওয়াদা করেছিলাম। ২২শে রজব ১৪২৬ হিজরী আমাদের দারুল উলূমে খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান

ছিলো। পরদিন ভোর ছয়টায় আমার ভাগ্নে দারুল উলূমের হাদীসের উস্তায মাওলানা রশীদ আশরাফ সাহেব (সাল্লামাহু) সহ আমি করাচী থেকে রওয়ানা করি। দুবাইতে বিমান পরিবর্তন করে সকাল সাড়ে দশটায় তেহরানের নতুন বিমানবন্দরে অবতরণ করি। বিশাল-বিস্তৃত এবং এবছরেই নির্মিত বিমানবন্দরটি শহর থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আধুনিক সবধরনের সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সজ্জিত।

বিমানবন্দরে মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব ও মাওলানা আব্দুল কাদের আরেফী সাহেব ছাড়াও দারুল উলূম যাহেদানের হাদীসের উস্তায মাওলানা ওবাইদুল্লাহ মুসাযাদা প্রমুখ স্বাগত জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিলেন। দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষাসমাপনকারী এবং তেহরানে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়ন অধিদপ্তরের সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ইরানী আমার আসার সংবাদ বিলম্বে জানতে পারেন বিধায় বিমানবন্দরে আসতে পারেননি। 'লালা' হোটেলে আমার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সেখানে পৌঁছে আমি তাঁকে অপেক্ষমান দেখতে পাই। একই অধিদপ্তরের পরিচালক আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ আলী তাসখিরী- যাঁর সঙ্গে 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী' ও 'আল মাজলিসুশ শারয়ী' ইত্যাদির মাধ্যমে আমার অকৃত্রিম সম্পর্ক রয়েছে- তিনি এসময় বাহিরে সফররত ছিলেন বিধায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি।

'লালা' এক সময় ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ছিলো। সম্ভবত বিপ্লবের পর তা স্বতন্ত্র রূপ ধারণ করেছে এবং 'লালা' ফুলের নামে এর নামকরণ করা হয়েছে।

কিছু সময় বিশ্রাম করার পর আছরের নামায পড়ে আমরা হোটেল থেকে বের হই। ইঞ্জিনিয়ার পাইমান ফেরুযাশ সাহেব ইরানের সাংসদ। যাহেদান এলাকা থেকে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তাঁর বাড়িতে শহরের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদের একটি সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়তে হবে। তেহরান একটি সুন্দর শহর। উন্নয়নশীল দেশসমূহের উৎকৃষ্টতম শহরগুলোর মধ্যে তা পরিগণিত। আধুনিক নাগরিক সুবিধা দ্বারা সজ্জিত ও সমৃদ্ধ। এর বিভিন্ন অঞ্চল অতিক্রম করে আমরা পাইমান ফেরুযাশ সাহেবের বাড়িতে পৌঁছি। সেখানে মাগরিবের নামায আদায় করি।

মাগরিবের নামাযের পর তেহরানে বসবাসরত প্রভাবশালী আহলে সুন্নাত ব্যক্তিবর্গের বেশ বড়ো একটি সমাবেশ হয়। সেখানে কুর্দিস্তান, খোরাসান, বেলুচিস্তান ও তেহরানের গণ্য-মান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। ডক্টর জালাল জালালীযাদা কুর্দিস্তানের একজন প্রভাবশালী নেতা। তিনি ইতিপূর্বে সাংসদ ছিলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানান। একই সাথে এ

অভিযোগও করেন যে, ইরানের বাইরের আলেম ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইরানের মুসলমানদেরকে এদিক থেকে দৃষ্টির আড়ালে রেখেছেন যে, এদের সঙ্গে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কোন সম্পর্ক নেই। প্রতিভাষণে আমি নিজের ত্রুটির কথা স্বীকার করি। মুসলিম উম্মাহর বর্তমান পরিস্থিতি এবং এ অবস্থায় তাদের করণীয় সম্পর্কে কিছু কথা নিবেদন করি। আমার বক্তৃতা ছিলো আরবীতে। মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব ফার্সীতে তা ভাষান্তর করেন।

মাওলানা আব্দুল হাদী দারুল উলূম যাহেদান থেকে শিক্ষাসমাপনকারী এবং মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেবের সাগরিদ। বর্তমানে তিনি ডক্টরেট করছেন। তিনি পুরো সফরে অত্যন্ত তৎপরতার সাথে আমার সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তিনি আমার আরামের ব্যবস্থা করতে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। আজ রাতের খাবারের আয়োজন ছিলো তাঁর বাড়িতে। সেখানে আরো অনেক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত হয়। সেখান থেকে অনেক রাতে ফিরে আসি।

ইস্পাহানের সফর

পরেরদিনটি আমরা নির্ধারণ করেছিলাম 'কুম' ও 'ইস্পাহান' সফরের জন্যে। ইস্পাহান তেহরান থেকে প্রায় চারশ' কিলোমিটার দূরে। ফজরের নামায পড়ে নাশতা না করেই আমরা রওয়ানা করি। তেহরান থেকে বের হওয়ার পর ইস্পাহান পর্যন্ত সুন্দর সুপ্রশস্ত সড়ক পথ। রাজপথের যাবতীয় আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত। তেহরান থেকে প্রায় একশ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর 'কুম' শহরের কিছু আগে মাহতাব রেষ্টুরেন্ট নামে একটি সুন্দর খাবারের হোটেল রয়েছে। এখানে আমরা নাশতা করি। তারপর ইস্পাহান অভিমুখে সফর অব্যাহত রাখি। প্রায় অর্ধেক পথ যাওয়ার পর আমরা 'কাশান' শহর অতিক্রম করি। এটাই সম্ভবত সেই শহর, যেখানে 'বাদায়ি'য়ুস সানায়ি' এর লেখক আল্লামা আলাউদ্দীন কাশানী রহ. জন্মগ্রহণ করেন। হল্‌বে তাঁর মাযার রয়েছে। আমি সিরিয়ার দ্বিতীয় সফরনামায় তাঁর সর্ম্পকে আলোচনা করেছি।

সড়ক পথের দীর্ঘ ভ্রমণ সব সময় আমাকে অত্যাধিক ক্লান্ত করে তোলে। এ কারণে সাধারণত আমি সড়ক পথের ভ্রমণ থেকে বিরত থাকি। কিন্তু ইস্পাহান দেখার প্রবল আগ্রহ ছিলো। সড়কও ছিলো খুব উন্নত। মেজবানগণ আরামদায়ক গাড়ীরও ব্যবস্থা করেছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! একারণে বেশি ক্লান্তি বোধ হয়নি। দুপুর বারোটায় আমরা ইস্পাহান পৌঁছি। তেহরান ও মাশহাদের পর এটি ইরানের তৃতীয় বৃহত্তম শহর। বাহ্যিক সৌন্দর্যের চেয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে একে দেখার আগ্রহ ছিলো অধিক। এখান থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড়ো-বড়ো মহীরুহের জন্ম হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে রয়েছেন- হাফেয

—৩

ইবনে মান্দাহ রহ. ও ইমাম আবু নুয়াইম ইস্পাহানী রহ. (৪৩০ হিজরী), যাঁর 'হিলইয়াতুল আউলিয়া' কিতাব বুযুর্গানে দ্বীনের আলোচনার বড়ো উৎস। মুফাসসিরগণের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম রাগেব ইস্পাহানী রহ. (৫৭২ হিজরী), যাঁর 'মুফরাদাতুল কুরআন' নামক কিতাবখানা কুরআনের অভিধানের ক্ষেত্রে অথরিটির মর্যাদা রাখে। সাহিত্যিকদের মধ্যে রয়েছেন- আবুল ফরজ ইস্পাহানী (মৃত্যু- ৪৬৮ হিজরী)। তাঁর 'আল আগানী' কিতাবটি আরবী সাহিত্যের বিশ্বকোষ। আরো রয়েছেন- যাহেরী ফিকহের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম দাউদ যাহেরী রহ. (মৃত্যু- ২৭০ হিজরী)। যিনি ফিকহ বিষয়ে পৃথক এক মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন। আকায়িদ ও কালাম শাস্ত্রে রয়েছেন- আল্লামা আবু বকর ইবনে ফোয়াররাক রহ. (মৃত্যু- ৪০৬ হিজরী)। যাঁর 'মুশকিলুল হাদীস' কিতাবটি উৎস গ্রন্থের মর্যাদা রাখে।

ইস্পাহান শহরে ইলম ও আদবের এতো অধিক সংখ্যক মহান ব্যক্তিত্ব তৈরী হয়েছেন যে, আল্লামা ইয়াকূত হামবী রহ. এ পর্যন্ত লিখেছেন যে-

'وقد خرج من اصبهان من العلماء والأئمة فى كل فن ما لم يخرج من مدينة من المدن، و على الخصوص علو الإسناد فإن أعمار أهلها تطول، ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث'

'ইস্পাহানের স্বর্ণপ্রসবা মাটি থেকে প্রত্যেক শাস্ত্রে এতো অধিক পরিমাণ আলেম ও ইমাম জন্ম লাভ করেছেন, যা অন্য কোন নগরী থেকে হয়নি। বিশেষ করে 'উঁচু সনদে'র বিষয়টি। কারণ, এর অধিবাসীদের বয়স হতো দীর্ঘ। উপরন্তু হাদীস শিক্ষার প্রতি তাদের সবিশেষ আগ্রহও ছিলো।' (মু'জামুল বুলদান, খন্ড-১, পৃঃ-২০৯)

ইস্পাহান তার পরিচ্ছন্ন আবহাওয়ার কারণেও ছিলো অত্যাধিক প্রসিদ্ধ। আলামা হামবী রহ. লিখেছেন- এখানে যে, পোকা-মাকড় হয় না শুধু তাই নয়, বরং খাবারও দ্রূত নষ্ট হয় না এবং ফলও দ্রুত পচে না। তিনি একথাও বর্ণনা করেছেন যে, এখানে কবরের মধ্যে শবদেহও দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অক্ষত ও স্বাভাবিক থাকে। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

শহরটি হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর খেলাফতকালে ১৯ হিজরীতে মুসলমানদের হাতে বিজিত হয়। তখন এখানে 'কাযুসকান' নামের এক বাদশাহের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবান রাযি. এটি অবরোধ করেন। উভয় সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি হলে কাযুসকান হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবানের নিকট পয়গাম পাঠায় যে, উভয় বাহিনীর লড়াার দ্বারা রক্তপাত ছাড়া কোন লাভ নেই। তাই এসো শুধু আমরা দু'জন পরস্পরের মোকাবেলা করি। আমি যদি তোমাকে হত্যা করি, তোমার বাহিনী ফিরে চলে যাবে। আর

তুমি যদি আমাকে হত্যা করো, আমার সাথীরা তোমার সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি করবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবান রাযি. এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। উভয়ের মধ্যে লড়াই হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবান রাযি. কাযুসকানকে প্রস্তাব করেন- প্রথমে তুমি আক্রমণ করো। কাযুসকান আক্রমণ করলে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবান রাযি.-এর ঘোড়ার জিন প্রভৃতি কেটে যায়। কিন্তু তিনি স্বস্থানে অক্ষত ও অবিচল দাঁড়িয়ে থাকেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উতবান রাযি. বলেন- এখন আমি আক্রমণ করবো, তুমি প্রস্তুত থেকো। এমন সময় কাযুসকান বলে যে, আমি তোমার দৃঢ়তা দেখেছি, তোমার সঙ্গে সন্ধি-চুক্তি করে শহর তোমার হাতে তুলে দিতে আমি প্রস্তুত আছি। সন্ধিপত্র লেখা হয়। শহরের সকল অধিবাসীকে নিরাপত্তা দেয়া হয়। তারপর থেকে এ শহর জ্ঞানী ও গুণীজনদের কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এ শহরের অলিগলি সে সকল জ্ঞানী-গুণীর স্মৃতি ও কীর্তি বিজড়িত হলেও এখানে যখন কট্টরপন্থী সফবী শিয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তারা আহলে সুন্নাতের কোনো স্মৃতি অবশিষ্ট রাখেনি। এখন এখানে শুধু সফবী যুগের স্মৃতি অবশিষ্ট রয়েছে। সফবী শাসকরা ইস্পাহানকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইরানের রাজধানী বানিয়েছিলো। এ কারণে এখানে তাদের বানানো আড়ম্বপূর্ণ দুর্গ, ভবন ও মসজিদসমূহ এখনো বিদ্যমান আছে। শহরের প্রাচীন এলাকায় পৌঁছার পর পথপ্রদর্শক আমাদেরকে 'ময়দানে নক্শে জাহাঁ'-তে নিয়ে যান। এটি বাস্তবিকই একটি দেখার মতো ময়দান। এর দৈর্ঘ্য এক কিলোমিটারের অধিক এবং প্রস্থ প্রায় আধা কিলোমিটার। এর একদিকে রয়েছে একটি বিশাল মসজিদ, আর তিনদিকে রয়েছে প্রাচীর। একদিকের প্রাচীরের উপর তৈরী করা হয়েছে অত্যন্ত জাঁকালো একটি বুরুজ। ময়দানটি পোলো খেলার জন্যে ব্যবহার করা হতো। বাদশাহ বুরুজ থেকে খেলা দেখতেন। ময়দানের একদিকে যেই বিশাল মসজিদটি রয়েছে, তা সফবীদের শাসনামলের। তার পাশেই সালজুকী বাদশাহদের শাসনামলের আরেকটি আড়ম্বপূর্ণ মসজিদ রয়েছে। তার দেওয়ালসমূহে তিন খলীফা- হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি., হযরত ওমর ফারুক রাযি. ও হযরত ওসমান গনী রাযি.-এর সম্মানিত নাম অত্যন্ত সুন্দর লিপিতে লেখা রয়েছে। অপরদিকে হযরত আলী মুর্তযা রাযি.-এর সম্মানিত নাম লেখা হয়েছে পৃথকভাবে। তিন খলীফার নাম থেকে হযরত আলী রাযি.-এর নামকে এভাবে পৃথক করার কোনো কারণ আমার বুঝে আসেনি।

যাইহোক, আমরা ঐ মসজিদেই জামাতের সাথে যোহরের নামায আদায় করি। এটি ইস্পাহানের প্রাচীন এলাকা। কল্পনার চোখ এখানে জ্ঞানী-গুণীদের সজ্জিত সমাবেশসমূহ অবলোকন করছিলো। কিন্তু চর্মচক্ষু এখানকার আকাশে-বাতাসে তাঁদের সে সব স্মৃতিকে তৃষ্ণার্তের ন্যায় খুঁজে ফিরছিলো।

ইস্পাহান শহর সুন্দর একটি নদীর দু'দিকে অবস্থিত। নদীর উভয় দিককে সংযুক্ত করার জন্যে জায়গায় জায়গায় সুদৃশ্য পুল তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে একটিকে 'সী ও সেহ' পুল বলা হয়। কারণ, এর মধ্যে তেত্রিশটি দরজা রয়েছে। আরেকটি পুলকে বলা হয় 'খোয়াজু'। এর উপর থেকে নদী, উভয়দিকে বিস্তৃত ভবনসমূহ এবং সবুজ-শ্যামল পুষ্পাকীর্ণ কেয়ারীসমূহ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দেখা যাচ্ছিলো। পথপ্রদর্শকগণ ঐসব পুলও আমাদেরকে ঘুরিয়ে দেখান।

বিকাল চারটা পর্যন্ত আমরা ইস্পাহানে অবস্থান করি। দুপুরের খানা খাওয়ার পর এখান থেকে ফিরতি পথ ধরি।

'কুম' শহরে

প্রায় আড়াই ঘণ্টা ফিরতি পথ অতিক্রম করার পর আমরা 'কুম' শহরে প্রবেশ করি। ইস্পাহান যাওয়ার পথে আমরা একে অতিক্রম করে এসেছিলাম। ২৩ হিজরীতে হযরত ওমর রাযি.-এর খেলাফতকালে এ অঞ্চলটি হযরত আবু মুসা আশ'আরী রাযি. জয় করেন। সে সময় এটি বড়ো কোনো শহর ছিলো না। ছোটো ছোটো সাতটি জনবসতির সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছিলো। সেগুলোর একটির নাম ছিলো 'কুমন্দান'। ৮৩ হিজরীতে আব্দুর রহমান ইবনুল আশ'আস হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের সঙ্গে বিদ্রোহ করেন। তাঁর বাহিনীর কিছু লোক এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। তারা এই সাতটি জনবসতির সমন্বয়ে একটি শহর আবাদ করে। 'কুমন্দান' থেকে সংক্ষেপ করে শহরের আরবী নাম রাখা হয় 'কুম'। এ শহরটি যারা আবাদ করেছিলো, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে সাআদ। তার এক ছেলে কুফায় জন্মগ্রহণ করেছিলো। সেখানে শিয়াদের পরিবেশে সে লালিত-পালিত হয়। 'কুম' আবাদ হওয়ার পর সে কুফা থেকে এখানে স্থানান্তরিত হয়। এখানে এসে শিয়া মতাদর্শ প্রচার করে। এমনকি ক্রমান্বয়ে শহরের সকল অধিবাসী শিয়া মতাবলম্বী হয়ে যায়। এ শহর সম্পর্কেই প্রসিদ্ধ কৌতুক আছে যে, সাহিব ইবনে উব্বাদ (যিনি একদিকে উজির, অপরদিকে উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ছিলেন) একবার এখানকার বিচারপতিকে সম্বোধন করে বলেছিলেন-

أيها القاضي بقم، قد عزلناك فقم.

আরবী ভাষায় 'কুম' শব্দের অর্থ 'দাঁড়িয়ে যাও'। তাই এ বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়- 'কুমের বিচারপতি! আমি তোমাকে বরখাস্ত করলাম, তাই তুমি দাঁড়িয়ে যাও।' এরপর যখনই ঐ বিচারপতি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হতো যে, আপনাকে কেন বরখাস্ত করা হয়েছে? তখন তিনি বলতেন যে-

أنا معزول السجع من غير جرم ولاسبب.

'আমি কোন অপরাধে বা কারণ বশতঃ বরখাস্ত হইনি, শুধু অন্তমিলের সৌখিনতা আমাকে বরখাস্ত করেছে।' (মু'জামুল বুলদান, ৬/৩৯৭-৩৯৮ পৃঃ)

যাইহোক, শহরটি দ্বিতীয় শতাব্দীর সূচনা থেকে শিয়াদের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখান থেকে অনেক বড়ো বড়ো শিয়া আলেম তৈরী হন। এখনো শিয়া আলেমগণের উচ্চ ও মাধ্যমিক অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শহর এটি । 'কুম'-এর গৌরবময় কুতুবখানাও এখানে রয়েছে। দুর্লভ গ্রন্থসমূহের কারণে এটি আলমে ইসলামের হাতেগোনা কুতুবখানাসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। ইমামিয়া শিয়াদের মূলনীতি ভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ এখানে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। উচ্চ মানের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলি বিখ্যাত। আহলে সুন্নাতদের জন্যে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত একটি আর্ন্তজাতিক কেন্দ্রেও আমার যাওয়ার সুযোগ হয়। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূ-খন্ড থেকে আহলে সুন্নাত ছাত্রদেরকে এনে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ফিকহের তালীম দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের দায়ীত্বশীল একজন শিয়া আলেম যখন আমাকে বলেন যে, এখানে প্রায় আট হাজার ছাত্র শিক্ষাধীন রয়েছে, তখন আমি বিস্ময় বোধ করি। কিন্তু আমার সঙ্গী মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব এ কথার সত্যায়ন করেন এবং বলেন যে, এদের সংখ্যা আরও অধিক হতে পারে। কারণ, এর শাখা মাশহাদ ও অন্যান্য শহরেও রয়েছে। এটি আহলে সুন্নাতের জন্যে একটি চিন্তার উপাদান যে, সারা পৃথিবীর এতো অধিক সংখ্যক আহলে সুন্নাত তালিবে ইলম এখানে শিক্ষা লাভ করছে!

এসব শিক্ষাকেন্দ্র ছাড়াও 'কুম' একারণে সাধারণের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে যে, এখানে হযরত আলী রেযা রহ.-এর বোন সাইয়্যেদাহ মাছুমা রহ.-এর মাযার অবস্থিত। মাযারের উপর বিশাল মসজিদও তৈরী করা হয়েছে। মাযারে সবসময় যেয়ারতকারীদের ভীড় লেগে থাকে। বুযুর্গদের মাযারে সাধারণ মানুষের যে সমস্ত বিদআত ও ভিত্তিহীন কর্মকান্ড চালু রয়েছে, তা এখানেও সর্বগ্রাসী রূপে বিদ্যমান রয়েছে।

মাগরিবের নামাযের পর আমরা 'কুম' থেকে তেহরানের উদ্দেশ্যে ফিরতি পথ ধরি। অনেক রাতে হোটেলে পৌঁছি।

'চাবাহার' শহরে

পরদিন ফজরের আগেই আমরা হোটেল থেকে রওয়ানা হই। বিমানযোগে আমাদেরকে 'চাবাহার' যেতে হবে। ছয়টায় বিমান ছাড়বে। আমরা তেহরানের মেহেরাবাদের পুরাতন বিমানবন্দরে ফজরের নামায আদায় করি। বর্তমানে এটি আভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বিমান দেড় ঘণ্টা বিলম্বে যাত্রা করে। এক ঘণ্টা ওড়ার পর বন্দর আব্বাস বিমানবন্দরে অবতরণ করে। এটি ইরানের হুরমুযগান প্রদেশের প্রসিদ্ধ উপকূলীয় শহর। এখানে শিয়া ছাড়া বহু

সংখ্যক শাফেয়ী মুসলমানের বাস রয়েছে। এখান থেকে আরো পঞ্চাশ মিনিট ওড়ার পর আমরা চাবাহার বিমানবন্দরে অবতরণ করি। চাবাহারে বড়ো একটি মাদরাসা রয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা মুহতামীম মাওলানা আব্দুর রহমান মালাযেহী সাহেব করাচীর প্রাচীন দ্বীনী মাদরাসা মাযহারুল উলূম খাড্ডা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। মাশাআল্লাহ্! তিনি পুরো এলাকায় ইলমে দ্বীনের খুশবু ছড়িয়ে দিয়েছেন। আজ এ মাদরাসার বার্ষিক সভা এবং সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান। আমরা সেখানে অংশগ্রহণ করবো। বিমান বন্দরে মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব, তাঁর সঙ্গীগণ, শিয়া আলেমদের মধ্যে এখানকার জুমার ইমাম ও শহরের কমিশনার বিমানের সিঁড়িতেই আমাদেরকে স্বাগত জানান। বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে আলেম, তালিবে ইলম ও জনসাধারণের বিরাট উপস্থিতিকে দ্বিমুখী সারির আকারে অপেক্ষমান দেখতে পাই। তাঁদের মধ্যে অনেক আলেম বহু বছর পূর্বে আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। আমার আগমন সংবাদ শুনে তাঁরা শত শত মাইল দূর থেকে সফর করে এখানে এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে শুধু মুসাফাহা করতেই অনেক সময় ব্যয় হয়। বিমান দেড় ঘণ্টা বিলম্বে পৌঁছে। তাই আমরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি মাদরাসার সমাবেশস্থলে চলে যাই। সুবিশাল এক মসজিদের বিশাল-বিস্তৃত হল কক্ষ উপস্থিত লোকদের দ্বারা একেবারে পরিপূর্ণ ছিলো। মাদরাসার অনেক উস্তায আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তাঁদের পক্ষ থেকে অনেকগুলো চিত্তাকর্ষক প্রদর্শনী উপস্থাপন করা হয়। এখানকার কমিশনার ও ডেপুটি কমিশানারও ভাষণ দেন। সবশেষে আমার বয়ান হয়। তারপর শিক্ষা সমাপনকারী ছাত্রদেরকে দস্তারবন্দী করা হয়।

সভা, নামায ও খানা শেষে প্রায় তিনটার দিকে অবস্থানস্থলে যাওয়ার সুযোগ হয়। সমুদ্র-তীরে অত্যন্ত সুদৃশ্য একটি রেষ্টহাউজে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আছরের নামায পর্যন্ত এখানে বিশ্রাম করি। নামাযের পর একটু হাঁটাহাঁটি করার জন্যে বাইরে বের হই। সামনে সমুদ্রোপকূলের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক দৃশ্য বিরাজ করছিলো। চাবহার ইরানী বেলুচিস্তানের উপকূলীয় শহর, যা গোয়াদর থেকে দু' শ' কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। গোয়াদরের মতোই এর ভূমির দৃশ্য (Landscape)। তবে বর্তমানে চাবহার গোয়াদরের তুলনায় অধিক উন্নত শহর। ইরান সরকার একে ফ্রি পোর্ট বানিয়েছে। ফলে এটি ভালো একটি ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। একারণে এখানকার ভবন, সড়ক ও দোকানসমূহ বেশ উন্নত। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো, হালকা বাতাসের দোলা মন-মস্তিষ্ককে উজ্জিবীত করছিলো। সমুদ্র-তীর ধরে কিছু সময়ের এই হাঁটাহাঁটি ক্লান্ত দেহে নতুন উদ্যম সৃষ্টি করে।

মাগরিবের নমাযের পর মাদরাসায় আলেমদের বড়ো একটি সমাবেশ ছিলো। এ এলাকার আশেপাশে অনেক মাদরাসা ও মক্তব রয়েছে। সেগুলো থেকে অনেক আলেম এখানে এসেছেন। তাদের মধ্যে আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের বিরাট একটি সংখ্যা ছিলো। ইশা পর্যন্ত তাঁদের উদ্দেশ্যে কথা বলি। মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব আমার বয়ানের ফার্সি ভাষায় তরজমা করেন। ইশার নামাযের পর স্থানীয় এক ব্যবসায়ী বিরাটাকারে নৈশ-ভোজের আয়োজন করেন। একের পর এক সমাবেশ হওয়ায় এ পর্যন্ত পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে শান্তভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ হয়নি। নৈশ-ভোজে তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় আনন্দপূর্ণ মতবিনিময় হয়।

পরদিন সকাল দশটায় আমরা বিমানযোগে যাহেদান যাই। কিন্তু তার আগে আরেকটি ছোট প্রোগ্রাম হয়। চাবহার বিমানবন্দর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে 'কিনারক' নামে আরেকটি উপকূলীয় শহর রয়েছে। এখানে আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষাসমাপনকারী মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি একটি জামে মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ করছেন। তাঁর মনোবাসনা ছিলো, সে মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর আমার হাতে রাখাবেন। তাই বিমানবন্দরে যাওয়ার পূর্বে 'কিনারক' যাই এবং মসজিদ নির্মাণ কাজের সূচনা করার সৌভাগ্য লাভ করি। এখানে বন্ধুদের বিরাট সমাবেশ ছিলো। সবাই মিলে দু'আ করা হয়। তারপর বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

'যাহেদান' শহরে

চাবাহার থেকে আকাশ পথে প্রায় পঞ্চাশ মিনিট ওড়ার পর আমরা ইরানী বেলুচিস্তানের রাজধানী যাহেদান বিমানবন্দরে অবতরণ করি। বিমানবন্দরের ভিতরে দারুল উলূম যাহেদানের মুহতামিম মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেব এবং অনেক সুন্নী ও শিয়া আলেম আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। বিমানবন্দর থেকে বের হয়ে এক বিশাল জনসমুদ্রকে স্বাগত জানানোর উদ্দেশ্যে উপস্থিত দেখতে পাই। এরা যে অসাধারণ ভালোবাসা নিয়ে বহু দূর থেকে এখানে এসেছেন, তার দাবি ছিলো এদের সকলের সঙ্গে কমপক্ষে মুসাফাহা করি। তাই কিছু সময় দ্বিমুখী সারিতে দন্ডায়মান লোকদের সঙ্গে মুসাফাহা চলতে থাকে। কিন্তু পরে মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেব এ কথা বলে মাঝখানে বাধ সাধেন যে, বিশাল জনসংখ্যার সঙ্গে মুসাফাহা করতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই অবশিষ্ট লোকদেরকে দূর থেকে কেবল সালাম দিয়ে চলে যাই।

ইস্তিকলাল হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। দুপুরের খানার ব্যবস্থা ছিলো স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে। পাকিস্তান থেকে হিযবে ইখতিলাফের

(বিরোধী দলীয়) নেতা মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেবও আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছেছেন। খাওয়ার মজলিসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। দারুল উলূম যাহেদানের এ সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্যে সিরিয়া থেকে উস্তায আদনান দরবেশ, মুহাম্মাদ কাশলান ও আলা উদ্দীন হায়েকও তাশরীফ এনেছেন। সেখানে তাঁদের সঙ্গেও মোলাকাত হয়। আমার গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তাঁরা আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁরা তিনজন নিজেদের ভালোবাসার আবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে এ কথাও বলেন যে, বহুদিন যাবৎ আপনাকে দেখার বাসনা অন্তরে ছিলো। আল্লাহ তাআলা আজ তা পুরো করলেন।

আছরের নামাযের পর দারুল উলূম যাহেদানের বিশাল-বিস্তৃত হল কক্ষে এলাকার আলেমগণের উদ্দেশ্যে আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। আমি সেখানে পৌঁছে দেখি, তাতে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। এমনকি ভীড় গলিয়ে আমাকে মাইক্রোফোনের নিকট যেতে হয়। অনেকে বসার জায়গা পায়নি। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বয়ান শোনে। মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেব বলেন- এ সমাবেশে বেলুচিস্তানই শুধু নয়, বরং খোরাসান, হরমুযগান ও ইরানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বিরাট সংখ্যক আলেম অংশ গ্রহণ করেছেন। তাই আরবীতে বয়ান করাই মোনাসেব হবে, যাতে সকলেই বুঝতে সক্ষম হন। সুতরাং আমি মাগরিব পর্যন্ত ওলামায়ে কেরামের জিম্মাদারী সম্পর্কে আরবীতে বয়ান করি। সমাবেশে আমার পূর্ব-পরিচিত অনেককে উপস্থিত দেখতে পাই । তাঁদের বেশিরভাগ ছিলেন আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষাসমাপনকারী আলেম। বহু বছর পর তাঁদেরকে দেখার সুযোগ হয়। সমাবেশের এ জনসমুদ্রে তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করা এবং কথা বলা সম্ভব ছিলো না। তবে তাঁদের মুখমন্ডলে আনন্দ ও আক্ষেপের যুগপৎ অভিব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে পাঠ করা যাচ্ছিলো। আনন্দ এ কারণে যে, বহুদিন পর তাদের একজন খাদেমের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাতের সুযোগ লাভ হয়েছে। আর আক্ষেপ এ কারণে যে, মানুষের ঢল সরাসরি সাক্ষাৎ ও কথা বলার মাঝে বাধা হয়ে আছে। মাগরিব ও ইশার নামাযের পর কিছু লোকের সঙ্গে অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু এতো বিরাট সংখ্যক লোকের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত সময়ে পৃথকভাবে মিলিত হওয়া ছিলো অসম্ভব।

মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ সাহেব এ অঞ্চলের সর্বজনপ্রিয় আলেমগণের অন্যতম। তিনি হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ বিন্নুরী রহ.-এর শাগরিদ। তিনি 'গাশতে সারাওয়ানে' বড়ো একটি দ্বীনী প্রতিষ্ঠান কায়েম করেছেন। তিনি হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ.-এর তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! তা উন্নতমানে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বাসনা ছিলো, আমি যেন তাঁর মাদরাসায় যাই। সেখানে একদিন

পর তাঁদের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হবে। ইশার নামাযের পর তিনি সমভিব্যাহারে হোটেলে তাশরীফ আনেন। তাঁর লিখিত কিতাবসমূহ আমাকে উপহার দেন। সময় স্বল্পতার কারণে আমি 'গাশতে সারাওয়ানে' যাওয়ার এ আব্দার পুরো করতে পারিনি। 'মেহমানের আরাম আমাদের বাসনা পূরণের উপর অগ্রগণ্য' বলে তাঁরা আমার এ অক্ষমতাকে মেনে নেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর মাদরাসার সে সকল উস্তাযও ছিলেন, যাঁরা আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা সেখানকার কাবেল ও মাকবুল উস্তাযগণের মধ্যে পরিগণিত হন। তাঁদের সঙ্গে মোলাকাতের পর খানা খাওয়ার সময় হলে মাওলানা আব্দুল হাদী ও মাওলানা আব্দুল কাদের আরেফীর প্রস্তাবে আমরা শহরের বাইরে আকর্ষণীয় এক পরিবেশে 'বেরাসান' পার্কে চলে যাই। কয়েকজন বেলুচ ভাই এ পার্কটি তৈরী করেছেন। এখানে তাঁরা কয়েক ধরনের রেষ্টুরেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছেন। একটি রেষ্টুরেন্টে উম্মুক্ত আঙ্গিনায় বিছানো সুদৃশ্য বিছানায় বসে খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আগুনে সেঁকা গোশত এ রেষ্টুরেন্টের বিশেষ আকর্ষণ। রাতের খানা আমরা এখানেই খাই। রেষ্টুরেন্টের যে বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা শুনেছিলাম, বাস্তবেও তেমনই পাই। রেষ্টুরেন্টের মালিক অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে পাশে বসে খানা খাওয়ান। খানার মূল্যও গ্রহণ করেননি। তিনি পার্কের সীমানায় নির্মিত সুদৃশ্য একটি মসজিদ দেখান। যার নকশা থেকে নিয়ে নির্মাণ পর্যন্ত সবগুলো কাজ তিনি নিজহাতে সম্পন্ন করেছেন। ছোট ছোট পাহাড়ী পাথর বিশেষ এক বিন্যাসে সংযুক্ত করে সবগুলো দেয়াল তৈরী করা হয়েছে। যার ফলে দেয়ালগুলোতে এক ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে।

আজ জুমাবার। দারুল উলূম যাহেদানের সমাবেশের শেষ অধিবেশন ছিলো আজকে। সকাল এগারোটার দিকে আমরা সভাস্থলে পৌঁছি। ইতিপূর্বের বছরগুলোতে এ সমাবেশ হতো দারুল উলূমের মসজিদে। কিন্তু এ বছর উপস্থিতির প্রত্যাশিত আধিক্যের কারণে শহরের ঈদগাহে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। পুরো ঈদগাহে সাদা রঙের সামিয়ানা টাঙিয়ে বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা যখন সভাস্থলে পৌঁছি, তখন বেলুচিস্তান প্রদেশের গভর্ণর ইঞ্জিনিয়ার আমিনী ইস্তান্দার ভাষণ দিচ্ছিলেন। তারপর শিয়াদের জুমার ইমাম শাইখ সুলাইমানীর বয়ান হয়। তারপর আমাকে বয়ান করার জন্যে আহবান করা হয়। আমি মঞ্চে পৌঁছে সম্মুখে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কেবল মানুষের মাথা দেখতে পাই। সতর্ক অনুমান অনুপাতে উপস্থিতির সংখ্যা এক লাখের কম ছিলো না। আমি প্রায় এক ঘণ্টা সময় বয়ান করি। তাতে নিম্নোক্ত আয়াতের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করি-

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ أٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ.

'আল্লাহ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্যে থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্যে তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। বস্তুত তারা ছিলো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট।' (আলে ইমরান, ১৬৪)

এ আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী রূপে প্রেরণ করার চারটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

এক. আয়াতসমূহের তিলাওয়াত

দুই. কিতাবুল্লাহর তা'লীম

তিন. হিকমতের তা'লীম

চার. চারিত্রিক পরিশুদ্ধি

এ উদ্দেশ্য চতুষ্টয়কে সামনে রেখে আমি আমার বয়ানে বিশেষ কয়েকটি বিষয় তুলে ধরি।

এক. আমি নিবেদন করি যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনের তা'লীম থেকে তিলাওয়াতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার স্বতন্ত্র একটি উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছেন। এর দ্বারা জানা গেলো যে, কুরআনে কারীমের শুধু তিলাওয়াতও স্বতন্ত্র একটি মহান উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তিলাওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তার উপর ভিত্তি করে তাজবীদ ও কেরাতের গুরুত্বপূর্ণ ইলমসমূহ অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই যারা কুরআনে কারীমের শুধু তিলাওয়াতকে অর্থহীন মনে করে এবং শিশুদেরকে হিফয করানোকে তোতা-ময়নার মতো আওড়ানো বলে আখ্যা দেয়। এ আয়াত দ্বারা তাদের মত ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

দুই. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে কিতাবুল্লাহর শিক্ষক বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। বলা বাহুল্য যে, তিনি কিতাবুল্লাহ্-র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সে সকল সাহাবায়ে কেরামের সামনে তুলে ধরেছেন, যাঁরা পূর্ব থেকেই আরবীতে দক্ষ ছিলেন। কুরআনের অর্থ বোঝার জন্যে কোন শিক্ষকের প্রয়োজন তাঁদের ছিলো না। এতে জানা গেলো যে, কুরআনে কারীমের শুধু অর্থ জানা যথেষ্ট নয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া এর সঠিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও বোঝা সম্ভব নয়। বিধায় যারা শুধুমাত্র কুরআনে কারীমের অনুবাদকে ভিত্তি করে তা থেকে বিধি-বিধান আহরণ ও উদ্ভাবনের চেষ্টা করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এড়িয়ে গিয়ে নিজেদের মনমতো ব্যাখ্যা প্রদান করে তার নাম দেয় 'ইজতিহাদ'- এ আয়াত তাদেরকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে।

তিন. কিতাবুল্লাহর সাথে সাথে হিকমত শিক্ষা দেয়ার দায়িত্বও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আরোপ করা হয়েছে। এতে বোঝা গেলো যে, প্রকৃত হিকমত ও প্রজ্ঞা তাই, যা কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা দিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সব বিষয়ে শুধু বুদ্ধির ব্যবহার প্রকৃত হিকমত ও প্রজ্ঞা নয়।

চার. শুধু কিতাব ও হিকমতের তা'লীমকেও আল্লাহ তাআলা যথেষ্ট মনে করেননি, বরং 'তাযকিয়া' নামে অতিরিক্ত একটি দায়িত্বও তিনি সঁপেছেন। অর্থাৎ, শুধু কিতাব পাঠ করাকে চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্যে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। বরং এর সাথে সাথে হাতে-কলমে তারবিয়াতের মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ চরিত্রের পরিশুদ্ধিকে জরুরী মনে করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা গেলো যে, একজন আলেমের শুধু যাহেরী ইলম অর্জন করেই ক্ষান্ত হওয়া উচিৎ নয়। বরং তার সাথে সাথে চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্যে কোন মুরুব্বীর শরণাপন্ন হওয়াও জরুরী।

পাঁচ. পঞ্চম বিষয় এই তুলে ধরি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করার এ উদ্দেশ্য চতুষ্টয়কে বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পাঁচবার নাম পুরুষের বহুবচনীয় সর্বনাম 'হুম' ব্যবহার করেছেন। যার সরাসরি লক্ষ্য সাহাবায় কেরাম রাযি.। সরাসরি তাঁদেরকে তালীম ও তারবিয়াত দানের জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবীরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, তিনি এসব লক্ষ্য সাধনে সফল হয়েছেন কি না? অন্য কথায় যেই সাহাবায়ে কেরামকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়া এবং তাঁদের চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্যে তিনি নবী রূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, কিতাব ও হিকমতের ইলম তাঁদের লাভ হয়েছিলো কি না? তাঁদের চরিত্র পরিশুদ্ধ হয়েছিলো কি না? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সর্বশেষ নবী- যাঁর পরে কেয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না- নবুওয়াতের ঐ সমস্ত লক্ষ্য অর্জনে নাউযুবিল্লাহ ব্যর্থ হয়েছেন, সে সকল লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাঁকে কিয়ামত পর্যন্তের জন্যে এবং সমগ্র পৃথিবীর জন্যে হেদায়েতের মাধ্যম বানিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং কুরআনে কারীমের চার জায়গায় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যেগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে। আর যদি তিনি এসব লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়ে থাকেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি সফল হয়েছেন তাহলে একথাও মানতে হবে যে, যেই সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সরাসরি তালীম ও তারবিয়াত লাভে ধন্য হয়েছেন, তাঁরা কিতাব ও হিকমতের সমস্ত ইলমের আমানতদার। তাঁদের আমল-আখলাক তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধির কাঙ্খিত মানেও

ছিলো উত্তীর্ণ। বিধায় তাঁদেরকে সম্মান করা এবং তাঁদেরকে ইসলামী তালীমের বাস্তব আদর্শ মনে করা এ আয়াতের স্বাভাবিক দাবী। পক্ষান্তরে তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা বা তাঁদের সাথে সমান্যতম বেয়াদবির আচরণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তালীম ও তারবিয়াতের উপর আপত্তি উত্থাপনেরই নামান্তর।

ছয়. সবশেষে আমি নিবেদন করি যে, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে এ চারটি উদ্দেশ্যকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই এসমস্ত মদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোতে আংশিক সংশোধনযোগ্য বিষয় থাকতে পারে এবং আছেও, কিন্তু সার্বিকভাবে এগুলোকে কটাক্ষ করা এবং এগুলোর মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের উপর আপত্তি করা এ আয়াতের দাবির সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ।

এ ছয়টি বিষয়ের উপর আমি এক ঘণ্টাব্যপী কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করি। মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব ফার্সী ভাষায় বয়ানের তরজমার দায়িত্ব পালন করেন। বিষয়বস্তু ইলমী হওয়ায় সাধারণের মাহফিলের জন্যে আলোচনা ছিলো কিছুটা শুষ্ক। তবে আল্লাহ-প্রদত্ত তাওফীকে তা সাধারণের বোধগম্য করার চেষ্টা করা হয়। সমাবেশের লোকেরা আপাদমস্তক কর্ণ হয়ে তা শ্রবণ করেন। পরবর্তীতে উস্তায আদনান দরবেশ আমার নিকট এসে বলেন যে, আমি আমার এক ইরানী শাগরিদকে আপনার বয়ান সাথে সাথে অনুবাদ করে শোনাতে বলেছিলাম। আমি নিঃসংকোচে বলছি যে, আমারও এ আয়াতের উপরেই আলোচনা করার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু যেসব বিষয় আপনি তুলে ধরেছেন, সেগুলো পর্যন্ত পৌঁছতে আমি সক্ষম হইনি। বিশেষ করে এ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের 'আদালত' তথা নির্ভরযোগ্যতার উপর যেভাবে আপনি দলিল পেশ করেছেন তা ছিলো অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ও ব্যতিক্রমধর্মী । এ তাওফীক দানের জন্যে যাবতীয় প্রসংশা আল্লাহ তা'আলারই।

আমার পর মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেব ও আব্দুল হামীদ সাহেব বয়ান করেন। তারপর সেখানে জুমার নামায আদায় করা হয়। নামাযের পর দস্তারবন্দী ও দোয়ার মাধ্যমে সমাবেশ শেষ হয়।

দূর-দূরান্ত থেকে আগত ওলামায়ে কেরাম, যারা সমাবেশের ব্যস্ততার কারণে আমার সাথে সাক্ষাত করতে পারেননি, তারা আবেদন করেন যে, নির্বাচিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি বিশেষ বৈঠকের ব্যবস্থা করা হোক। সেখানে তাদের সঙ্গে মতবিনিময়ও করা যাবে এবং তাদের প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া যাবে। তাদের আকাঙ্খা ছিলো, তারা আমার থেকে হাদীসের 'ইজাযত' নিবেন। তাই এর জন্যে মাগরিবের পরের সময় নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু ভুল এই হয় যে, সাধারণ সভার মধ্যে এ বৈঠকের কথা ঘোষণা করা হয়। ফলে যখন আমি মাগরিবের নামাযের পর সেই মসজিদে পৌঁছি, যেখানে এ বৈঠকের আয়োজন

করা হয়েছিলো। সেখানেও সমাবেশ একই রূপ ধারণ করে। মসজিদের পুরো হলকক্ষ ভরে যায়। এমতাবস্থায় তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্য লাভ হওয়া সম্ভব ছিলো না। মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেব বাধ্য হয়ে আমাকে বলেন যে, এখন আপনি কছু নসীহত করে দিন। আমি ওলামায়ে কেরামের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও 'হাদীসে মুসালসাল বিল আওয়ালিয়্যাত' এর ইজাযত দেই এবং এ সম্পর্কেই কিছু বয়ান করি। যা ইশার নামায পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

ইশার পর হোটেলেও সাক্ষাতের ধারা অব্যাহত থাকে। উস্তায আদনান দরবেশ সিরিয়ার তরুণ আলেম। তিনি কিছুদিন পূর্বে নিজের 'তাখরীজ' ও 'তাহকীক'সহ 'বাদাইউস সানায়ে' প্রকাশ করেছেন। যাহেদানে অবস্থানকালে তিনি বার বার বলছিলেন যে, আপনার থেকে আমার পরোক্ষভাবে হাদীসের ইজাযত লাভ হয়েছে। কিন্তু আমার দীর্ঘ দিনের আশা, সরাসরি আপনার নিকট থেকে হাদীসের ইজাযত লাভ করবো। তাছাড়া ফিকহী কিছু বিষয়েও আপনার সঙ্গে কথা বলতে হবে। ইশার নামাযের পরেও তিনি তাশরীফ আনেন। তাঁকে আমি হাদীসের ইজাযত দেই। ফিকহী কিছু বিষয়ের উপরেও কথাবার্তা হয়।

মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব আমাদের দারুল উলূম থেকে শিক্ষাসমাপন করেছেন। দারুল উলূম যাদের নিয়ে গর্ব করতে পারে, তিনি তাদের অন্যতম। মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেবের উক্তি মতে তিনি শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত করার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছেন। তাঁর ইচ্ছায় পরের দিনের নাশতা তাঁর বাড়িতে হয়। দারুল উলূম যাহেদানের একেবারে সংলগ্ন তাঁর বাড়ি। নাশতার পর তিনি দারুল উলূমের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করান। এটি দেখে মন আনন্দে ভরে যায় যে, মাশাআল্লাহ! তাঁরা এ প্রতিষ্ঠানে শুধু ইরানেরই নয়, বরং বাইরের মুসলমান ও তালিবে ইলমদের প্রয়োজন সম্পর্কেও অত্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সমীক্ষা চালিয়ে তাদের শিক্ষার পূর্ণতার জন্যে বিভিন্ন শাখাও প্রতিষ্ঠা করেছে। মাদরাসার কুতুবখানাও সুবিশাল ও আধুনিক সুবিধাদি দ্বারা সুসজ্জিত। এর রচনা ও অনুবাদ বিভাগ থেকে অনেকগুলো কিতাব প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে আমার অনেকগুলো কিতাবের অনুবাদও অন্তর্ভুক্ত। মেয়েদের শিক্ষার পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। একটি বিভাগ রয়েছে সমাজসেবামূলক। একটি শাখা রয়েছে এমন, যার কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা মতে অন্য কোন মাদরাসায় নেই। তারা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা করে থাকেন। ফলে তারা বিভিন্ন দ্বীনী, দাওয়াতী ও ইসলাহী প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে থাকেন। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের ধর্মীয় মন-মানসিকতা তৈরী করার কাজ এ বিভাগের মাধ্যমে

সম্পাদন করা হয়ে থাকে। অন্যান্য মাদরাসার জন্যে এ ধরনের কাজ অবশ্যই অনুসরণীয়।

'মাশহাদ' শহরে

সেদিনই বেলা সাড়ে এগারোটার বিমানে আমরা মাশহাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। একটার দিকে মাশহাদ পৌঁছি। এটি খোরাসান প্রদেশের রাজধানী। শহরটির এ নাম সম্ভবত সফবীদের শাসনকালে হযরত আলী বিন মুসা রেযা রহ.-এর মাযারের কারণে রাখা হয়। শহরটি পূর্বে 'তুস' নামে বিখ্যাত ছিলো। তখন 'তাবরান' ও 'তাওকান' নামের দু'টি শহরের সমন্বয়কে 'তুস' বলা হতো। এ অঞ্চলটি হযরত ওসমান রাযি.-এর খেলাফতকালে বিজিত হয়। যৌবনকালে তুস নাগরিক সুযোগ-সুবিধার দিক থেকেও উন্নত নগরীর মধ্যে পরিগণিত হতো। জ্ঞান-গরিমা ও রাজনৈতিক দিক থেকেও এর ছিলো বিরাট গুরুত্ব। এখানে অনেক খ্যতিমান জ্ঞানী-গুণী জন্মেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম গাযালী রহ. সর্বাধিক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। তাছাড়া এ শহরই নিযামুল মুলক তুসী রহ.-এর মাতৃভূমি। যাকে জ্ঞান-গরিমা, রাজনীতি ও শাসনক্ষমতায় ইতিহাসের এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব স্বীকার করা হয়। তিনি শাহ্ সলযুকীর উজির ছিলেন। কিন্তু বাদশাহ রাজ্যের সমস্ত কাজ তাঁর হাতেই ন্যস্ত করেন। নিযামুল মুলক রহ. একদিকে রাজ্যের বিস্তৃতি ও উন্নতি ঘটান, অপরদিকে আদর্শমানের শান্তি-নিরাপত্তা ও নিয়ম-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যে এমন কোন শহর ছিলো না, যেখানে তার নির্মাণ করা মাদরাসা ছিলো না। নিযামুল মুলক তুসী রহ. শিক্ষাক্ষেত্রে নিজ সম্পদের এক দশমাংশ ওয়াক্ফ করেছিলেন।

মোটকথা, তুস ছিলো ইসলামের অনেক বড়ো কেন্দ্র। আমাদের হাতে সময় কম ছিলো বলে আমরা বিমানবন্দর থেকে হোটেলে না গিয়ে তুসের প্রাচীন শহর তাবরান চলে যাই। সেখানে প্রাচীন ইতিহাসের কিছু নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। আমরা শহরের প্রাচীন এলাকায় প্রবেশ করে বুরুজের ন্যায় একটি ভবন দেখতে পাই। ভবনটি এখানে 'হারুনিয়া' নামে বিখ্যাত। এর সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, হারুনুর রশীদ বন্দীখানা হিসেবে এটি বানিয়েছিলেন। সম্ভবত রাজবন্দীদেরকে এখানে নির্জনে আটক করে রাখা হতো। কিন্তু আমরা ভবনটিতে প্রবেশ করে সেখানকার প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের একটি লেখা দেখতে পাই, যার মধ্যে এর প্রতিবাদ করা হয়েছে। এমনিতেও ভবনটি এমন জাঁকালো যে, তা দেখে বন্দীখানা মনে হয় না। ভবনের বাইরে কবরের মতো একটি প্রাচীর রয়েছে। তার উপর ইমাম গাযালী রহ.-এর নামের সঙ্গে একথাও লেখা রয়েছে যে, তিনি এখানে অবস্থান করতেন। এটি ইমাম গাযালী রহ.-এর কবর বলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধি রয়েছে। তবে ভবনটি বন্দীখানা না হয়ে কোনো খানকা হিসেবে নির্মিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ইমাম গাযালী রহ.

সম্পর্কে প্রমাণিত রয়েছে যে, শেষ জীবনে তিনি নির্জনবাসী হয়েছিলেন। হয়তো এটাকেই তিনি নির্জনবাসের জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন। আমাদের সঙ্গে খোরাসানের কিছু আলেম ছিলেন, তাঁরা বলেন- ইমাম গাযালী রহ.-এর কবর রয়েছে মূলত অন্য এক জায়গায়। যা এখান থেকে কিছু দূরে অবস্থিত।

আমরা এখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ফার্সী ভাষার বিখ্যাত কবি ফেরদৌসীর মাযার দেখতে পাই। ইনি সেই ফেরদৌসী, যার 'শাহনামা' ইরানের বিজয়গাঁথা সম্বলিত প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। এটাকে ফার্সী সাহিত্যের রাজকীর্তি মনে করা হয়।

আরো সম্মুখে অগ্রসর হলে প্রাচীন নগররক্ষা প্রাচীরটি ভগ্নাবস্থায় দেখা যায়। তার ভিতরে কিছু উঁচু ভবনের ধ্বংসাবশেষ তাদের যৌবনকালের শান-শওকতের সাক্ষ্য দিচ্ছিলো। এখান থেকে বের হলে একটি ময়দান রয়েছে। সেই ময়দানের মধ্যে জীর্ণ-শীর্ণ একটি কবরের আলামত চোখে পড়ে। পাশে একটি ফলক পড়ে রয়েছে। তাতে লেখা আছে- 'এটি ইমাম গাযালী রহ.-এর কবর।' কথাটি কতোটুকু সঠিক, তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে তাঁর জীবনীকারগণ (যেমন, আল্লামা সুবকী রহ.) যে, লিখেছেন- তাঁর কবর তাবরান শহরের বাইরে ময়দানের মধ্যে অবস্থিত। সে দৃষ্টিকোণ থেকে এ জায়গাটিতে তাঁর কবর হওয়া 'হারূনিয়া'র তুলনায় অধিক যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

যাইহোক, ইমাম গাযালী রহ. ('গায্যালী' ['যা'র উপর 'তাশদীদ'যোগে] এবং 'গাযালী' ['তাশদীদ' ছাড়া] দুই রকমই পড়া হয়। প্রথমটি তাঁর পিতার পেশার দিকে সম্বন্ধ করে- তাঁর পিতা সুতার ব্যবসা করতেন। দ্বিতীয়টি (আল্লামা সাম'আনী রহ.-এর উক্তি মতে) ঐ গ্রাম বা মহল্লার নাম, যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে বেশিরভাগ গবেষক প্রথমটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।)-এর কবরে পৌঁছে তাঁর স্মরণ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তিনি ৪৫০ হিজরীতে এখানে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর এখান থেকে 'জুরজান' গিয়ে ইমাম আবূ নসর ইসমাঈলীর নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি উস্তাযের পাঠসমূহ লিখে সংরক্ষণ করে সাথে নিয়ে আসেন। এ শিক্ষাভাষণ সম্পর্কে ইমাম গাযালী রহ.-এর ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, পথে ডাকাতদল হামলা করে তাঁর সমস্ত মাল-সামানা ছিনিয়ে নেয়। তার মধ্যে সে লিখিত শিক্ষাভাষণগুলোও ছিলো। তিনি ডাকাতদলের সরদারের কাছে আবেদন করেন যে, তুমি সবকিছু রেখে দাও, কিন্তু শিক্ষাভাষণ লেখা আমার সংকলনটি ফিরিয়ে দাও। এটি তোমার কোন কাজে আসবে না। ডাকাতদলের সরদার এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, আমি মাতৃভূমি ছেড়ে দীর্ঘদিন যে ইলম অর্জন করেছি, তা এই সংকলনটির মধ্যে সংরক্ষিত রয়েছে। এ কথা শুনে ডাকাতদলের সরদার ঠাট্টা করে বলে যে, এটা কী ধরনের ইলম, যা কাগজের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে।

কাগজ হাতছাড়া হয়ে গেলে ইলমও হাতছাড়া হয়ে যায়? একথা বলে কাগজগুলো ফিরিয়ে দেয়। তার এ কথা ইমাম গাযালী রহ.-এর মন-মস্তিষ্কে গভীর প্রভাব ফেলে। তিনি নিজেই বলেন যে-

هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى به فى أمرى، فلما وافيت طوس أقبلت على الإشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته، وصرت بحيث لو قطع على الطريق لم أتجرد من علمى. (طبقات الشافعية للسبكى: ص:١٠٣ ج:٤)

'আল্লাহ তাআলা আমার হেদায়েতের জন্যে তার মাধ্যমে এ কথা বলিয়েছেন। 'তুস' পৌঁছার পর আমি তিন বছর পর্যন্ত বক্তৃতাগুলি মুখস্থ করতে থাকি। অবশেষে সবগুলি বক্তৃতা মুখস্থ করি। এখন যদি আমার উপর ডাকাতদলের হামলা হয়, তাহলে আর আমি ইলম শূন্য হবো না।'

তারপর আল্লাহ তাআলা তাঁকে জ্ঞান-গরিমার এমন উচ্চাসন দান করেন যে, তাঁর সম্মুখে বড়ো বড়ো লোক নতি স্বীকার করেন। পাঠদান ও গ্রন্থ রচনা উভয় অঙ্গনেই আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বারা এমন সংস্কারমূলক কাজ নিয়েছেন, যা খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জোটে। নিযামুল মুলকের মূল্যায়নের ফলে তিনি উচ্চস্তরের পদ-পদবিও লাভ করেন। কিন্তু অবশেষে সে সব পদ-পদবি পরিত্যাগ করে তিনি ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার জীবন বরণ করেন। এরই মধ্যে তিনি 'ইহইয়াউল উলূম'-এর মতো মহান কিতাব সংকলন করেন। 'তাহাফাতুল ফালাসিফা' লিখে গ্রীক দর্শনকে ছিন্নভিন্ন করে দেন। ফিক্হ, উসূলে ফিক্হ, আকায়িদ, কালাম ও তাসাওউফ শাস্ত্রে এমন সংকলন ভান্ডার তিনি রেখে যান, যা থেকে কোন তালিবে ইলমই অমুখাপেক্ষী হতে পারে না। আল্লামা নববী রহ. নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে লেখেন যে, তিনি হিসেব করে দেখেছেন, তাঁর জীবনের দিনগুলোকে তাঁর লিখিত পৃষ্ঠাসমূহের উপর ভাগ করা হলে প্রতিদিন গড়ে ষোল পৃষ্ঠা হয়। (আল গাযালী, শিবলী নুমানী কৃত, ৩৭)

ইমাম গাযালী রহ.-এর ভাই আহমাদ আবুল ফাতুহ আল গাযালী রহ.ও উচ্চস্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি তাঁর ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, ফজরের নামাযের পর তিনি নিজের কাফনের কাপড় হাতে নিয়ে চোখের উপর রেখে বলেন- 'বাদশাহর দরবারে উপস্থিতির জন্যে নতশীরে প্রস্তুত।' এরপর তিনি শুয়ে পড়েন এবং সূর্যোদয়ের পর ইনতিকাল করেন। (তবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ, ৪/১০৬)

তুস থেকে ফিরে এসে আমরা 'কসর' হোটেলে পৌঁছি। হযরত আলী রেযা রহ.-এর মাযারের সন্নিকটে এটি অবস্থিত। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আসর পর্যন্ত আমরা এখানে বিশ্রাম করি। আমাদের সঙ্গীরা বলেন যে, 'নিশাপুর' এখান থেকে মাত্র একশ' কিলোমিটার দূরে। সে পর্যন্ত পরিচ্ছন্ন

সড়ক পথ রয়েছে। তাই আমরা আছরের নামাযের পর নিশাপুর যাওয়ার ইচ্ছা করি। মাগরিবের কাছাকাছি সময়ে আমরা সেখানে পৌঁছি।

নিশাপুরে

নিশাপুর আলমে ইসলামের সেই মহিমান্বিত শহরগুলোর অন্যতম, যার মাটি থেকে এতো অধিকসংখ্যক জ্ঞানী-গুণী জন্ম গ্রহণ করেছেন, যা গণনা করা দুষ্কর। শহরটি জলবায়ু, প্রাকৃতিক উপাদান ও স্বর্ণপ্রসবা হওয়ার দিক থেকেও জগতজোড়া বিখ্যাত ছিলো। এখানকার ভূমিতে এক ধরনের মাটি হতো, যা মানুষ ভক্ষণ করতো এবং রাজা-বাদশাহের দরবারে উপঢৌকন পাঠাতো। তাছাড়া এখানে ফিরোজা পাথরও অধিক পরিমাণে উপৎন্ন হতো। (আসারুল বিলাদ, কাযবীনী কৃত, ৪৭৩)

যে সমস্ত খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব এ শহরে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের শুধু নাম লিপিবদ্ধ করাও এ সফরনামায় সম্ভব নয়। তবে তাদের মধ্যে সর্বোজ্জ্বল নাম ইমাম মুসলিম রহ.-এর। যাঁর সহীহ মুসলিম সহীহ বুখারীর পর হাদীসের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য কিতাবরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ইমাম বুখারী রহ. নিজেও দীর্ঘদিন এখানে পাঠদান করেছেন। তাছাড়া মুহাদ্দিসগণের মধ্যে 'মুস্ত াদরাকে'র গ্রন্থকার ইমাম হাকেম রহ., সুনানের গ্রন্থকার ইমাম বায়হাকী রহ., মুফাসসিরগণের মধ্যে ইমাম আবু মনসুর রহ. (তাফসিরুস সাআলেবী ও ফিকহুল লুগাতের গ্রন্থকার), ওয়াহেদী রহ. (আসবাবুন নুযুল ও শরহে দিওয়ানুল মুতানাব্বির গ্রন্থকার), ফকীহ্গণের মধ্যে ইমামুল হারামাইন আল জুয়াইনী রহ., সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে আবুল কাসেম কুশাইরী রহ. (আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া-এর লেখক), আবু আলী দাক্কাক রহ. ও খাজা ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ., দার্শনিক ও কবিদের মধ্যে ওমর খৈয়াম এ ভূখন্ডে জন্মগ্রহণ করেন। নিযামুল মুলক তুসী রহ. বাগদাদের পূর্বে নিশাপুরে নিযামিয়া মাদরাসার ভিত্তিস্থাপন করেন। এখানকার নিযামিয়া মাদরাসাকে শিক্ষার মানের দিক থেকে আদর্শ মাদরাসা মনে করা হতো। এখানে পড়া ও পড়ানো বিরাট সম্মানের বিষয় ছিলো। ইমাম গাযালী রহ. বাগদাদের নিযামিয়া মাদরাসায় পাঠদান করেন। শেষ বয়সে তিনি নিশাপুরের নিযামিয়া মাদরাসাতেও পাঠদান করেন। ইমামুল হরামাইন আল জুয়াইনী রহ. (যার পুরো নাম আব্দুল মালিক বিন আব্দুল্লাহ আবুল মাআলী) নিশাপুরের নিযামিয়া মাদরাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নিশাপুরের উপকণ্ঠে জুয়াইন নামে এখনো একটি জনবসতি রয়েছে। সেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি চার বছর মক্কা শরীফে অবস্থান করেন। মক্কা মোকাররমা ও মদীনা তাইয়্যেবা থেকে তাঁর নিকট ফাতাওয়া চাওয়া হতো এবং তাঁর ফাতাওয়া উভয় স্থানে গ্রহণ করা হতো। এ কারণে তাঁকে 'ইমামুল হারামাইন' উপাধি দেওয়া হয়। তাঁর নামের চেয়ে তা অধিক প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

ইমাম গাযালী রহ. প্রথম জীবনে নিযামিয়া মাদরাসায় তাঁর নিকট পাঠ গ্রহণ করেন। (এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ৬/৯৫ ও তবাকাতুশ শাফেইয়্যাহ তৃতীয় খন্ড দ্রষ্টব্য)।

আক্ষেপের বিষয় হলো, যে শহরকে যথার্থই 'মাদীনাতুর রিজাল' বা মনীষীদের নগরী বলা উচিৎ, সেখানে এখন তাঁদের কোনো নিদর্শন অবশিষ্ট নেই। খ্যাতিমানদের মধ্যে শুধুমাত্র খাজা ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. ও ওমর খৈয়ামের মাযার গুরুত্বের সাথে অবশিষ্ট রাখা হয়েছে। আমরা যখন নিশাপুরে প্রবেশ করি, তখন মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে গিয়েছিলো। নামায পড়া নিয়ে চিন্তা করছিলাম। ঘটনাক্রমে নামাযের জন্যে নিকটতম যে জায়গাটি আমরা পাই, তা ছিলো শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর মাযারের সীমানা। মাযারের পাশে একটি সুদৃশ্য বাগান রয়েছে। আমরা সেখানে মাগরিবের নামায আদায় করি। অতঃপর মাযারে সালাম পেশ করি।

হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর 'পান্দেনামা' আমরা একেবারে শিশুকালে পাঠ্যপুস্তকরূপে পড়েছিলাম। যার এ কবিতাগুলো কোনোভাবেই ভোলার মতো নয়।

پادشاہا! جرم ما را در گذار
ما گنہگاریم و تو آمرزگار
تو نیکوکاری و ما بد کردہ ایم
جرم بے اندازہ و بے حد کردہ ایم
بر در آمد بندۂ بگریختہ
آبروئے خود ز عصیاں ریختہ
بے گنہ نہ گذشت بر من ساعتے
با حضور دل نہ کردم طاعتے

'হে প্রভু! আমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দাও।
আমরা হলাম গুনাহগার, আর তুমি হলে ক্ষমাশীল।
তুমি করো দয়া, আর আমরা করি অপরাধ।
কল্পনাতীত ও সীমাহীন অপরাধ আমরা করেছি।
পলাতক গোলাম আজ তোমার দুয়ারে হাজির।
গুনাহের কালিমায় নিজের মর্যাদা কালিমালিপ্ত করে।
আমার একটি মুহূর্তও গুনাহ ছাড়া অতিবাহিত হয়নি।
একটি ইবাদতও মনের একাগ্রতার সাথে করিনি।'

সহজ-সরল কিন্তু হৃদয়নিংড়ানো এ কবিতাগুচ্ছের মধ্যে এমন প্রভাব রয়েছে যে, 'মুলতাযামে' হাজির হলে তা বার বার মুখে উচ্চারিত হতে থাকে।

সম্ভবত ৫১৩ হিজরীতে হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর জন্ম হয়েছিলো। তাঁর সম্পর্কে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একটি দাওয়াখানার মালিক ছিলেন। একবার তিনি ব্যবসার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এক ফকির এসে হাঁক ছাড়ে। তিনি কাজে মগ্ন থাকেন। তার দিকে মনোযোগ দেন না। সে বার বার হাঁক ছাড়তে থাকে। হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. তার দিকে মনোযোগী হলে ফকির লোকটি বলে যে, 'তোমার জান কী রূপে বের হবে?' তিনি ঝাঁজালো কণ্ঠে বলেন- 'তোমার জান যেভাবে বের হবে!' তখন ফকির লোকটি তার ভিক্ষার পাত্র মাটিতে রেখে শুতে শুতে বলে যে, 'আমার জান তো এভাবে বের হবে।' এ কথা বলে সে কালেমা পড়ে এবং তার রূহ বের হয়ে যায়।

হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর উপর এ ঘটনার এতো বেশি প্রভাব পড়ে যে, তিনি ব্যবসা-বানিজ্য ছেড়ে দরবেশীর জীবন গ্রহণ করেন এবং হযরত রুকনুদ্দীন আকাফ রহ.-এর খেদমতে কয়েক বছর অবস্থান করেন। অবশেষে হযরত শাইখ মাজদুদ্দীন বাগদাদী রহ.-এর হাতে বাইআত হন। (এ ঘটনা মাওলানা জামী রহ. 'নাফাহাতুল উনস' কিতাবেও 'কথিত আছে' শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন।- হায়াতে সুফিয়া তরজমায়ে নাফাহাত, পৃঃ ৭৩৮)

ঘটনাটি কতোটুকু সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তা আল্লাহই ভালো জানেন। তবে আল্লাহ তা'আলা কতক সময় কাউকে اَللّٰهُ يَجْتَبِىْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ (আল্লাহ তআলা যাকে চান বাছাই করে নেন।) মূলনীতির ভিত্তিতে হেদায়েত দান করার জন্যে 'গাইবী লতীফা' পাঠিয়ে থাকেন। যেমন হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. ও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর ব্যাপারেও এমনটি হয়েছিলো। তাই হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর সাথেও এমন ঘটনা ঘটা অসম্ভব নয়। হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। তাতারীদের হাতে তিনি শহীদ হন। এ কথা দ্বারা তাঁর মহান মর্যাদা অনুমান করা যায় যে, হযরত মাওলানা রূমী রহ. ('মসনবী'র গ্রন্থকার) তাঁর সম্পর্কে বলেন-

ہفت شہر عشق را عطار گشت
ما ہنوز اندر خم یک کوچہ ایم

এবং

عطار روح بود سنائی دو چشم او
ما در پس سنائی و عطار آمدیم

মাওলানা রূমী রহ. বলখ যাওয়ার পথে হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিশাপুর যাত্রা বিরতি করে তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলার নিকট তাঁর এ ওলীর মর্যাদা যে, কতো, তা আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কী করে বুঝতে পারবে? তবে আমার মতো অনুভূতিহীন মানুষও একটি বিষয় অনুভব করি যে, হযরত ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ. যে জায়গায় বিশ্রাম করছেন, সেখানে এমন এক প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও আনন্দ বিরাজ করছে, যা খুব কম জায়গাতেই অনুভূত হয়েছে। এটিকেও হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর কারামতই বলা যেতে পারে যে, শিয়ারা (ভুলক্রমে) তাঁকে শিয়া মনে করে থাকে। আর একারণেই হয়তো গুরুত্বের সাথে তাঁর মাযার ঠিক রেখেছে। কিন্তু তাঁর মাযারে সে সমস্ত বিদআত ও ভিত্তিহীন কর্মকান্ড দেখা যায় না, যেগুলো ইরানের অন্যান্য মাযারে চোখে পড়ে। (স্মর্তব্য যে, তাঁকে শিয়া বলা সম্পূর্ণরূপে ভুল। তাঁর রচিত 'তাযকিরাতুল আওলিয়া' গ্রন্থে হযরত ইমাম জাফর সাদেক রহ.-এর জীবনী এবং খলীফাত্রয়ের স্তুতিগাঁথায় রচিত তাঁর কবিতাসমূহ পাঠ করলেই তা পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে। তবে তিনি আহলে বাইতের ব্যাপারে বিশেষ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। যা প্রত্যেক মুসলমানেরই ঈমানের অঙ্গ।) হযরত শাইখ ফরীদ উদ্দীন আত্তার রহ.-এর কবরের দেয়ালে নিম্নোক্ত কবিতাগুচ্ছ লেখা রয়েছে। জানি না সেগুলো তাঁরই রচিত, না অন্য কারো! তবে কবরের ডাক হিসেবে তা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী।

گرت در جام دل خونیست برخیز
ز چشم خوں فشاں بر حال ما ریز
کہ بعد از عزیزان وفادار
بے حال ما فرو گویند بسیار
کنند از دل بہ سوئے ما خطابے
ولے از گور ما ناید جوابے
بسے خونہا بخوردند و بہ رفتند
بے درد و غصہ زیر حال خفتند

তোমার হৃদয়-পেয়ালায় যদি লহু থাকে
তবে দাঁড়িয়ে যাও!
রক্তঝরানো চক্ষু থেকে আমার জন্যে
কিছু রক্ত ঝরাও!
আমার মৃত্যুর পরে বিশ্বস্ত

আপনজনেরা
আমার সম্পর্কে কতো কথাই না বলবে!
মনে মনে আমাকে সম্বোধন করে কতো আহ্বানই না
তারা করবে!
কিন্তু আমার সমাধি থেকে তার
কোন উত্তরই আসবে না।
অন্তর্জ্বালা অন্তরে ধারণ করে
তারা ফিরে যাবে।
অবশেষে তারা আমাকে চিরতরে ভুলে যাবে
এবং নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়বে।

আমরা ইশার নামাযও তাঁর মাযার সংলগ্ন বাগানে আদায় করি। তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হই। পথে ওমর খৈয়ামের মাযারও দেখতে পাই। যার চতুর্পদীকে ফার্সি সাহত্যের মূল্যবান সম্পদ মনে করা হয়। তাঁর দর্শন ও বিজ্ঞানেরও অনেক খ্যাতি রয়েছে। তার আমল-আকীদা সম্পর্কে বিপরীতমুখী কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, নিশাপুরে মনীষীগণের স্মৃতি ও কীর্তির বীজসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু আমার ইচ্ছা জাগলো, এখানে যখন উপস্থিত হয়েছি, কিছু সময় এর বাতাসেই ঘুরে বেড়াই। না জানি কতো আল্লাহ ওয়ালার পবিত্র আত্মা এবং তাঁদের যিকিরের সৌরভ এর বাতাসে সংরক্ষিত রয়েছে! (এখন তো বিজ্ঞানও বলে যে, মুখ থেকে নির্গত কোন শব্দ বিলীন হয় না। বাতাসে সেগুলো সংরক্ষিত থাকে।) তাই আমরা নিশাপুরের প্রাচীন এলাকায় যাই। ইচ্ছে ছিলো, প্রাচীন কোন কবরস্তানে গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদেরকে সালাম দিবো এবং ঈসালে সওয়াব করবো। নিশাপুরের এ সফরে খোরাসানের তিনজন আলেম- মাওলানা শিহাবুদ্দীন শহীদী (ফাযেলে দারুল উলূম করাচী), মাওলানা আব্দুল্লাহ মুয়াহ্হিদী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান মাযহারীও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তারা কতক অবহিত মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে আমাদেরকে একটি প্রাচীন কবরস্তানের ঠিকানা বলে দেন এবং সাথে এ কথাও বলেন যে, সম্ভবত ঐ কবরস্তানে ইমাম মুসলিম রহ.-এর কবরও রয়েছে। নতুন শহরের বাইরে প্রাচীন ও সুদূর বিস্তৃত কবরস্তান এটি। এর শুরুতেই ফযল ইবনে শাযান নামে একটি কবর রয়েছে। ফযল ইবনে শাযান-এর ব্যক্তিত্ব এ দিক থেকে বিতর্কিত যে, শিয়ারা তাঁকে শিয়া বলে, আর কতক সুন্নী তাঁকে সুন্নী আখ্যা দেয়। আর হাশবিয়ারা তাঁকে তাদের মতাদর্শী মানে। (ফিহরিস্তে ইবনুন নাদীম, পৃঃ ৩৮১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত) অনেক কিতাবের সম্বন্ধই তাঁর দিকে করা হয়ে থাকে। যার কতোগুলো শিয়া মতাদর্শের, আর কতক সুন্নী

মতাদর্শের। (মু'জামু রিজালিল হাদীস, সাইয়্যেদ আবুল কাসেম খুয়ী কৃত, কুম থেকে মুদ্রিত, পৃঃ ২৯১, খন্ডঃ ৩)

যাইহোক, প্রাচীন এ কবরস্তানে পূর্বযুগের আলেম ও ওলীগণেরও মাযার থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। অসম্ভব নয় যে, ইমাম মুসলিম রহ.-ও এখানেই শায়িত আছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। এ কবরের পাশেই ছোট একটি পার্ক রয়েছে। আমাদের সফরসঙ্গী মাওলানা রশীদ আশরাফ সাহেব, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব, মাওলানা আব্দুল্লাহ কাদের আরেফী, মাওলানা আব্দুল হাদী, খোরাসানের মাওলানা শিহাবুদ্দীন শহীদী, মাওলানা আব্দুল্লাহ মুয়াহ্হিদী ও মাওলানা হাবীবুর রহমান মাযহারী মিলে পীড়াপীড়ি করতে আরম্ভ করেন যে, নিশাপুর মুহাদ্দিসীনে কেরামের শহর ছিলো, তাই এ পার্কে বসে বরকতের জন্যে আপনি আমাদেরকে কোন হাদীস শুনান। মাওলানা মুহাম্মাদ কাসেম সাহেব প্রস্তাব করেন যে, তাঁকে 'হাদীস মুসালসাল বিল মুসাফাহা' শুনিয়ে যেন 'ইজাযত' দেই। আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি। 'হাদীস মুসালসাল বিল মুসাফাহা' শুনিয়ে সবার সঙ্গে মুসাফাহা করি এবং তাঁদেরকে এর ইজাযত দেই। নিশাপুরের এ সফর এতো আনন্দপূর্ণ ও মনোমুগ্ধকর হয় যে, কয়েকদিনের বিরতিহীন সফরের ক্লান্তি সত্ত্বেও মনে অস্বাভাবিক ভাব ও আবেগ বিরাজ করছিলো। অনেক রাতে আমরা মাশহাদে ফিরে আসি।

পরদিন ভোরে ফজরের নামাযের সাথে সাথে হযরত আলী রেযা রহ.-এর মাযারে যাই। মাযারটি আমাদের হোটেলের সন্নিকটেই ছিলো। এ জায়গার নাম 'সানাবায'। এটি 'তুস'-এর উপকণ্ঠ। আমরা হযরত আলী রেযা রহ.-এর মাযারে যাওয়ার জন্যে যিয়ারতকারীদের ভিড় তুলনামূলক কম হওয়ার আশায় এসময় নির্বাচন করি। বাস্তবেও তাই হয়। এটি তো কবর নয়, যেন এক বিশাল মহল। যার মধ্যে মসজিদও আছে এবং হযরত আলী রেযা রহ.-এর মাযারও আছে। হযরত আলী রেযা রহ. হযরত মূসা কাযেম রহ.-এর সাহেবযাদা। আমি 'জাহানে দীদা'য় ইরাক সফরের অধীনে তাঁর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। তিনি হযরত হুসাইন রাযি.-এর ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ। ১৫১ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার সাথে সাথে অনেক বড়ো আলেম ও বুযর্গ ব্যক্তি ছিলেন। সুনানে ইবনে মাজায় তাঁর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন যে, তাঁর বয়স যখন মাত্র বিশ বছরের একটু বেশি, তখন থেকে তিনি মসজিদে নববীতে ফাতাওয়া দিতে আরম্ভ করেন। হাদীস রেওয়াতের সঙ্গে তাঁর বেশি নিমগ্নতা ছিলো না। তাঁর থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদের বেশির ভাগই 'যয়ীফ'। (তাহযীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩৮৭, খন্ড- ৭)

বাদশাহ মামুনুর রশীদ তাঁর খুবই ভক্ত ছিলেন। একবার হযরত আলী রেযা রহ.-এর ভাই যায়েদ ইবনে মূসা বসরায় মামুনুর রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেখানে বেশ রক্তপাত ঘটান। মামুনুর রশীদ হযরত আলী রেযা রহ.-কে সেখানে পাঠান। তিনি নিজের ভাইকে তিরস্কার করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, মুসলমানদের মাঝে রক্তপাত ঘটানোর কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। মামুনুর রশীদ বিষয়টি জানতে পেরে কেঁদে ফেলেন এবং বলেন- আহলে বাইত এতো মহৎ হয়ে থাকেন! মামুনুর রশীদ তাঁকে খোরাসান আসার দাওয়াত দেন। ২০২ হিজরীতে তিনি নিজ কন্যা উম্মে হাবীবাকে হযরত আলী রেযা রহ.-এর সঙ্গে বিবাহ দেন এবং তাঁকে যুবরাজ মনোনীত করেন। ঘটনাটি এভাবে ঘটে যে, সে সময় বনু আব্বাসের হাতে খেলাফত চলে আসছিলো। তিনি বনু আব্বাসের সকলকে মার্ভ শহরে একত্রিত করেন। সেখানে হযরত আলী রেযা রহ.-কেও দাওয়াত করেন এবং সর্বসম্মুখে ঘোষণা করেন যে, আমি উপস্থিত সকলের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার পর এ সিদ্ধন্তে উপনীত হয়েছি যে, বর্তমান সময়ে খেলাফতের জন্যে হযরত আলী রেযা রহ.-এর চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই। তখন তাঁর হাতে বাইআত করা হয় এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর উপাধি দেওয়া হয় 'আর রেযা'। তখন তিনি বনু আব্বাসের প্রতীক কালো পোশাক ও কালো ঝান্ডা পরিবর্তন করে সবুজ পাগড়ী ও সবুঝ ঝান্ডা ধারণ করেন। মামুনুর রশীদের এ পদক্ষেপে বনু আব্বাস ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। তারা মামুনুর রশীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু মামুনুর রশীদ নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। কিন্তু মামুনুর রশীদের জীবদ্দশাতেই এবং খলীফা হওয়ার সুযোগ আসার আগেই ২০৩ হিজরীতে হযরত আলী রেযা রহ.-এর ইনতিকাল হয়। কেউ কেউ বলেন যে, তিনি অনেক বেশি আঙ্গুর খাওয়ার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ইনতিকাল করেন। আর কেউ কেউ ধারণা করেন যে, বনু আব্বাসের লোকেরা তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুতে মামুনুর রশীদ অত্যন্ত ব্যথিত হন। তিনি স্বীয় পিতা হারুনুর রশীদের কবরের পাশে একটি বাগানে তাঁকে সমাহিত করেন। (ওয়াফইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খলকান কৃত, পৃঃ ২৬৯-২৭০, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ইমাম যাহাবী কৃত, পৃঃ ৩৮৭, খন্ড-৯)

পরবর্তীতে হারুনুর রশীদের কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এখন কারো জানা নাই যে, তার কবর কোথায় ছিলো। কিন্তু হযরত আলী রেযা রহ.-এর কবর বিশেষ ও সাধারণ নির্বিশেষের যিয়ারতকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। হাফেয ইবনে হাজার রহ. আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে মুয়াম্মিলের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে-

خرجنا مع امام اهل الحديث ابی بكر ابن خزيمة عديله ابی علی الثقفی مع جماعة

من مشائخنا، وهم اذ ذاك متوافرون، الی زيارة قبر علی ابن موسی الرضا بطوس.

قال: فرأيت من تعظيمه يعنى إبن خزيمة لتلك لبقعة وتواضعه لها وتضرعه عندها ما تحيرنا

'আমরা আহলে হাদীসের ইমাম আবু বকর ইবনে খুযাইমা রহ., তাঁর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস আবু আলী সাকাফী রহ. এবং আমাদের মাশায়েখের একটি জামাতের সঙ্গে (সে যুগে তাঁদের অনেকেই জীবিত ছিলেন) 'তুসে' হযরত আলী ইবনে মুসা রহ.-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাই। তখন আমি হযরত ইবনে খুযাইমা রহ.-কে সে জায়গার এতো অধিক সম্মান করতে এবং এতো বিনয় ও কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করতে দেখি যে, আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। (তাহযীবুত তাহযীব, ৭/৩৮৮)

কিন্তু বর্তমানে সেখানে বিদআত, কুপ্রথা, বরং প্রায় শিরকের পর্যায়ে সম্মান করার যেই প্লাবন চলছে, তাতে অনেক সময় গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। মাযারে যিনি শায়িত আছেন, তিনি এসব থেকে মুক্ত। বাস্তবে এ সমস্ত কর্মকান্ড তাঁর সঙ্গে জুলুম ও সীমালঙ্ঘণের সমার্থক। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সব থেকে রক্ষা করুন।

এখানে এ কথাটি উল্লেখযোগ্য যে, হযরত আলী ইবনে মুসা রহ.-এর দিকে সম্বন্ধ করে এমন অনেক বর্ণনা আহলে সুন্নাত মুহাদ্দিসগণও নিজেদের কিতাবে উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলোকে 'মুনকার' বলে পরিগণিত করা হয়েছে। হাফেয যাহাবী রহ. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা কিতাবে এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. তাহযীবুত তাহযীব কিতাবে এসব বর্ণনার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন।

তেহরান ও 'রায়'তে প্রত্যাবর্তন

সেদিনই দুপুরে আমরা মাশহাদ থেকে তেহরানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। রাত দশটায় আমাকে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। তেহরানের কয়েক ঘণ্টা অবস্থানকালে 'রায়' শহরে যাওয়ার বাসনাও আমার ছিলো। তেহরান মূলত শহরটির নতুন নাম। প্রাচীনকালে এ অঞ্চলটি 'রায়' নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। দুপুরে মাওলানা আব্দুল হাদী সাহেবের বাড়িতে তাঁর মেহমানদারীর স্বাদ উপভোগ করি। কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করার পর আছরের নামায পড়ে বের হই। তেহরানের বিভিন্ন মহল্লা অতিক্রম করে সেই মহল্লায় পৌঁছি, যাকে এখনো 'রায়' বলা হয়। নিশাপুরের ন্যায় এ শহরটিও হযরত ওমর রাযি.-এর জামানায় বিজিত হয়। যৌবনকালে শহরটি পৃথিবীর প্রসিদ্ধতম শহরসমূহের অন্যতম ছিলো। এখান থেকেও অনেক জ্ঞানী-গুণী মহীরুহের জন্ম হয়। এখানকার অধিবাসীদেরকে বলা হতো 'রাযী'। 'রাযী' সম্বন্ধ দ্বারা যতো মনীষী বিখ্যাত, তাঁরা সকলেই এখানকার অধিবাসী ছিলেন। মুহাদ্দিসগণের মধ্যে ইমাম আবু যুরআ রাযী রহ., ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ. ও তাঁর সাহেবযাদা ইবনে আবী হাতেম রাযী রহ. (যাঁর

'আলজারহু ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থ 'রিজাল'শাস্ত্রে মূল উৎসের গুরুত্ব রাখে এবং তাঁর তাফসীরও সুবিখ্যাত), ইসমাঈল ইবনে যানজুয়াই আস-সাম্মান রহ., ফুকাহায়ে কেরামের মধ্যে হানাফী ইমাম আবু বকর জাসসাস রাযী রহ. ('আহকামুল কুরআনে'র গ্রন্থকার), তাফসীর ও কালামশাস্ত্রের ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রহ., তাসাওউফের অন্যতম ইমাম হযরত ইবরাহীম ইবনে আহমাদ আল-খাওয়াস রহ., চিকিৎসা ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে আবু বকর যাকারিয়া রাযী রহ.- প্রমুখ মহামনীষী এ শহরেই জন্মগ্রহণ করেন। এটাই সেই শহর, যাকে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর গর্বযোগ্য শাগরিদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানী রহ. শেষ জীবনে নিজের বাসস্থান বানিয়েছিলেন এবং এখানেই তিনি ইনতিকাল করেন।

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, এ শহরে যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকতো বলে মানুষ ভূ-গর্ভ ঘর তৈরী করতো। আল্লামা হামবী রহ. বলেন- আমি এ ধরনের ঘর দেখেছি। ঐ ঘরগুলোতে পৌঁছার জন্যে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকার পথ রাখা হতো। যাতে শত্রুউ সেগুলো ব্যবহার করতে ভয় পায়। এখানকার ফল হতো খুব সুস্বাদু। এখানে মাথা ধোয়ার বিশেষ এক ধরনের মাটি পাওয়া যেতো, যা আমীরদের জন্যে উপঢৌকন পাঠানো হতো। চিরুনী শিল্পকে এখানকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য মনে করা হতো। আসমায়ী রহ.-এর উক্তি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে-

الرى عروس الدنيا واليه متجر الناس

'রায়' জগত-বধূ এবং সারা বিশ্বের মানুষের ব্যবসা-কেন্দ্র।'

(আল্লামা হামবী রহ.কৃত 'মু'জামুল বুলদান', ৩/১১৬-১২২ পৃঃ ও কাযবীনীকৃত 'আসারুল বিলাদ', ৩৭৫-৩৮২ পৃষ্ঠায় এ শহর এবং এখানকার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে বিস্ত ারিতভাবে আলোচনা রয়েছে।)

নিশাপুরের মতো এখানেও উপরোক্ত বুযুর্গগণের স্মৃতি ও নিদর্শনসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়া হয়েছে। এ কথা জানা সত্ত্বেও আমরা এখানকার সেই বাতাসে কয়েকটি শ্বাস গ্রহণ করতে এসেছিলাম, যা এক সময় জ্ঞান-গরিমার কলরবে মুখরিত থাকতো। এখন এ পুরো অঞ্চল তেহরানের অংশে পরিণত হয়েছে। আমরা খুঁজে খুঁজে রায়ের একেবারে প্রাচীন এলাকায় চলে যাই। এখানে একটি প্রাচীন কবরস্তান রয়েছে। এর এক প্রান্তে একটি বড়ো কবর এবং একটি বিশাল মসজিদ রয়েছে। মাযারে শায়িত ব্যক্তির নাম লেখা রয়েছে- আব্দুল আযীম বিন আব্দুল্লাহ আলহাসানী রহ.। কথিত আছে যে, ইনি হযরত হাসান বিন আলী রাযি.-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ। আমি আহলে সুন্নাতের 'রিজালশাস্ত্রে'র কিতাবসমূহে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা পাইনি। তবে শিয়াদের 'রিজালশাস্ত্রে' তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তাঁকে মহান আলেম, বুযুর্গ ও আল্লাহর ওলী আখ্যা দেয়া হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে এমন সব

বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর অধিকাংশকে শিয়া 'রিজালশাস্ত্রে'র অনেক লেখকই দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। (মু'জামু রিজালিল হাদীস, লিলখুয়ী, ১০/৪৬-৪৭ পৃঃ)

তাঁর কবরের সঙ্গেই বিরাট এলাকাব্যাপী বিস্তৃত বড়ো একটি কবরস্তান রয়েছে। কিন্তু এখানকার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহ যুগের ঝাপটায় গাঢ় আবরণে ঢাকা পড়েছে। এ ছাড়া আর কিছু বলা সম্ভব নয় যে-

خاک میں کیا صورتیں ہوں گی جو پنہاں ہو گئیں

'ভূগর্ভে অপরূপ চেহারাসমূহ ঢাকা পড়েছে।'

রায় শহরের বেদনামিশ্রিত এ ভ্রমণ ছিলো আমাদের ইরান সফরের শেষ ধাপ। এখান থেকে আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। রাত সাড়ে দশটায় আমাদের ফিরতি বিমান দুবাইয়ের পথে যাত্রা করে। সেখানে একদিন অবস্থান করে আল্লাহর মেহরেবানীতে পয়লা শাবান নিরাপদে করাচী পৌঁছি।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

নিউজিল্যান্ড সফর

(শাওয়াল, ১৪২৬ হিজরী, নভেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্ত্বার জন্যে, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

নিউজিল্যান্ড দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত উন্নয়নশীল একটি দেশ। যা অষ্ট্রেলিয়া থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ১০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। যেহেতু নিউজিল্যান্ডের পর এন্টার্কটিকা পর্যন্ত আর কেনো জনবসতি নেই, তাই একে দক্ষিণে পৃথিবীর সর্বশেষ দেশ বললে ভুল হবে না। এখানে যদিও ছোটো ছোটো কয়েকটি দ্বীপ রয়েছে, তবে দু'টি দ্বীপেই কেবল বড়ো শহর রয়েছে এবং সেগুলোতেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী বাস করে। তার একটিকে উত্তর দ্বীপ ও অপরটিকে দক্ষিণ দ্বীপ বলা হয়। এতদুভয়ের মাঝে বিশ মাইল চওড়া 'কুক' প্রণালী বাধা হয়ে আছে। সুতরাং উত্তর দ্বীপ থেকে দক্ষিণ দ্বীপে যেতে জাহাজ ও নৌকা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রাইভেট কার ও বাসের মাধ্যমে সফর করলে সেগুলো ফেরীতে আরহণ করে দক্ষিণ দ্বীপে পৌঁছে। দেশের মোট আয়তন প্রায় ১ লক্ষ সাড়ে তিন হাজার বর্গমাইল। উত্তর দ্বীপের শুরু থেকে দক্ষিণ দ্বীপের শেষ পর্যন্ত দেশের দৈর্ঘ্য ৯৯৫ মাইল। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে প্রস্থ ২৮০ মাইল। বিরাট এ ভূখন্ডের অধিবাসী মোট ৪০ লক্ষ। অর্থাৎ, শুধুমাত্র করাচী শহরের প্রায় এক তৃতীয়াংশ। দেশটির রাজধানীর নাম ওয়েলিংটন। যা উত্তর দ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এ ছাড়া আরোও তিনটি বড়ো শহর রয়েছে। অকল্যান্ড, ক্রাইষ্ট চার্চ ও হ্যামিলটন। অকল্যান্ড এ দেশের সবচেয়ে বড়ো শহর।

আমাদের জানা ইতিহাস মতে একহাজার খ্রিস্টাব্দ থেকে নিউজিল্যান্ডে মানুষের বসবাস চলে আসছে। এখানের স্থানীয় আদিবাসীদেরকে 'মাওরি' (Maori) বলা হয়। গৌরবর্ণের এ বংশটি এ দেশে বসবাস করে আসছিলো। কথিত আছে যে, ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে সর্ব প্রথম একজন ডাচ্ নাগরিক এখানে অবতরণের চেষ্টা করে। কিন্তু মাউরী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশ বংশোদ্ভূত ক্যাপ্টেন জেমস কুক নিউজিল্যান্ড অধিগ্রহণের চেষ্টা করেন। প্রথমদিকে মাওরি সম্প্রদায়ের লোকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করে। কিন্তু পরিশেষে কুক তাদের নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম হন। ক্রমান্বয়ে সেখানে বৃটিশদের বসবাস আরম্ভ হয়। এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা নিউ সাউথ ওয়েলস-এর নিয়মতান্ত্রিক উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে মাওরি জাতি বৃটিশদের আধিপত্য মেনে নিয়ে নিজেদের শাসন প্রত্যাহার করতে সম্মত হয়। যার বিনিময়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তাদানের এবং তাদের অধিকৃত ভূ-খন্ডসমূহে তাদের আধিপত্য বহাল রাখার অঙ্গীকার করা হয়। এতদসত্ত্বেও মাওরি জাতির সঙ্গে ছোট খাটো যুদ্ধ অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে তাদেরকে পরিপূর্ণরূপে অধীন করা হয়। ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে একটি সাংবিধানিক কার্যাদেশের মাধ্যমে নিউজিল্যান্ডকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দেশ ঘোষণা করা হয়। যা জাতিসংঘের স্বাধীন সদস্য। কিন্তু বৃটেনের রাজা বা রাণীর প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর জেনারেল মনোনীত করা হয়, যা কেবলই প্রতীকি। আসল ক্ষমতা থাকে সংসদ নির্বাচিত কেবিনেটের হাতে। প্রধানমন্ত্রীই যার প্রধান।

মাউরি জাতির সঙ্গে যদিও অঙ্গীকার করা হয়েছিলো যে, তাদেরকে তাদের ভূ-খন্ডের উপর বহাল রাখা হবে। কিন্তু বৃটিশ-অধিবাসীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাউরি জাতিকে তাদের জমি বিক্রি করতে বাধ্য করা হচ্ছিলো। যে কারণে দখলদার বৃটিশদের সঙ্গে পুনরায় তাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৮৬০ এর দশকে এ যুদ্ধ চলতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে বৃটিশ দখলদাররা জয়ী হয়। মাউরি জাতি অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরপর থেকে মাউরি জাতি উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিরোধ গড়ে তোলেনি। এখন তারা নিউজিল্যান্ড সরকারের অধীনতা স্বীকার করে দেশের সাধারণ নাগরিকদের মতো বসবাস করছে। সংসদে তাদের জন্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত রয়েছে। সরকার বর্তমানে তাদের সংস্কৃতি প্রসারে সচেষ্ট।

নিউজিল্যান্ড একটি স্বর্ণপ্রসবা দেশ হওয়ায় মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন ভূ-খন্ড থেকে অনেক মুসলমানও এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। যাদের সংখ্যা এখন এক লাখের কাছাকাছি। এখানকার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আমাকে

ইতিপূর্বে কয়েকবার দাওয়াত দেয়া হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেখানে সফর করা সম্ভব হয়নি।

অবশেষে ১৪২৬ হিজরীর শাওয়াল মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এ দেশের সফর আমার ভাগ্যে ছিলো। ১৩ শাওয়াল ১৪২৬ হিজরী, মোতাবেক ১৬ নভেম্বর ২০০৫ ঈসায়ী বুধবার দিবাগত রাত একটায় সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ১৫ শাওয়াল মোতাবেক ১৮ নভেম্বর জুমার দিন স্থানীয় সময় সকাল আটটায় নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো শহর অকল্যান্ডে বিমান অবতরণ করে। নিউজিল্যান্ডের সময় পাকিস্তানের সময় থেকে আট ঘণ্টা এগিয়ে। এভাবে এ সফর ২৩ ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। এর মধ্যে হংকংয়ে বিমান পরিবর্তনের তিন ঘণ্টা সময়ও অন্তর্ভুক্ত।

নিউজিল্যান্ড পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ থেকে দূরবর্তী হওয়ায় সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে আমি খুব একটা অবগত ছিলাম না। সুতরাং এ কথাও আমার জানা ছিলো না যে, সুদূরবর্তী এ দেশে এতো অধিক সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী রয়েছেন। শুধু মুসলমানই নন, বরং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেমও এখানে রয়েছেন। তাঁদের বেশিরভাগ হিন্দুস্তানের মাদরাসাগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাদের মধ্যে মাওলানা খলীল নাদাত সাহেব ছিলেন আমার মেযবান। তিনি ডাভেলের প্রসিদ্ধ মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। মাশাআল্লাহ! তিনি বিদ্যানুরাগী ও যোগ্য আলেম। যিনি বহু বছর ধরে নিউজিল্যান্ডে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। উর্দু ছাড়া ইংরেজী ও আরবী ভাষাতেও তাঁর দখল রয়েছে। প্রয়োজন মতো এ তিন ভাষাতেই তিনি বয়ান করে থাকেন। এখানকার মুসলমানদের অন্যান্য ধর্মীয় প্রয়োজন পুরো করার কাজেও তিনি ব্যাপৃত রয়েছেন। নিউজিল্যান্ডের মুসলমানদের মাঝে তিনি সর্বজনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

অকল্যান্ড শহরটি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে ছোট ছোট পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত। এর অনেকগুলো মহল্লার নাম এসব পাহাড়ের নামেই রাখা হয়েছে। একটি পাহাড়ের নাম হলো 'মাউন্ট রস্কিল' (Mount Roskill)। এর আশেপাশে এ নামে বড়ো একটি মহল্লাও রয়েছে। সেখানে 'মসজিদে ওমর' নামে সুন্দর একটি মসজিদও রয়েছে। মসজিদটি অনেক বিস্তৃত জায়গা নিয়ে নির্মিত। মসজিদসংলগ্ন একটি মাদরাসাও রয়েছে। ডাভেল থেকে শিক্ষাসমাপনকারী তরুণ আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ সাহেব মসজিদের ইমাম। এ মসজিদের কারণে অনেক মুসলমানই এর আশেপাশে বসবাস করে থাকেন। আমি অকল্যান্ডে পৌঁছি জুমার দিন। মাওলানা খলীল নাদাত সাহেব প্রমুখ ঐ ওমর মসজিদে আমার জুমার বয়ানের ঘোষণা করিয়েছিলেন। এটা দেখে আনন্দপূর্ণ বিস্ময় জাগে যে, মাশাআল্লাহ মসজিদ নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। ত্রিশোর্ধ

দেশের মুসলমান এখানে একাত্ম হয়ে নামায আদায় করছিলেন। পকিস্তান, হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ছাড়া মিসর, সিরিয়া, ইরাক, আলজেরিয়া, মরক্কো, আফগানিস্তান, সুদান, সোমালিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালোয়েশিয়াসহ আরো না জানি কতো দেশের মুসলমান এখানে বসবাস করছেন। এ মসজিদ তাদের মিলনকেন্দ্র। দশদিন অবস্থানের এ সময়ে আমার বেশিরভাগ নামায এ মসজিদেই পড়া হয়। যে কারণে এখানকার নামাযীদের সঙ্গে এমন এক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যেন আমরা বহু বছর ধরে পরস্পরের পরিচিত। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আরবও পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে এখানে অংশ নিয়ে থাকেন। তাদের পীড়াপীড়িতে প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর আরবী ভাষায় হাদীসের সংক্ষিপ্ত দরস হয়। আরব ভাইয়েরা তাতে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশ নেন।

পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত জনাব মুহাম্মাদ আলী সাহেব এখানকার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। তিনি এখানকার ধর্মীয় কর্মকান্ডে অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সাথে অংশ নিয়ে থাকেন। মাউন্ট আলবার্ট (Mount Albert) নামে নিকটবর্তী একটি মহল্লায় তিনি নতুন একটি বাড়ি নির্মাণ করেছেন। তিনি এখনো এ বাড়িতে স্থানান্তরিত হননি। তিনি আমাকে সে বাড়িতে অবস্থান করার জন্যে প্রস্তাব করেন। আলহামদুলিল্লাহ! বাড়িটি ছিলো সবধরনের আবাসিক সুবিধার সমন্বয়ে সজ্জিত। এলাকাটিও ছিলো অত্যন্ত নীরব। সেখানের অবস্থান সবদিক দিয়েই আরামদায়ক হয়। জনাব মুহাম্মাদ আলী সাহেব ও তাঁর স্ত্রী সব ধরনের আরামের ব্যবস্থা করতে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন। বাড়িটি ছিলো মসজিদ থেকে বেশ দূরে। মাওলানা খলীল সাহেব ও মাওলানা ইমতিয়াজ সাহেব প্রত্যেক নামাযের সময় অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে আমাকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। সর্বপ্রকার আদর-যত্নে তাঁরা কোন প্রকার কমতি করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

মাশাআল্লাহ! অকল্যান্ডে এক ডজনের মতো মসজিদ রয়েছে। প্রত্যেক মসজিদের সাথে শিশুদের হিফয, নাযেরা ও প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। অকল্যান্ডে আমি এক সপ্তাহ অবস্থান করি। দেশটি বিষুব রেখার একদম দক্ষিণে অবস্থিত হওয়ায় নভেম্বর এখানে গ্রীস্মের আগমনের মাস। ফলে দিন হয়ে চলছিলো অনেক বড়ো।

আছরের নামায হচ্ছিলো সাড়ে ছয়টায়, মাগরিব সাড়ে আটটায় ও ইশা দশটায় । এক সপ্তার এ সফরকালে প্রতিদিন আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত অকল্যান্ডের কোন না কোন মসজিদে আমার বয়ান হচ্ছিলো। কতোগুলো হচ্ছিলো উর্দুতে, আর কতোগুলো ইংরেজীতে। সব জায়গায় মসজিদের ইমাম ও ব্যবস্থাপকগণকে দ্বীন ও দাওয়াতের তৎপরতায় ব্যাপৃত পাই। অকল্যান্ডে আরো

যে সকল আলেম খেদমতে নিয়োজিত রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে মাওলানা ইসহাক সাহেব, মাওলাা আবু বকর সাহেব ও মাওলানা মনযুর সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি অত্যন্ত আনন্দিত হই যে, আলহামদুলিল্লাহ! এঁরা সকলেই পারস্পরিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ভিত্তিতে এ সব খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। ১৭ শাওয়াল রবিবার দিন এগারোটার সময় জনাব আইয়ুব সাহেবের বাড়িতে অকল্যান্ড ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে কর্মরত ওলামায়ে কেরামের একটি ইজতিমা হয়। সেখানে আরব ইমাম ও খতীবগণও শরীক ছিলেন। এখানে তাঁদের সামনে আরবীতে বয়ান হয়। দেশের অনেক ফিক্হী বিষয়েও আলোচনা হয়।

সাধারণ বয়ানসমূহে আমি সাধারণের ইসলাহ ছাড়া স্থানীয় সমস্যাদি সম্পর্কে জোর দেই। এখানকার লোকেরা বলেন, এ দেশে সুদি কারবার খুব জোরেশোরে চালু আছে। অনেক মুসলমানও এতে আক্রান্ত। এর ব্যাপক প্রচলনের ফলে সুদ হারাম হওয়ার বিষয় এবং তার অনিষ্টতাও অন্তর থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই আমার মেযবানগণ আবেদন করেন যে, প্রত্যেকটি বড়ো শহরে সুদ হারাম হওয়ার বিষয়ে কমপক্ষে একটি করে বয়ান বিস্ত ারিতভাবে হওয়া দরকার। তাই নিউজিল্যান্ডের বড়ো তিনটি শহর- অকল্যান্ড, ওয়েলিংটন ও হ্যামিলটনে এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে একটি করে বয়ান হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এর কল্যাণকর প্রভাব অনুভূত হয়। অনেক নারী-পুরুষ এ গুনাহ থেকে তাদের তাওবার কথা জানান।

মানুষের সুদ সংক্রান্ত সবচে' বড়ো সমস্যা বাড়ি তৈরী করা। মানুষ সাধারণত সুদি ঋণ নিয়ে বাড়ি ক্রয় করে থাকে। নিউজিল্যান্ডেও এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। তবে এখানকার মুসলমানদের সংগঠন 'ফেডারেশন অব ইসলামিক এসোসিয়েশন অব নিউজিল্যান্ড' -সংক্ষেপে যাকে এফ. আই. এ. এন জেড. বলা হয়। স্থানীয় একটি ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানীর সাথে মিলে এমন একটি প্রডাক্ট তৈরী করার চেষ্টা করেছে, যার মাধ্যমে মুসলমানদের জন্যে বিনা সুদে বাড়ি তৈরী করা সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যে এফ. আই. এ. এন জেড. নিউজিল্যান্ডের আলেমগণের সমন্বয়ে একটি ওলামা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে। যাতে তাদের বিস্তারিত কর্মপন্থা বোর্ডের সামনে পেশ করে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, প্রস্তাবিত কর্মপন্থা বাস্তবিকই শরীয়তসম্মত কি না। সেই ওলামা বোর্ডে অকল্যান্ডের মাওলানা ইসহাক সাহেব, মাওলানা খলীল সাহেব ও মাওলানা মনযুর সাহেব ছাড়া ওয়েলিংটনের মাওলানা মোবারকপুরী সাহেব এবং আরো কতিপয় আরব আলেমও রয়েছেন। কোম্পানীর প্রস্তাবিত কর্মপন্থা লিখিত আকারে বোর্ডের সামনে পেশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বোর্ডের সদস্যগণ এতদসংক্রান্ত একটি পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত করবে। এ

সময় যেহেতু আমিও নিউজিল্যান্ডে উপস্থিত ছিলাম, তাই পরামর্শ বৈঠকটি আমার উপস্থিতিতে ও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত করার জন্যে তাঁরা পীড়াপীড়ি করেন। সুতরাং ১৭ শাওয়াল রবিবার বিকাল চারটা থেকে আসর পর্যন্ত এ পরামর্শ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ওলামা বোর্ডের সদস্যগণ ছাড়া উপরোক্ত ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী এবং এফ. আই. এ. এন জেড.-এর দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গও প্রস্তাবিত কর্মপন্থার উপর আলোকপাত করার জন্যে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে ওলামা বোর্ডের পৃথক বৈঠক হয়। প্রস্তাবিত কর্মপন্থার উপর চিন্তা-ভাবনা করে কিছু সংশোধনী আনা হয়। কোম্পানীর লোকদেরকে বলা হয় যে, তারা যদি এ সংশোধনী অনুপাতে কাজ করতে প্রস্তুত থাকে তা হলে ওলামা বোর্ড এ কর্মপন্থাকে মঞ্জুরী দিতে পারে। কোম্পানীর লোকেরা এ সংশোধনী বাস্তবায়নের ওয়াদা করে। তবে ওলামা বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, তারা এ সংশোধনী মোতাবেক চুক্তিপত্র তৈরী করে বোর্ডের সামনে পেশ করলে তা দেখার পরেই চূড়ান্ত মঞ্জুরী দেয়া যেতে পারে।

পশ্চিমের যে সব দেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানকার অনেক বড়ো, বরং আমার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা শিশুদের তালীম-তারবিয়াতের সমস্যা। ঐ সব দেশের শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ মুসলমান ছেলে-মেয়েদের জন্যে বড়ো একটি ফেৎনার চেয়ে কম নয়। যদিও মুসলমান মা-বাবাগণ নিজেদের সন্তানদেরকে পশ্চিমা ধাঁচের স্কুলগুলোতে পড়াশোনা করানোর পাশাপাশি বিকেল বেলায় মসজিদ সংলগ্ন মকতবেও পাঠিয়ে থাকেন। অর্থাৎ, বিকেল বেলায় শিশুরা ঐ সব মকতবে কুরআনে কারীম ও প্রাথমিক দ্বীনী শিক্ষা লাভ করে থাকে। সাথে সাথে অনেক মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্রে সানডে স্কুলের ব্যবস্থা রয়েছে। সেগুলোতে ছুটির দিন রবিবার সকাল বেলায়ও শিশুদের দ্বীনী তালীম দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যে সব প্রতিষ্ঠানে শিশুরা সার্বক্ষণিক শিক্ষা লাভ করে এবং কর্মকালীন অধিকাংশ সময় যেখানে অতিবাহিত করে, সেখানকার পরিবেশের প্রভাব এক-দুই ঘণ্টায় ধুয়ে ফেলা অত্যন্ত কঠিন। তাই আধুনিক শিক্ষার জন্যে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান করা এবং সন্তানদেরকে নিজেদের পরিবেশে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা ছাড়া এ সমস্যার আর কোন সমাধানই নাই। আমি এ সব দেশের যেখানেই যাই, এর প্রতি সেখানকার মুসলমানদেরকে অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করি। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক জায়গায় সীমিত পরিসরে হলেও মুসলমানগণ এর প্রতি মনোযোগী হচ্ছেন। অকল্যান্ডের সাহসী মুসলমানগণও 'আল-মদীনা' নামে একটি ইসলামী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেখানে মুসলমান ছেলে-মেয়েদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত সহশিক্ষা চালু আছে। তারপর থেকে ছেলেদেরকে পৃথকভাবে এবং মেয়েদেরকে পর্দার সাথে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। একজন শ্বেতাঙ্গ

নওমুসলিম মহিলা মেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্রের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে থাকেন। তিনি নিউজিল্যান্ডের অধিবাসী। আল-মদীনা স্কুলের ব্যবস্থাপকগণ আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানেও সংক্ষিপ্ত বয়ান হয়। মাদরাসার পাঠ্যসূচী ও অন্যন্য বিষয়েও পরামর্শ হয়। জেনে আনন্দিত হই যে, অন্যান্য শিক্ষাকেন্দ্রের তুলনায় এদের পাশের হার অধিক। অকল্যান্ডে আটদিনের অবস্থানকালে বেশির ভাগ সময় উপরোক্ত কাজে অতিবাহিত হয়। এর ফাঁকে শহরের কতক বিনোদনকেন্দ্রেও যাওয়ার সুযোগ হয়। প্রশান্ত মহাসগরের তীরে শহরটি এমনভাবে অবস্থিত যে, জায়গায় জায়গায় সমুদ্রের শাখা ছড়িয়ে আছে। শহরের বিভিন্ন অংশকে পরস্পরে সংযুক্ত করার জন্যে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট পহাড়ও ছড়িয়ে আছে। দেশটি এতোই সবুজ যে, শুকনো ভূমি চোখে পড়ে না। সবুজ-শ্যামল পহাড়ের কোল ঘেঁষে সমুদ্রপোকূল অনেক দূর চলে গেছে। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে। সমুদ্র ও পহাড়ের এ মিলন নিসর্গ-প্রেমীদর জন্যে এক মনোলোভা উপঢৌকনের চেয়ে কম নয়। পাহাড়ের চূড়া থেকে দৃষ্টি দিলে একদিকে সবুজ ভূমির মধ্যে সুদৃশ্য ভবনসমুহ, অপরদিকে সমুদ্রের শাখাসমূহের জাল নৈসর্গিক শিল্পের এমন এক দৃশ্যের অবতারণা করেছে, যা থেকে চোখ ফেরানো যায় না। যদিও সেখানে গ্রীষ্মকাল আসি আসি করছিলো, কিন্তু আমাদের করাচীর লোকদের জন্যে ঋতু ছিলো বেশ ঠান্ডা ও মনোমুগ্ধকর। এখানে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে প্রচন্ড গরম হয়। কিন্তু তখনো তাপমাত্রা সাধারণত ত্রিশ ডিগ্রী অতিক্রম করেনা। জনবসতি অধিক নয় বলে পরিবেশ যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন। জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। তবে বলা হয় যে, এখানকার রোদের মধ্যে বেশি সময় অবস্থান করলে চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। এর কারণ এই বলা হয় যে, এ জায়গাতে বায়ুমন্ডলের ozone স্তরের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ক্ষতিকর সূর্যরশ্মি ozone স্তরে শোষিত না হয়ে সরাসরি শরীরে এসে পতিত হয়। ফলে এখানে মানুষ ব্যাপকহারে স্কিন-ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হেফাযত করুন।

ওয়েলিংটনের পথে

১৯ শাওয়াল মঙ্গলবার মেজবানগণ আমাদেরকে নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেন। সময় স্বল্পতার কারণে সফর বিমানে করার সিদ্ধান্ত হয়। নিউজিল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যে তারা অকল্যান্ড থেকে প্রায় তিনশ’ মাইল দূরে অবস্থিত বিখ্যাত পর্যটন শহর রোত্রোয়া পর্যন্ত গাড়িতে সফর করার এবং সেখান থেকে বিমানযোগে ওয়েলিংটন যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমরা সকাল বেলা গাড়িতে করে অকল্যান্ড

থেকে রওয়ানা হই। শহর থেকে বের হতেই অসাধরণ সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ দেশকে যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দান করেছেন তা অন্য কোন দেশে খুব কমই দেখা যায়। সবুজ-শ্যামল প্রান্তর। শ্যামলিমায় ভরা পাহাড়। পাহাড়চূড়ায় বহু মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত সুদৃশ্য পাইন বৃক্ষের সারি। কিছু দূর পর পর সুদৃশ্য ঝিল। উপত্যকার চড়াই-উৎরাইয়ে নজরকাড়া চারণ-ভূমি। তার মধ্যে পশমভরা মেষপাল ও কোথাও কোথাও সুদৃশ্য হরিণ বিচরণ করতে দেখা যায়। প্রায় তিন ঘণ্টার স্থল-পথের এ সফর ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও আনন্দদায়ক। অবশেষে গাড়িচালক মাওলানা খলীল সাহেব পাহাড়ের মাঝে মোড় নেয়া একটি সড়কের তীরে গাড়ি দাঁড় করান। তিনি আমাদেরকে গাড়ি থেকে নেমে দৃশ্য উপভোগ করার জন্যে আহবান করেন। সড়কের প্রান্তে নামলে মনকাড়া একটি জলপ্রপাত দৃষ্টিগোচর হয়। পাহাড়ের ঢালুতে পাথরের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে তা খুব জোরে-শোরে উপত্যকায় পতিত হচ্ছিলো। দ্রুত প্রবাহ এবং পাথরের সঙ্গে বাড়ি খাওয়ার কারণে পানির মধ্যে এক সুদৃশ্য রঙ সৃষ্টি হচ্ছিলো। জলপ্রপাতের ঠিক উপরে কাঠের একটি সাঁকো রয়েছে। সেখানে উঠে প্রকৃতির এ সুন্দর দৃশ্য আরো অপূর্ব লাগছিলো।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'অতএব সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ কল্যাণময়!'

এখান থেকে কিছু দূরে টাওপো নামে বিশাল-বিস্তৃত ও সুদৃশ্য একটি ঝিল রয়েছে। এটি নিউজিল্যান্ডের সবচেয়ে বড়ো ঝিল। আমরা অল্প সময়ের জন্যে ঐ ঝিলের তীরেও নামি। কুইন্স টাউনের পরই একে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম পর্যটনকেন্দ্র মনে করা হয়। ঝিলের নামেই নিকটবর্তী শহরের নাম 'টাওপো' রাখা হয়েছে। ঝিলের পানি অত্যন্ত ঠান্ডা ও মিষ্টি। নিকটবর্তী পাহাড় থেকে একটি নালা ঝিলের মধ্যে এসে পতিত হয়েছে। তার পানি ভীষণ গরম। সম্ভবত ঐ পাহাড়ের মধ্যে লাভা রয়েছে, যে কারণে তার পানি অত্যন্ত গরম। টাওপো থেকে রওয়ানা হয়ে দুপুর একটার দিকে আমরা রোত্রোয়া শহরে প্রবেশ করি। এখানে এমন এক নৈসর্গিক দৃশ্য দেখার সুযোগ হয়, যা পৃথিবীর অন্য কোথাও আমি অন্তত দেখিনি। এখানে একটি জীবন্ত আগ্নেয়গিরী রয়েছে। সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টাই লাভা উদগীরিত হয়। এ লাভা নিভে বিলুপ্তও হয় না, আবার তার মান ও পরিমাণ এতো বেশিও নয় যে, আশেপাশের জনবসতি ধ্বংস করে দিবে। মনে হয়, যেন আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে নিরাপদ রেখে তাঁর কুদরতের দৃশ্য দেখানোর জন্যে এ অঞ্চলটিকে মনোনীত করেছেন। প্রায় দুই কিলোমিটার বিস্তৃত এর আয়তন। জায়গায় জায়গায় চুলার মুখের মতো গর্ত দেখা যায়।

আশপাশের জায়গা কোথাও শুকনো ও ঝরঝরা, আর কোথাও কাদার মতো ভেজা। লাভার প্রভাবে এ কাদা অব্যাহতভাবে উৎলাতে থাকে। কতক গর্ত থেকে সাদা ও গরম বাস্পের আকারে, আর কোনটা থেকে উত্তপ্ত পানির আকারে পানি উৎলাতে থাকে। কোন কোন সময় তা পঁচিশ মিটার উপরে উঠে যায়। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যে, জায়গায় জায়গায় জ্বলন্ত আগুন থেকে ধোঁয়া উঠছে। অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল ও ঠান্ডা উপত্যকার ঠিক মাঝখানে অগ্নিবাস্পের এ দৃশ্য অত্যন্ত শিক্ষণীয়। হাদীস শরীফে আছে- আল্লাহ তাআলা জাহান্নামকে প্রবৃত্তির বাসনার মনকাড়া দৃশ্য দ্বারা বেষ্টন করে দিয়েছেন। অত্যন্ত সুন্দর এলাকার মধ্যে আগুনের চুল্লির ভয়ংকর এ দৃশ্য যেন হাদীসটির একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নমুনা। যদিও বহুবছর ধরে এলাকাটি লাভার ধ্বংসাত্মক উদগীরণ থেকে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু কে জানে কখন এতে জীবনের গতি সঞ্চার হয়। ফলে পর্যটকদের আকর্ষণীয় এ কেন্দ্র একসময় প্রাণসংহারক দৃশ্যের অবতারণা করে।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার কাছে জাহান্নামের উত্তাপ থেকে পানাহ্ চাই।'

রোত্রোয়া শহরের একদিকে রয়েছে এই অগ্নিগর্ভ পাহাড়। আশেপাশের বাতাসে উদগীরিত লাভার এক অস্বাভাবিক গন্ধ ছড়িয়ে আছে। অপরদিকে রয়েছে একটি সুদৃশ্য ঝিল। পানিপ্রেমীদের বিনোদনের অনেক উপকরণ তা ধারণ করে আছে। এ কারণে শহরটি পর্যটকদের বড়ো একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখানে তাদের অবস্থানের পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা রয়েছে।

নিউজিল্যান্ড বিচিত্র ধরনের পাখির জন্যে দুনিয়াজোড়া বিখ্যাত। এ সব পাখি কেবল নিউজিল্যান্ডেই দেখা যায়। এখানে 'কিউই' নামে একটি পাখি রয়েছে, যা নিবিড় বনের অন্ধকারেই কেবল জীবিত থাকতে পারে। রোত্রোয়ার অগ্নুৎপাতকবলিত এলাকার বাইরে জাদুঘরের একটি কক্ষে কৃত্রিম অন্ধকারের মধ্যে এ পাখি রাখা আছে। আমি এ পাখি সর্বপ্রথম এখানেই দেখি। আরেকটি পাখি পেঙ্গুইন। এটি এন্টার্কটিকার তুষার অঞ্চলের পাখি। কেবল বরফের মধ্যেই এগুলো জীবিত থাকতে পারে। সুতরাং অকল্যান্ডের একটি যাদুঘরের একটি কক্ষে চতর্দিকে বরফের স্তুপ তৈরী করে এ পাখি সংরক্ষণ করা হয়েছে। কাঁচের বাহির থেকে পাখি দেখার ব্যবস্থা রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির বিচিত্র প্রকৃতি যে, কেউ অন্ধকার ছাড়া বাঁচতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তার জন্যে অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন। অন্ধকারের মাঝেই সে রিযিক পেয়ে থাকে। আর কেউ বরফ ছাড়া বাঁচতে পারে না। তার জন্যে করেছেন বরফের স্তুপের ব্যবস্থা। এর মধ্যেই তার রিযিকের ব্যবস্থা রয়েছে।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا

এখানে সীমিত সংখ্যক মুসলমানও বাস করেন। যোহরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিলো। আমরা নামায পড়ার কথা চিন্তা করছিলাম। পথপ্রদর্শকগণ ছোট একটি রেষ্টুরেন্টের সামনে আমাদেরকে নিয়ে যান। এক তুর্কী তরুণ সেখানে গোশত ভুনা করে বিক্রি করছিলো। আত্মমর্যাদাশীল এ মুসলমান তরুণ তার রেষ্টুরেন্টের উপরতলাকে নামায ঘর বানিয়েছেন। নারী ও পুরুষের জন্যে সেখানে পৃথক নামাযের বিছানা রয়েছে। ওযু করার ব্যবস্থাও রয়েছে। একটি আলমারীতে কুরআন মাজীদ এবং দ্বীনী ও দাওয়াতী পুস্তক রাখা আছে। উপরের এ তলাটি নিচের রেষ্টুরেন্টের চেয়ে প্রশস্ত। অত্যন্ত মূল্যবান এ অঞ্চলে উপরের তলাকে নামাযের জন্যে নির্ধারণ করে এ তুর্কী যুবক ধর্মীয় উদ্দীপনার যে প্রমাণ দিয়েছেন, তা অত্যন্ত মূল্যায়নযোগ্য। তাবলীগ জামাতের ভাইয়েরা এখানে এসে অবস্থান করেন। তাদের জন্যে এখানে থাকার এবং খানা পাকানোর ব্যবস্থা রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! অত্যন্ত শান্তি ও তৃপ্তির সাথে আমরা যোহরের নামায আদায় করি। দুপুরের খানা খাই। তারপর বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এক ঘণ্টা ওড়ার পর ওয়েলিংটনের বিমানবন্দরে অবতরণ করি।

ওয়েলিংটন শহরে

নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটন উত্তর দ্বীপের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এখানে বেশির ভাগ সময় ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে।

এ কারণে একে উইন্ডি ওয়েলিংটন (Windy Wellington) বলা হয়। বিমান থেকে নিচে নামলে তীব্র শীতল বায়ু আমাদেরকে স্বাগত জানায়। এমনকি বিমানবন্দরের ভবন পর্যন্ত পৌঁছা কঠিন হয়ে পড়ে। মাওলানা আমের মোবারকপুরী স্বাগত জানানোর জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হিন্দুস্তানের বিখ্যাত গবেষক ও লেখক মাওলানা ক্বারী আতহার মোবারকপুরী রহ.-এর নাতী। তিনি নিজেও অত্যন্ত যোগ্য আলেম। আরবী, উর্দূ ও ইংরেজি- তিন ভাষাতেই তার দখল রয়েছে। অধ্যয়ন ও গবেষণার রুচিও তার মধ্যে রয়েছে। আমি নিউজিল্যান্ডে পৌঁছার আগের দিনই তিনি অকল্যান্ডে তাশরীফ এনেছিলেন। অকল্যান্ডে যেসব প্রোগ্রাম হয় তার অধিকাংশগুলোতেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। আমি ওয়েলিংটন আসার একদিন পূর্বেই তিনি এখানে আসেন। ওয়েলিংটনে তিনটি বড়ো মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় মসজিদটি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। মাওলানা সেই মসজিদের ইমাম ও খতীব। মসজিদের অধীনে যে ইসলামিক সেন্টার রয়েছে, তিনি সেখানে

তৎপরতার সাথে দাওয়াত ও তাদরীসের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে তিনি অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

মাগরিবের নামাযের পর এখানে আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। এখানেও বিভিন্ন দেশের মুসলমানের সমাবেশ ছিলো। তাদের সম্মিলিত ভাষা ছিলো একমাত্র ইংরেজি। তাই ইংরেজিতেই বয়ান হয়। এখানকার লোকেরা পূর্ব থেকেই বয়ানের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছিলেন- 'সূদ ও তা থেকে মুক্তির উপায়' এবং তার ঘোষণাও দিয়েছিলেন। আমি নিজেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছিলাম। তাই এ বিষয়েই বয়ান হয়। বয়ান শেষে ইশার নমায পর্যন্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব চলতে থাকে। আল্লাহর মেহেরবানীতে এর ভালো প্রভাব অনুভূত হয়। মাহফিলে ওয়েলিংটনের বিভিন্ন বর্ণের ও বংশের মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার প্রদর্শনী চোখে পড়ে।

পরের দিন মুসলমানদের সংগঠন 'ফেডারেশন অব ইসলামিক এসোসিয়েশন নিউজিল্যান্ড' (FIANZ) এর দায়িত্বশীলগণ মসজিদের সীমানাতে অবস্থিত তাদের অফিসে সংগঠনের নেতৃত্বস্থানীয় লোকদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎ ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন। তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। সেখানে জানতে পারি যে, নিউজিল্যান্ডে হালাল গোশত তৈরী ও রপ্তানীর কাজে এ সংগঠনের প্রতিনিধিগণ ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেন এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তার তত্ত্বাবধান করেন। স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম সত্যায়ন করেন যে, তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে এ কর্মপদ্ধতি তৈরী করা হয়েছে।

এ সাক্ষাতের পূর্বে মাওলানা আমের মোবারকপুরী সাহেব ওয়েলিংটন শহর ঘুরিয়ে দেখান। শহরটিতে পাহাড় ও সমুদ্রের শাখাসমূহের জাল বিছিয়ে আছে। বেশিরভাগ বাড়ি পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত। একদিকে সবুজ-শ্যামল পাহাড় ও অপরদিকে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সাগর নজরকাড়া দৃশ্যের অবতারণা করেছে। শহরের মধ্যবর্তী এলাকা নতুন নতুন ভবন দ্বারা সজ্জিত। নিউজিল্যান্ডের বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য হলো মধু। এ কারণে এ দেশের সংসদ ভবন মৌচাকের আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছে। এখানে বিরল-বিস্ময়কর এ প্রযুক্তিটি ব্যাপক যে, নির্মিত ভবনসমূহ এক জায়গা থেকে উঠিয়ে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করা হয়। শহরের এ অংশেই আমাদেরকে একটি কয়েকতলাবিশিষ্ট ভবন দেখানো হয়। প্রথমে এটি সড়কের অপর প্রান্তে ছিলো। সেখান থেকে তুলে এনে এখানে স্থাপন করা হয়েছে। অকল্যান্ডের এক জায়গায় বাড়ি উত্তোলনের দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখেছি। সেখানে নির্মাণকৃত বাড়ির একটি বাজার রয়েছে। খরিদ্দাররা রুচিসম্মত বাড়ি তুলে নিয়ে পসন্দ মতো জমিতে বসিয়ে থাকে। আমি এ বিস্ময়কর প্রযুক্তি অন্য কোন দেশে

দেখিনি বা শুনিনি। কাঠের তৈরী বাড়ির ক্ষেত্রে তো এটি এমন কোন জটিল ব্যাপার নয়, কিন্তু এখানকার লোকেরা জানায় যে, কংক্রিটের তৈরী ভবনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। ওয়েলিংটনে স্থানান্তরিত যে ভবনটি আমাকে দেখানো হয়েছিলো, তাও কংক্রিটের তৈরী ছিলো।

২০শে শাওয়াল, বুধবার, তৃতীয় প্রহরে আমরা ওয়েলিংটন থেকে বিমানযোগে নিউজিল্যান্ডের চতুর্থ বৃহত্তম শহর হ্যামিলটনে যাই। এটিও অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল একটি শহর। বহুসংখ্যক মুসলমান এখানে বাস করেন। এখানকার একটি মসজিদে- যার বেশিরভাগ নামাযী সোমালিয়ান মুসলমান- পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আছরের নামাযের পর ইংরেজীতে আমার বয়ান হয়। পরবর্তীতে প্রশ্নোত্তরেরও একটি বৈঠক হয়। তারপর আমরা গাড়িতে করে অকল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং অনেক রাতে অবস্থানস্থলে পৌঁছি।

পুরো নিউজিল্যান্ড প্রাকৃতিক দৃশ্যে পরিপূর্ণ, তবে এর সর্বাধিক সুন্দর অঞ্চল বলা হয় দক্ষিণ দ্বীপের কুইন্স টাউনকে। নিউজিল্যান্ড সফরের শেষদিকে আমাদের মেযবানগণ একটি বিমানযোগে সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম করেন। সকালবেলা অকল্যান্ড থেকে রওয়ানা হয়ে বিমান ক্রাইষ্ট চার্চে থামে। এটি দেশের বৃহত্তম শহর। এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানের বাস রয়েছে। তারপর বিমান কুইন্স টাউনে পৌঁছে। যা বাস্তবিকই নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অদ্বিতীয়। তিনদিকে বরফাচ্ছাদিত পাহাড়ের মাঝে একটি প্রাকৃতিক ঝিল এবং তা থেকে বের হয়ে আসা দ্বীপসমূহ পুরো অঞ্চলটিকে অসাধারণ সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে। গাড়িতে অনেক দূর পর্যন্ত সফর করলে কিছু দূর পর পর নতুন নতুন দৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কুইন্স টাউন থেকে ফেরার পর আরো একদিন অকল্যান্ডে অবস্থান করে ২৪শে শাওয়াল সকালবেলা সেখান থেকে রওয়ানা হই এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে ২৫শে শাওয়াল সকালবেলা করাচী পৌঁছি।

সিরিয়ার দ্বিতীয় সফর

(জুন ২০০৫, যিলহজ্ব ১৪২৫ হিজরী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্ত্বার জন্যে, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমি ইতিপূর্বে 'জাহানে দীদা'য় সিরিয়া সফরের আলোচনা করেছি। তার ১৯ বছর পর ২৪ শে জানুয়ারী ২০০৫ ঈসায়ীতে পুনরায় সেখানে যাওয়ার সুযোগ হয়। এবার সেখানে এক সপ্তাহ অবস্থান করি। এ সফরে দামেশক ছাড়াও হিম্‌স, হিমাত ও হলবে যাওয়ার সুযোগ হয়। এবার নতুন কতগুলো জায়গায় যাওয়ার এবং অতিরিক্ত কিছু তথ্য জানার সৌভাগ্য লাভ হয়। এ সফরের মূল দাওয়াতদাতা ছিলেন ডক্টর মুহাম্মাদ হামুর। তিনি সিরিয়ার অধিবাসী, তবে দীর্ঘ দিন যাবৎ প্যারিসে অবস্থান করছেন। আমেরিকাতে তিনি গাইডেন্স ফিন্যান্স নামে মুসলমানদের বাড়ি নির্মাণের জন্যে একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন। বর্তমানে এটি আমেরিকার এতদসংক্রান্ত সফলতম প্রতিষ্ঠান। এর শরীয়তবিষয়ক দিকনির্দেশনার জন্যে তিনি যে বোর্ড করেছেন তার মূল দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় এ বোর্ডের সমাবেশ হয়ে থাকে। সিরিয়াতেও বোর্ডের একটি সমাবেশ করার আকাঙ্খা ছিলো তাঁর। এ উপলক্ষে সেখানকার বরকতময় জায়গাসমূহ দেখার এবং ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে সাক্ষাত করারও সুযোগ হবে। তিনি সুরুচীর সঙ্গে এ সফরের ব্যবস্থাপনা করেন। আমার ছেলে স্নেহের মাওলানা ইমরান আশরাফ (সাল্লামাহু)-ও গাইডেন্স বোর্ডের সদস্য। তাই সেও এ সফরের দাওয়াত পেয়েছিলো। আমার ছোট ছেলে স্নেহের মৌলভি হাস্‌সান (সাল্লামাহু) এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যও সিরিয়া দেখার আগ্রহে আমার সফরসঙ্গী হয়।

সিরিয়ার অনেক বৈশিষ্ট্যের কথাই আমি আমার প্রথম সফরনামায় আলোচনা করেছি। এবার যে সমস্ত নতুন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়, শুধু ঐ সব বিষয়ের আলোচনা করেই এখানে ক্ষান্ত হবো।

উমাইয়া জামে মসজিদ ও তার আশেপাশে

আমার প্রথম সফরনামায় জামে উমাইয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবার উমাইয়া জামে মসজিদের যিয়ারতের সময় আমার দু'জন বিজ্ঞ বন্ধুও সাথে ছিলেন। তারা সিরিয়ার ঐতিহাসিক জায়গাসমূহের বিশেষ গবেষক। একজন হলেন শাইখ ওয়াইল হাম্বলী সাহেব। তিনি বহুদিন যাবৎ আমার সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করে আসছেন। দু'বছর পূর্বে হজের সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতও হয়েছিলো। কয়েকমাস পূর্বে যখন আমার শ্রদ্ধেয় ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী' উসমানী (মুদ্দা যিল্লুহু) সিরিয়া সফর করেন, তখন তিনি তাঁর উত্তম সহচর ছিলেন। দ্বিতীয়জন আমাদের বিদ্বান বন্ধু কুয়েতের শাইখ নাসির আল-আজমী। তিনি একজন গবেষক আলেম। তিনি বাহরাইনের শাইখ নিযাম ইয়াকুবী সাহেব থেকে অবগত হন যে, আমি এবং তিনি গাইডেন্সের সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্যে দামেশক যাচ্ছি এবং সেখানে আমি কয়েকদিন অবস্থান করবো, তখন তিনিও সিরিয়ায় চলে আসেন। তিনি তার বিভিন্ন গবেষণাকর্মের জন্য বার বার সিরিয়া এসে থাকেন। তাই এখানকার আলেমগণ ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবগত। তাঁরা দু'জন সাথে থাকার ফলে উমাইয়া জামে মসজিদ ও তার আশেপাশের নতুন কিছু তথ্য অবগত হই। উমাইয়া জামে মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি কক্ষ রয়েছে। এখানকার আলেম ও মাশায়েখের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ যে, এ কক্ষটি ইমাম গাযালী রহ.-এর নির্জনবাসের জায়গা ছিলো। মসজিদের হলকক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে 'মিহরাবুল হানাবিলা'র ডান দিকে একটি কক্ষ রয়েছে। তাঁর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এখানে আল্লামা মুয়াফফাক ইবনে কুদামা রহ. (আল-মুগনীর গ্রন্থকার) দরস দিতেন। এ কক্ষেই সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ শাইখ ও বুযুর্গ আলেম শাইখ আব্দুর রাযযাক হল্‌বী বর্তমানে দরস দিয়ে থাকেন। তিনি হজের সফরে ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার সৌভাগ্য হয়নি। 'মিহরাবুল হানাবিলা' ও 'মিহরাবুশ শাফেইয়্যার' মাঝে রয়েছে উমাইয়া জামে মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম দরজা। ঐ দরজা দিয়ে বের হয়ে বাজারের দিকে অগ্রসর হলে সুলতান নূর উদ্দীন যঙ্গী রহ.-এর কবরের দিকে যাওয়ার পথে সামান্য সম্মুখে বামদিকে একটি জায়গা টিনের দরজা দিয়ে বন্ধ করা আছে। ওয়ায়েল হাম্বলী সাহেব বললেন, দামেশকের লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, এখানে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাড়ি ছিলো।

উমাইয়া জামে মসজিদের আশেপাশের এলাকা সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্বসুরী ওলামায়ে কেরামের স্মৃতি দ্বারা পরিপূর্ণ। শাইখ নাসির আল-আজমী ও শাইখ ওয়ায়েল হাম্বলী সেগুলোর মধ্যে থেকে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা আমাদেরকে দেখান, 'দারুল হাদীস আল-আশরাফিয়া'- সেগুলোর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'দারুল হাদীস আল আশরাফিয়া'

দারুল হাদীসটি উমাইয়া জামে মসজিদের উত্তর-পশ্চিমে দামেশক দুর্গের ফটকের কাছে অবস্থিত। হাদীসের বরকতময় এ মাদরাসাটি নির্মাণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর ভাতিজা আল মালিকুল আশরাফ মুযাফফর উদ্দীন। এ কারণেই একে 'দারুল হাদীস আল আশরাফিয়া' বলা হয়। ৬৩০ হিজরী সনে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে মালিক আশরাফ সে যুগের হাদীসের বিখ্যাত হাফেয আল্লামা তাকী উদ্দীন ইবনুস সালাহ্ রহ.-কে এখানকার শাইখুল হাদীস নিযুক্ত করেন। তেরো বছর পর্যন্ত তিনি এখানে হাদীসের দরস দান করেন। এখানে বসেই তিনি সেই জগৎ-বিখ্যাত 'মুকদ্দিমায়ে ইবনুস সালাহ' সংকলন করেন, যা উসূলে হাদীসের উৎকৃষ্টতম উৎস ও মৌলিক গ্রন্থের গুরুত্ব রাখে।

এ দারুল হাদীসেরই চতুর্থ শাইখুল হাদীস ছিলেন (মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার) আল্লামা মুহিউদ্দীন নববী রহ.। তিনি এখানে প্রায় বারো বছর (৬৬৫ হিজরী - ৬৭৭ হিজরী) হাদীসের দরস দেন। মহান এ মাদরাসার নবম শাইখুল হাদীস ছিলেন আল্লামা আবুল হাজ্জাজ মিযযী রহ। যাঁর সুবিখ্যাত 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থটি সিহাহ সিত্তার রিজাল সম্পর্কিত অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ মূল উৎস মনে করা হয়। আল্লামা মিযযী রহ. এখানে তেইশ বছর (৭১৮ হিজরী ৭৪২ হিজরী পর্যন্ত) দরস দিতে থাকেন। তাঁর পরপরই এ দারুল হাদীসের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উদ্দীন সুবকী রহ.। তারপর তাঁর সাহেবযাদা আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী রহ. ও হযরত ইবনে কাসীর রহ (তাফসীরে ইবনে কাসীরের গ্রন্থকার)-ও এ দারুল হাদীসের প্রধান হিসাবে দরস দান করেন।

বরকতময় ও ঐতিহাসিক এ দারুল হাদীস এক সময় যুগের ঝাপটার শিকার হয়। এমনকি তা এক খ্রিস্টান কিনে নেয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শাইখ ইউসুফ মারাকেশী রহ. পুনরায় তা ক্রয় করেন। তিনি এখানে হাদীসের দরস চালু করেন। তাঁরই সাহেবযাদা আল্লামা মুহাম্মাদ বদরউদ্দীন আল হাসানী রহ. শাম দেশের পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের মধ্যে 'মুদারুল হাদীস' এর মর্যাদা রাখেন। তিনি তার পিতার ইন্তেকালের পর মাত্র ১২ বছর বয়সে এ দারুল

হাদীসের মোতাওয়াল্লী হন এবং আমৃত্যু (১৩৪৫ হিজরী পর্যন্ত) এখানে হাদীসের দরস দেন।

বর্তমানে শাইখ হুসাইন হাসান সাবিয়া এর প্রধান। এ মহান ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ উচ্চাঙ্গের দারুল হাদীস আকারে এখন আর অবশিষ্ট নেই, তবে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা এখনও চালু রয়েছে। হুসাইন হাসান সাবিয়া প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী আলেম। ডাক্তার হামুর আমার সঙ্গে সাক্ষাত করানোর উদ্দেশ্যে এক রাত পূর্বে এক নৈশভোজে নির্বাচিত আলেমগণকে দাওয়াত করেন। সেখানে শাইখ ওহাবা যুহাইলি, শাইখ সাঈদ রমাযান বুতী, শাইখ হুসসামুদ্দীন ফারফুর ও শাইখ হুসাইন হাসান সাবিয়া প্রমুখও নিমন্ত্রিত ছিলেন। অন্যদের সম্পর্কে তো আমি পূর্ব থেকেই অবগত ছিলাম, কিন্তু শাইখ হুসাইন হাসান সাবিয়ার সঙ্গে এটি ছিলো আমার প্রথম সাক্ষাত। প্রথম দৃষ্টিতেই তাঁর নূরানী আপাদমস্তক দেখে তাঁর প্রতি বিশেষ এক আকর্ষণ অনুভূত হয়। তিনি যে দারুল হাদীস আল আশরাফিয়ার প্রধান সে কথা আমি পরে জানতে পারি। তখনই তিনি দারুল হাদীসে আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন। সকাল দশটায় এর জন্যে সময় নির্ধারিত হয়। মোবারক এ দরসগাহে প্রবেশ করে এবং এখানে ইলম ও আমলের যে সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফয়েয অব্যাহত ছিলো তা কল্পনা করে অন্তরে অপার্থিব এক ভাব বিরাজ করছিলো। শাইখ সাবিয়া অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসাপূর্ণ অভ্যর্থনা জানান। তিনি আমাকে বরকতময় সেই মেহরাবে নিয়ে যান, যা বছর বছর যাবৎ হাফেয ইবনুস সালাহ্, আল্লামা নববী, হাফেয মিযযী, আল্লামা সুবকী ও ইবনে কাসীর রহ.-এর মতো মনীষী আলেমগণের অবস্থানকেন্দ্র ছিলো।

এ সময় আমার ছেলে স্নেহাস্পদ ডক্টর মৌলবী ইমরান আশরাফ ও মৌলবী হাসসান আশরাফ (সাল্লামাহুমা) ছাড়া বাহরাইনের শাইখ নিযাম ইয়াকুবী, কুয়েতের শাইখ নাসির আল আজমী, দামেশকের শাইখ ওয়ায়েল হাম্বলী এবং আরও কিছু আলেম সঙ্গে ছিলেন। তারা সকলেই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন, যেন এখানে বসে তাদেরকে হাদীসের দরস দান করি এবং 'ইজাযত' দেই। এমনকি শাইখ হুসাইন হাসান সাবিয়াও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করেন। তাদের এ ফরমায়েশ আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেয়। এখানে প্রতীকী হিসাবেও দরসের আসনে বসা দুঃসাহস মনে হচ্ছিলো। তবে তাদের সকলের পীড়াপীড়িকে শুভলক্ষণ মনে করে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে 'মুসালসাল বিল আওয়্যালিয়াত' হাদীসটি শোনাই। শাইখ নিযাম ইয়াকুবী আমার ছেলে মৌলবী ইমরান আশরাফ (সাল্লামাহু)-কে পূর্বেই ফরমায়েশ করেছিলেন, যেন সে আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা

মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব রহ.-এর 'সাবাত' 'আল ইযদিয়াদুস সানী আলাল ইয়ানিয়িল জানী' সাথে নিয়ে আসে। শাইখ নাসের আজমী তাঁর অনেকগুলো কপি করিয়ে উপস্থিত সকলের মাঝে বণ্টন করেন। তারপর ঐ 'সাবাত' এর যে অংশ হযরত ওয়ালেদ সাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু)-এর সনদসম্বলিত তা আমার সামনে পাঠ করেন এবং এখানেই বসে একটি ইজাযতনামা লিখে হাযেরীনের মধ্যে বিতরণ করেন। আমার জন্যে বরকতময় এ দারুল হাদীসের সঙ্গে প্রতীকী এ সম্পর্কও ছিলো এক মহাসৌভাগ্য।

'বুলবুলের জন্যে ফুলের সঙ্গের অন্তমিলই যথেষ্ট।'

দারুল হাদীস আন-নুরিয়া

দারুল হাদীস আল আশরাফিয়ার পূর্বদিকে কয়েক ধাপ দূরে আরেকটি দারুল হাদীস রয়েছে, যা এখন বিরান পড়ে আছে। বলা হয় যে, এটি দামেশকের সর্বপ্রাচীন দারুল হাদীস। সুলতান নুরউদ্দীন ঐঙ্গী রহ. সে যুগের হাদীসের ইমাম হাফেয ইবনে আসাকির রহ.-এর জন্য এটি বানিয়েছিলেন। এ কারণে এর নাম হয়- দারুল হাদীস আন-নুরিয়া। ভবনটি বর্তমানে বিরান হলেও ওয়ায়েল হাম্বলী সাহেবের এক বন্ধু তা দেখাশুনা করেন। আমাদের দেখার জন্যে তিনি ভবনটি খুলে দেন। মেহরাবের জীর্ণ পাথর ভবনটির প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছিলো। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. আল্লামা ইবনে আসীর জাযারী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে লিখেছেন যে, সুলতান নুরউদ্দীন ঐঙ্গী রহ. প্রথম ব্যক্তি, যিনি 'দারুল হাদীস' নামে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া পৃঃ ৪৮৭, খন্ড-১৬, দারে হিজর ১৪১৯ হিজরী) এ দারুল হাদীসেই এখন আমরা দাঁড়িয়ে। দামেশকের আলেমদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, হাফেয ইবনে আসাকির রহ. এ দারুল হাদীসেই 'তারীখে দামেশ্‌ক' সংকলন করেন। 'তারীখে দামেশ্‌ক' আশি খন্ডব্যাপী বিশাল এক বিশ্বকোষ, যা শুধু পড়ার জন্যই অনেক বছর সময় প্রয়োজন। এর নাম দামেশকের ইতিহাস হলেও বাস্তবে তা পুরো আলমে ইসলাম ও তার বিখ্যাত মনীষীগণের বিস্তারিত আলোচনা এবং হাদীস, সনদ ও জরহ-তা'দীলের বিশাল দফতর। ইতিহাস বিষয়ে এতো বিশাল গ্রন্থ এর আগে আর লিখিত হয়নি। ৮০ খন্ডের এ গ্রন্থ মুদ্রণ করে প্রকাশ করাও ছিলো এক বিশাল ব্যাপার। কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত পরিপূর্ণ আকারে তা প্রকাশ করার সাহস কোন প্রকাশকের হয়নি। আল্লাহর অনুগ্রহে ১৪১৫ হিজরীতে পুরো গ্রন্থ মুদ্রিত হয়েছে। রচনা ও সংকলনের বিস্ময়কর এ গ্রন্থ মাত্র এক ব্যক্তির প্রচেষ্টায় এ দারুল হাদীসেরই ছোট একটি কক্ষে পূর্ণতা পেয়েছিলো। আল্লাহু আকবার! এ দারুল হাদীসে যে সকল আলেম মনীষী দরস দিয়েছেন, তাদের মধ্যে হাফেয আলামুদ্দীন বারযালীও (মৃত্যু ৭৩৯ হিজরী) রয়েছেন। তিনি সিরিয়ার আরেক

বড়ো ইতিহাসবিদ এবং ইলমে হাদীসের উচ্চাঙ্গের ব্যক্তিত্ব। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন যে, তার উদ্ধৃতি পাথরে খোদাই করার ন্যায় মজবুত হয়ে থাকে। (হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন- سمعت العلامة ابن تيمية يقول: نقل البرانى نقر فى حجر আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮/৪১৩)

আবুদ দারদা রাযি.-এর 'মাকাম'

উমাইয়া জামে মসজিদ থেকে কিছু দূরে দামেশক দুর্গের উত্তর দেয়াল সংলগ্ন ছোট একটি মসজিদ রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে 'মসজিদে আবুদ দারদা'। আরো লেখা রয়েছে- এটি হযরত আবুদ দারদা রাযি.-এর 'মাকাম'। শাম দেশে 'মাকাম' শব্দ মাযার অর্থে ব্যবহৃত হয়, আবার কারও অবস্থানস্থলকেও 'মাকাম' বলা হয়। মসজিদের পূর্ব কোণে একটি কবর রয়েছে। তার উপর লেখা রয়েছে- এটি হযরত আবুদ দারদা রাযি.-এর কবর। তাঁর কবর এখানে হওয়ার বিষয়টি সংশয়পূর্ণ। কারণ, হাফেয ইবনে আসাকির রহ. তারীখে দামেশকে কয়েকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যেগুলো দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আবুদ দারদা রাযি.-এর দাফন হয়েছে 'আল বাবুস সগীর' কবরস্থানে। (তারীখে ইবনে আসাকির, বাবু যিকরি ফাযলি মাকাবিরি আহলি দামিশক, ২/৪১৮ পৃঃ) তবে এখানে তাঁর অবস্থান করা অস্বাভাবিক নয়। হযরত আবুদ দারদা রাযি. ঐ সমস্ত দুনিয়াবিরাগী এবাদতগুযার সাহাবাগণের অন্যতম, যাঁদেরকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হাকীমু উম্মাতী' (আমার উম্মতের বিজ্ঞজন) উপাধি দান করেছিলেন। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় তিনি মুসলমান হন। উহুদ যুদ্ধ ছিলো তাঁর প্রথম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে তিনি এমন বীরত্ব দেখান যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে 'নি'মাল ফারিস' বা উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী আখ্যা দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তিনি দামেশকে বসবাস আরম্ভ করেন। হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর খেলাফতকালে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাযি. যখন এখানকার গভর্ণর ছিলেন তখন তাঁকে দামেশকের বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। ইসলামের ইতিহাসের বড়ো বড়ো যুদ্ধে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। দামেশকে তিনি হাদীস বর্ণনার একটি ধারা অব্যাহত রাখেন। (তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন আল ইসাবা, পৃঃ ৪৫-৪৬, খন্ড-৩)

তাঁর উপরোক্ত কবরের বরাবরে আরেকটি কবর রয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে যে, এটি বিখ্যাত হাম্বলী ফকীহ আল্লামা মুওয়াফফাক উদ্দীন ইবনে কুদামা রহ.-এর কবর। এর বিশুদ্ধতা আমি যাচাই করতে পারিনি। তবে উমাইয়া জামে মসজিদে তাঁর দরস দেয়ার বিষয়টি প্রায় 'তাওয়াতুর'-এর সঙ্গে প্রসিদ্ধ। তাই এখানে তাঁর সমাহিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। উমাইয়া জামে

মসজিদের আশেপাশের এ পুরো এলাকা ইসলামের ইতিহাসের মহান ব্যক্তিত্বগণের পুণ্যাত্মা দ্বারা সুরভিত ও মুখরিত উপলব্ধি হয়। যার স্বাদ আমাদের মতো অনুভূতিহীন মানুষদেরও অনুভূত না হয়ে পারে না।

হাফেয আবুল হাজ্জাজ মিযযী রহ.

এ সফরে দামেশকের এমন এমন জায়গা ও ব্যক্তির দর্শন লাভ হয়, পূর্বের সিরিয়া সফরে যা হয়নি। এবার যে সমস্ত বুযুর্গের কবরে যাওয়ার সুযোগ হয় তাদের মধ্যে হাফেয আবু হাজ্জাজ মিযযী রহ., আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ও আল্লামা ইবনে কায়্যিম রহ. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত তিন বুযুর্গের কবর রয়েছে দামেশকের 'মাকবারাতুস সুফিয়া' নামে প্রসিদ্ধ কবরস্তানে। এখন এ কবরস্তানটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এখানে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন তৈরি করা হয়েছে। তবে এ তিন বুযুর্গের কবর এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। হাফেয আবুল হাজ্জাজ মিযযী রহ.- যাঁর আসল নাম ইউসুফ ইবনে যাকী এবং উপাধি জামালউদ্দীন- ইলমে হাদীস ও আসমাউর রিজালের এমন ইমাম, যাঁর রচিত 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার রিজাল সম্পর্কে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উৎস। এর উপর ভিত্তি করেই হাফেয ইবনে হাজার রহ. 'তাহযীবুত তাহযীব' ও 'তাকরীবুত তাহযীব' সংকলন করেন। তাছাড়া 'আতরাফ' সম্পর্কিত তাঁর 'তুহফাতুল আশরাফ' অত্যন্ত প্রসিদ্ধ কিতাব। ইনি ছিলেন মূলত হলবের অধিবাসী। পরবর্তীতে দামেশকের 'মিযযা' মহল্লায় বাস করেন। এ কারণে তাকে 'মিযযী' বলা হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে ইলমে হাদীস ও সনদ সম্পর্কে এমন উঁচু মাকাম দান করেছিলেন যে, তৎকালীন মহান মুহাদ্দিসগণ- যেমন আল্লামা তাকীউদ্দীন সুবকী রহ. প্রমুখ জটিল বিষয়ে তাঁর শরণনাপন্ন হতেন। তাঁর ছাত্র আল্লামা তাজউদ্দীন সুবকী রহ. তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এর অনেক দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। যার মধ্যে ইলমে হাদীসের ছাত্র-শিক্ষকদের জন্যে অত্যন্ত দামী ও বিরল ইলম রয়েছে। (তবাকাতুশ শাফেইয়্যা, সুবকীকৃত, ৬/২৫৫-২৬৭ পৃঃ, দারুল মারেফাত, বৈরুত)

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর মতো সমালোচক ও হাদীসবেত্তা তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন যে-

هو صاحب معضلاتنا و موضح مشكلاتنا

'তিনি আমাদের সমস্যাবলী দূর করে থাকেন এবং আমাদের জটিলতা নিরসন করে থাকেন।'

তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছরের অধিক। কিন্তু তিনি সোয়ারী ব্যবহার করতেন না। শেষ জীবন পর্যন্ত পায়ে হেঁটেই মাদরাসায় যেতেন এবং বৃদ্ধ বয়সেও ঠান্ডা পানি দ্বারা গোসল করতেন। অত্যন্ত কোমলাচারী, স্বল্পভাষী ও

ব্যক্তিত্বপূর্ণ বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর মজলিসে কখনও কারও গীবত শোনা যায়নি। ধন-সম্পদের প্রতি কখনই মনোযোগ দেননি। অর্থ সংকটের মধ্যে জীবনের বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করেন। এমনকি শেষে আর্থিক সংকটের কারণে তাঁর গৌরবময় গ্রন্থ তাহযীবুল কামালের নিজ হাতে লেখা কপি বিক্রি করতে বাধ্য হন (আদদুরারুল কামেনা, হাফেয ইবনে হাজার রহ. কৃত, ৪/৪৬০ পৃঃ) হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ছিলেন তাঁর জামাতা। তিনি বলেন যে, তিনি খুব কম দিন রোগাক্রান্ত ছিলেন। জুমার দিন হাদীসের দরস দিয়ে জুমার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ করে পেট ব্যাথা আরম্ভ হয়। যাকে 'কোলাঞ্জ' মনে করা হয়েছিলো। কিন্তু আসলে তা ছিলো প্লেগ রোগের প্রভাব। এক পর্যায়ে তিনি আয়াতুল-কুরসী পড়তে পড়তে ১২ই সফর ৭৪২ হিজরীতে প্রকৃত মালিকের সান্নিধ্যে চলে যান। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮/৪২৯)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.

দ্বিতীয়টি হাফেয মিযযী রহ.-এর গৌরবময় শাগরিদ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর কবর। কবর যিয়ারত বিষয়ে তাঁর মতাদর্শ প্রসিদ্ধ। 'শাদ্দে রিহাল' ছাড়া কোন বুযুর্গের কবরে সালাম পেশ করাকে তিনিও নাজায়েয বলেন না। অপরদিকে তাঁর 'তাফাররুদাত' (ব্যতিক্রমী মত) সত্ত্বেও তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, ইসলামের মহান খিদমত এবং বীরত্ব ও দৃঢ়তার কারণে তাঁর প্রতি অন্তরে সর্বদা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আবেগ উদ্বেলিত হয়ে থাকে। এ কারণে তাঁর কবরে সালাম পেশ করার তাওফীক হয়।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. আমাদের ইতিহাসের সে সকল ব্যক্তির অন্যতম, যাঁদের সম্পর্কে মানুষ সাধারণত অতিরঞ্জন ও অতি শৈথিল্যের শিকার হয়েছে। তাঁর কতক মতাদর্শ ও ফিক্হী 'তাফারুদাত' (ব্যতিক্রমী মত) এর কারণে সে যুগের কিছু লোক তাঁকে গোমরাহ আখ্যা দেন। যার ফলে তাঁকে বার বার কারাবরণ করতে হয়। (এর বিস্তারিত বিবরণ হাফেয ইবনে হাজার রহ. 'আদদুরারুল কামেনা' গ্রন্থের ১/১৪৪-১৬০ পৃঃ পর্যন্ত আলোচনা করেছেন) অবশেষে তাঁকে শেষ জীবনে দামেশক দূর্গে নযরবন্দী করে রাখা হয়। ৭২৮ হিজরীতে সেখানেই তাঁর ইনতিকাল হয়। অপরদিকে তাঁর প্রশংসাকারীদের একটি দল প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর অনুসরণ ও তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিহত করতে গিয়ে এতো বেশি সীমালংঘন করেছে যে, তাঁর বিপরীতে ওলামায়ে উম্মাতের মহান ব্যক্তিত্বগণকেও হেয় করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

বস্তুত আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর জ্ঞানগরিমা, পরহেযগারী, ইখলাস ও নিষ্ঠা সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয়-সন্দেহের অবকাশ নেই। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অসাধারণ স্মরণশক্তি ও বিস্তৃত ইলমের সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক উপস্থাপন

শক্তি এবং একটি বেগবান কলম দিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি দ্বীনের বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। বিশেষ করে কুরআন ও হাদীসের বিষয়ে তাঁর গ্রন্থসমূহ অথৈ সাগর তুল্য। জটিলতার সূচনা এখান থেকে হয় যে, তিনি সময়ুগীয় বাতিল দলসমূহের খন্ডনে কালামশাস্ত্রের যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, সেগুলোর জন্য তাঁর উপর 'তাশবীহ' ও 'তাজসীমে'র অভিযোগ আরোপ করা হয়। একদিকে তিনি 'সিফাতে মুতাশাবিহ' (যেমন, আরশের উপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে বলেন যে, এগুলোর দ্বারা প্রকৃত শাব্দিক অর্থই উদ্দেশ্য। তবে তা 'মাখলুকাত' ও 'হাওয়াদেস' তথা 'সৃষ্টি' ও 'অনাদি' হতে ভিন্নতর। তার প্রকৃত স্বরূপ আমাদের অজানা এবং তার উপর কোনো প্রকার রূপ ও ধরনের কল্পনা ছাড়া ঈমান আনতে হবে। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে যখন বাহাছ-বিতর্ক উত্তপ্ত হয়ে উঠে, তখন এগুলোর প্রকৃত অর্থের উপর জোর দিতে গিয়ে তিনি চরম স্পর্শকাতর ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করেন। যা 'বিলা কাইফ' তথা রূপ ও ধরনের কল্পনা ছাড়া ঈমান আনার সীমা অতিক্রম করে যায়। এর জন্যে তিনি এমন উপস্থাপন অবলম্বন করেন, যা 'তাশবীহে'র প্রান্তকে স্পর্শ করে। বাস্তবে আল্লাহ তাআলার 'যাত' ও 'সিফাত' সম্পর্কে দর্শনভিত্তিক চুলচেরা বিশ্লেষণ মানুষকে কতক সময় এমন আবর্তের মধ্যে নিয়ে যায়, যেখানে তার পদস্খলনের সমূহ সম্ভাবনা থাকে। এ কারণে পূর্বসুরী আলেমগণ এ বিষয়ে 'বিলা কাইফ' তথা রূপ ও ধরনরে কল্পনা ছাড়া ঈমান আনার শুধু দাবিই করেননি বরং সে অনুপাতে তারা আমলও করেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.ও যদি পূর্বসূরি আলেমগণের পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজেকে এতোটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং 'বিলা কাইফ' তথা রূপ ও ধরনের কল্পনা ছাড়া ঈমান আনার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে না যেতেন তাহলে কতোই না ভালো হতো! তবে বাস্তবতা হলো, এ বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখাসমূহ অধ্যয়ন করার পর কমপক্ষে আমি মনে করি যে, এগুলোর 'তাবীল' বা ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং এগুলোর ভিত্তিতে তাঁকে সরাসরি 'মুশাব্বিহা' বা 'মুজাসসিমা'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা বা তাঁকে 'কিদামে আলম' তথা 'পৃথিবী অনাদি' হওয়ার প্রবক্তা মনে করা ঠিক নয়।

তাঁর ফিকহী 'তাফাররুদাত' সম্পর্কে বক্তব্য হলো, একদল ওলামায়ে কেরাম তাঁকে ইজতিহাদের শর্তের অধিকারী সাব্যস্ত করেছেন। (যেমন, আল্লামা ইবনুয যামলুকানী, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮/২৯৮) এবং হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. তাঁর সম্পর্কে সুন্দর মন্তব্য করে বলেন –

وقد إنفرد بفتاوى نيل من عرضه لأجلها، وهى مغمورة فى بحر علمه، فالله تعالى يسامحه و يرضى عنه، فما رأيت مثله وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك.

'কতক ফাতাওয়ার বিষয়ে তিনি 'তাফাররুদ' ও ব্যতিক্রমী মত অবলম্বন করেন। যে কারণে তাঁকে ভালো-মন্দ বলা হয়েছে। কিন্তু এসব ফতোয়া তাঁর ইলমের সাগরে ডুবে গেছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর ভুলগুলো মাফ করেন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমি তাঁর মতো মানুষ দেখিনি। উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাই এমন যে, তার কতক কথা গ্রহণযোগ্য, আর কতক কথা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।'

'যুগালুল ইলম' নামে একটি পুস্তিকাকে হাফেয যাহাবী রহ.-এর লিখিত বলা হয়। তার দ্বারা জানা যায় যে, পরবর্তীতে তিনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর চরম বিরোধী হয়েছিলেন। কিন্তু পুস্তিকাটি হাফেয যাহাবী রহ.-এর হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত করা মুশকিল। মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

হাফেয ইবনে কাসীর রহ.

'মাকবারাতুস সুফিয়া'য় যে তিনটি কবর অবশিষ্ট রয়েছে, তাঁর মধ্যে তৃতীয় কবরটি হাফেয ইবনে কাসীর রহ.-এর বলা হয়। কবরটি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর পায়ের দিকে। হাফেয ইবনে কাসীর রহ.-এর নাম ইসমাঈল। উপাধি ইমাদুদ্দীন। উপনাম আবুল ফিদা। তিনি ছিলেন হাফেয মিযযী রহ.-এর জামাতা ও বিশিষ্ট শাগরিদ। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এরও তিনি শাগরিদ ছিলেন। শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হওয়ার কারণে কতক মতাদর্শের ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে ঐক্যমতও ছিলেন। হাফেয যাহাবী রহ.-এর মতো তিনিও আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর প্রশস্তি বর্ণনা করার পর তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন-

وبالجملة، كان من كبار العلماء و ممن يصيب و يخطئ و قد صح فى البخارى: 'اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر' و قال الإمام مالك بن أنس: كل أحد يؤخذ من قوله و يترك إلا صاحب هذا القبر(صلى الله عليه وسلم).

'সারকথা হলো, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. অন্যতম বড়ো আলেম ছিলেন। অন্যান্য আলেমের মতো তাঁর দ্বারা যেমন সঠিক হয়েছে, তেমনি ভুল-ভ্রান্তিও হয়েছে। বুখারী শরীফের সহীহ হাদীসে আছে যে, সিদ্ধান্তদাতা সত্য পর্যন্ত পৌঁছার চেষ্টা করে সঠিক সিদ্ধান্ত দিলে দ্বিগুণ সওয়াব পায়, আর চেষ্টা সত্ত্বেও ভুল করলে একগুণ সওয়াব পায়। তাছাড়া ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের কবর মোবারকের দিকে দেখিয়ে বলেন যে, তিনি ছাড়া সবার কথার মধ্যেই কিছু থাকে গ্রহণযোগ্য, আর কিছু থাকে অগ্রহণযোগ্য।' (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৮/৩০২)

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বসরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিন বছর বয়সে মা মারা যায়। তাঁর বড়ো ভাই শাইখ আব্দুল ওয়াহহাব রহ. তাঁর প্রতিপালন করেন। সে যুগের বড়ো বড়ো আলেমের নিকট থেকে ইলম অর্জন করার ক্ষেত্রে তিনি তাঁকে সহযোগিতা করেন। তাঁর সংকলিত তাফসীরের উপর সে যুগের ওলামায়ে কেরামই শুধু নির্ভর করেননি, বরং পরবর্তীতে তা তাফসীরের মূলউৎসসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। কারণ, তিনি তাফসীর সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ উদ্ধৃত করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সেগুলোর যাচাই-বাছাই এবং জরহ ও তা'দীলের প্রতিও মোটের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এমনিভাবে তাঁর সংকলিত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' ইসলামের ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়। কারণ, তিনি তারিখে তবারী, কামিলে ইবনে আসীর, তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী এবং তাঁর শাইখ হাফেয আলামুদ্দীন বারযালীর ইতিহাসগ্রন্থসমূহকে সামনে রেখে ঘটনাবলী নির্বাচন করেছেন এবং অন্যদের তুলনায় বর্ণনা ও সনদের মানের প্রতি অধিক লক্ষ্য রেখেছেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিস্তৃত ইলমের সাথে সাথে ইবাদতের স্বাদও দান করেছিলেন। এমনকি ইবনে হাবীব রহ. তাঁকে তাসবীহ ও তাহলীলের ইমাম আখ্যা দিয়েছেন (আন্‌বাউল গামার, হাফেয ইবনে হাজার কৃত, ১/৪৬ পৃঃ)

এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রস্ফুটিত স্বভাব দান করেছিলেন। তাঁর মজলিসসমূহ পরিচ্ছন্ন রুচির ধারক ছিলো। তাঁর মধ্যে ছিলো সাহিত্য ও কাব্যের রুচিও। নিম্নে তাঁর রচিত দু'টি পংক্তির অর্থ দেয়া হলো, যা তাঁর সাহিত্যরুচির সাক্ষ্য বহন করে-

'আমাদের দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চোখের সামনে আমাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

অতীতের যৌবন আর ফিরে আসবেনা এবং জীবনকে ক্লেদাক্তকারী এ বার্ধক্যও বিগত হবে না।'

১৫ই শাবান ৭৭৪ হিজরীতে তিনি ইনতিকাল করেন। নিজের দুই উস্তাদেয সঙ্গে এখানে তিনি সমাহিত আছেন।

আল্লামা ইবনে কায়্যিম রহ.

দামেশকের 'বাবুল জাবিয়া' অতিক্রমকালে আমাদের এক সফরসঙ্গী একটি কবরের দিকে ইশারা করে বলেন যে, এটি আল্লামা ইবনে কায়্যিম রহ.-এর কবর। তাই সেখানেও সালাম আরয করি। তাঁর নাম ছিলো শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আবী বকর। তাঁর পিতা ছিলেন আল্লামা ইবনে জাওযী রহ.-এর প্রতিষ্ঠাকৃত 'মাদরাসায়ে জাওযিয়া'র পরিচালক। এ কারণে তাঁকে 'কায়্যিমুল জাওযিয়া' বলা হতো। তাঁর সাথে সম্বন্ধ করে তিনি 'ইবনু কায়্যিমুল জাওযিয়া'

নামে প্রসিদ্ধ হন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর ছাত্রদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক তাঁর সাহচর্য লাভ করেন। এমনকি তাঁর সঙ্গে তিনি বন্দিজীবনও অতিবাহিত করেন। তাঁর চিন্তা ও মতাদর্শের বিশ্লেষক ও প্রচারকরূপে তিনি পরিচিতি লাভ করেন। কমবেশি প্রায় প্রতিটি মাসআলার ক্ষেত্রে তিনি আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর সমমনা ছিলেন। বরং ইতিপূর্বে আল্লামা ইবনে তাইয়িমিয়া রহ.-এর আলোচনায় কালামশাস্ত্রের যে সব বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে তিনি নিজের শাইখকেও অতিক্রম করে গেছেন। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. লম্বা লম্বা প্রবন্ধে যে সমস্ত চিন্তা-দর্শনের বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেগুলো তিনি তাঁর বিখ্যাত 'নুনিয়াতু ইবনিল কায়্যিম' কবিতার মধ্যে পংক্তিবদ্ধ করেন। তাতে তিনি সে সব বিষয় যেভাবে উপস্থাপন করেন তা তার শাইখের উপস্থাপন থেকে অধিক সমালোচনা ও তিরস্কারের লক্ষ্যে পরিণত হয়।

আল্লামা ইবনে কায়্যিম রহ.-এর আত্মশুদ্ধি বিষয়ে লিখিত গ্রন্থসমূহ অনন্য বৈশিষ্ট্যের ধারক। সেগুলো অত্যন্ত উপকারী। আমার মতো তালিবে ইলম তাঁর কিতাবসমূহ থেকে সর্বদা উপকৃত হয়ে আসছি। আবার যে সমস্ত বিষয়ে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আলেমের পথ ছেড়ে ভিন্নপথ অবলম্বন করেছেন, সেগুলোতে দ্বিমতও পোষণ করে আসছি। তবে তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও খেদমতসমূহ নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার যোগ্য।

আল্লামা শামী রহ.-এর পর-নাতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

আল্লামা শামী রহ.-এর পর-নাতীর সাক্ষাৎ এ সফরের একটি স্মরণীয় ঘটনা। আমার ওয়ালেদ মাজেদ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) যখন সিরিয়ায় তাশরীফ নিয়ে যান, তখন আল্লামা শামী রহ.-এর পর-নাতী মুফতী আবুল ইউস্‌র রহ.-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিলো। আমরা জানতে পারলাম, মুফতী আবুল ইউস্‌র রহ.-এর এক সহোদর শাইখ মুহাম্মাদ মুর্শিদ আবুল ইরশাদ এখনও জীবিত আছেন। আমাদের দোস্ত শাইখ ওয়ায়েল হাম্বলী ও শাইখ নাসের আজমী তাঁর থেকে মাগরিবের পরে সাক্ষাতের সময় নেন। সেমতে আমরা তাঁর বাড়িতে যাই। শাইখ মুর্শিদের বয়স এখন পঁচানব্বই বছর। তিনি সস্ত্রীক বাড়িতে অবস্থান করেন। তাঁর স্ত্রীও প্রায় তাঁর সমবয়সী। তিনি বলেন যে, 'রদ্দুল মুহতারে'র লেখক আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. তাঁর দাদার চাচা ছিলেন। 'রদ্দুল মুহতার' পুরোটি তিনি নিজ ভাই মুফতী আবুল ইউস্‌র এর নিকট পড়েছেন এবং মুফতী আবুল ইউস্‌র পড়েছেন স্বীয় পিতা মুফতী আবুল খায়ের এর নিকট। শাইখ মুর্শিদ দামেশকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত শরীয়তবিষয়ক বিচারপতি ছিলেন। সেখান থেকে অবসর লাভের পর নির্জনবাসী হয়েছেন। দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহের

আচরণ করেন। তিনি 'রদ্দুল মুহতারে'র ইজাযতও দেন এবং কিছু কিতাবও প্রদান করেন। সাক্ষাতের সময় শাইখ নিযাম ইয়াকুবী, শাইখ নাসের আল আজমী, শাইখ ওয়ায়েল হাম্বলী ও আমার ছেলে উপস্থিত ছিলেন। আল্লামা ইবনে আবেদিন শামী রহ. রচিত কিতাবসমূহ দ্বারা আমরা তালিবে ইলমরা যে অসাধারণ ফয়েয লাভ করছি এবং সেগুলোর সঙ্গে আমাদের যে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক রয়েছে, তার ভিত্তিতে শাইখ মুর্শিদের সাক্ষাত ছিলো আমাদের জন্যে বিরাট মধুর উপকরণ।

আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী রহ.-এর নাতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

শাইখ নাসির আজমী বলেন যে, দামেশকে আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী রহ.-এর নাতী শাইখ সাঈদ বিন যিয়া উদ্দীন অবস্থান করছেন। তাঁর নিকট আল্লামা কাসেমী রহ.-এর পুরো কুতুবখানাও রয়েছে। তিনি শাইখ মুর্শিদের সাক্ষাতের পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যেও সময় নিয়েছেন। সুতরাং শাইখ মুর্শিদের সাথে সাক্ষাতের পর আমরা তাঁর বাড়িতে যাই। তিনি অত্যন্ত সদাচারী, বিনয়ী ও জ্ঞানবান্ধব বুযুর্গ। তাঁর বৈঠকখানার ছাদ পর্যন্ত কিতাব দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. ত্রয়োদশ হিজরীর আলেম ছিলেন। ১৩৩১ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। তিনি শেষ যুগের গবেষক আলেমগণের মধ্যে পরিগণিত হন। তাঁর সংকলিত গ্রন্থ সংখ্যা শ' এর কাছাকাছি। তার মধ্যে তাঁর লিখিত 'মাহাসিনুত তাবীল' তাফসীরটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'তাফসীরুল কাসেমী' নামে তা প্রসিদ্ধ। আমি দারুল উলূমে পড়াকালীন তাঁর নাম সর্বপ্রথম জানতে পারি। আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. তাঁর পুস্তিকা 'আল ফাতওয়া ফিল ইসলাম' কোথাও হতে ধার করে এনেছিলেন। সে যুগে ফটোষ্ট্যাটের ব্যবস্থা ছিলো না তাই হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. মাওলানা মাযহার বাকা সাহেবের মাধ্যমে তা পুরোটি কপি করে বাঁধাই করিয়ে নিজস্ব কুতুবখানায় সংরক্ষণ করেন।

পরবর্তীতে তাফসীরে কাসেমী ছাড়া উসুলে হাদীসের উপর লিখিত তাঁর 'কাওয়ায়িদুত তাহদীস' দ্বারা উপকৃত ওয়ার সুযোগ লাভ হয়। এটি পড়ে তাঁর ইলমের গভীরতা, অধ্যয়নের ব্যাপকতা ও গবেষণা-রুচী সম্পর্কে অনুমান হয়। তাঁর যোগ্য নাতী উস্তায সাইদ বিন যিয়া উদ্দীন- যিনি বর্তমানে একজন সাহিত্যিক হিসাবে অধিক খ্যাতিমান- তাঁর কুতুবখানা দেখান। জানতে পারলাম যে, তাঁর ব্যক্তিগত কুতুবখানায় প্রায় দুই হাজার কিতাব ছিলো। প্রায় প্রত্যেকটি কিতাবে তাঁর লিখিত নোট সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি এসব কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। তিনি 'তাফসীরুল কাসেমী'র পাণ্ডুলিপিও দেখান। তার লিপি ছিলো অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। তিনি জানান যে, তাফসীরুল কাসেমী প্রকাশ করার

সময় ফুয়াদ আব্দুল বাকী সাহেব মূল কিতাবের কিছু অংশ বাদ দিয়েছিলেন। মূল পাড়ুলিপি থেকে তিনি আমাদেরকে এমন কিছু অংশ দেখান, যা মুদ্রিত তাফসীরে নেই।

আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী রহ. আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য মাযহাবের ইমাম ও আলেমগণের তিনি মূল্যায়ন করতেন। ভিন্নমতাবলম্বী আলেমগণের বিরুদ্ধে কখনো কঠোর ভাষা ব্যবহার করতেন না। তাঁর লেখনীসমূহে শাইখে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনে আরবী রহ. ও ইমাম গাযালী রহ.-এর কিতাবসমূহের উদ্ধৃতি তেমনই সম্মান ও গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করেন, যেমন গুরুত্ব ও মর্যাদার সঙ্গে উদ্ধৃত করেন আল্লামা ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কায়্যিম রহ.-এর নির্বাচিত অংশ। তাঁর তাফসীর শেষ যুগে লিখিত বলে তার মধ্যে অতীতের মুফাসেরীনের তাফসীরের সারনির্যাস এবং আধুনিক যুগের অনেক বিষয়ের গবেষণামূলক আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে।

শাইখ হুসসামুদ্দীন ফারফুর

দামেশকের নিকট যুগের আলেমগণের মধ্যে শাইখ সালেহ আল ফারফুর রহ.-এর নাম ওলামায়ে কেরাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে নিয়ে থাকেন। তাঁর বড়ো ছেলে শাইখ আব্দুল লতীফ ফারফুর আমাদের সঙ্গে 'মাজমাউল ফিক্‌হিল ইসলামী'তে সিরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর সম্পর্কে আমি 'জাহানে দিদা'য় সিরিয়ার প্রথম সফরে আলোচনা করেছি। তাঁর ছোট ভাই শাইখ হুসসামুদ্দীন ফারফুরের তাখরীজ ও তাহকীকসহ 'রদ্দুল মুহতারে'র ১৩ ভলিউম ছেপে বের হলে তার কপি যখন তিনি আমার নিকট করাচীতে পাঠিয়ে দেন তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। বাস্তবেও তিনি যে সাধনা, পরিশ্রম ও সুরুচীর সঙ্গে ফিক্‌হে হানাফীর এ মহান কিতাবের খেদমত করেছেন, তা দেখে আমি ধন্যবাদ না দিয়ে পারিনি। রদ্দুল মুহতার- যাকে 'হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীন' এবং আমাদের দেশে 'ফাতাওয়ায়ে শামী'ও বলা হয়- দীর্ঘদিন ধরে এমন একটি কাজের প্রতীক্ষায় ছিলো, যার মাধ্যমে মাসআলা বের করা এবং মূল উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করা সহজ হবে। শাইখ হুসসামুদ্দীন ফারফুর বাস্তবিকই এ কাজটি করে আলেমদের অনেক বড়ো ঋণ চুকিয়ে দিয়েছেন। আমি তখনই তাঁকে মোবারকবাদ জানিয়ে পত্র লিখি। ডক্টর হামুর নৈশভোজে দামেশকের আলেমগণের যে সমাবেশ আহবান করেছিলেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথমবার সাক্ষাত হয়। তিনি তাঁর মাদরাসা বা বাড়িতে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলেন। সময় স্বল্পতার কারণে আমি ওয়াদা করতে পারছিলাম না। কিন্তু সারাদিন তাঁর ফোন আসতে থাকে। তাই কাসেমী সাহেবের ওখান থেকে তাঁর বাড়িতে যাই। ইচ্ছা ছিলো সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের পর বিদায় নিয়ে চলে আসবো। কিন্তু তাঁর প্রাণবন্ত ও উচ্ছল

মজলিস থেকে আমরা আর উঠতে পারিনি। সেখানেই তিনি রাতের খানার ব্যবস্থা করেন। যে সমস্ত আলেম এ কাজে তাঁর সঙ্গে অংশ নিয়েছিলেন তাদের সঙ্গেও সাক্ষাত করান। তাঁর ওয়ালেদ সাহেবের অত্যন্ত শিক্ষনীয় ঘটনা শোনান। অতপর অত্যন্ত মনকাড়া সুরে 'নাআত'ও শোনান। অনেক রাত পর্যন্ত এ মজলিস চলতে থাকে। উপস্থিত সকলেই তা উপভোগ করে।

হল্‌ব -এর সফর

দামেশকে চারদিন অবস্থান করার পর আমাদের হল্‌ব যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিলো। হল্‌ব দামেশকের পর সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ঐতিহাসিক শহর। আমরা ২৮ শে জানুয়ারী শুক্রবার সকাল ৯ টায় গাড়িযোগে দামেশক থেকে রওয়ানা হই। গাড়িতে সফর করার একটি উদ্দেশ্য ছিলো পথে হিমস, হিমা ও মোয়াররার মতো শহরগুলোতেও অল্প অল্প সময় অবস্থান করা। প্রোগ্রাম মতো জুমার নামায আমরা হিমসে পড়ার সিদ্ধান্ত নেই। প্রায় আড়াই ঘণ্টার মনোমুগ্ধকর সফরের পর গাড়ি হিমসে পৌঁছে।

হিমসে

হিমস একসময় রোম সম্রাট কায়সারের বাসস্থান ছিলো। হযরত আবু ওবাইদা ইবনে জাররাহ রাযি. দামেশক জয় করার পর হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-কে এখানে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তীতে তিনি নিজে তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন। প্রথমদিকে যুদ্ধ হয়। পরে শহরের অধিবাসীরা সন্ধির প্রস্তাব করে। এভাবে দামেশকের মতো এ শহরটিও সন্ধি ভিত্তিক জয় হয়। এটি সাহাবা, তাবেঈ এবং বড়ো বড়ো আলেমের কেন্দ্র ছিলো। প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ রাযি. এখানেই সমাহিত হন। তাঁর নামেই এখানকার সবচেয়ে বড়ো মসজিদটির নামকরণ করা হয় 'মসজিদে খালিদ বিন ওয়ালীদ'। এ মসজিদেই আমরা জুমার নামায পড়বো। প্রথম আযানের একটু পূর্বে আমরা মসজিদে প্রবেশ করি। মসজিদ ছিলো অত্যন্ত জাঁকালো। মুয়াযযিনের আযান এক অসাধারণ আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। পুরো মসজিদ নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। এক যুবক খতীব সমৃদ্ধ খুতবা দেন। তারপর জুমার নামায আদায় করা হয়। জুমার নামাযের পর ঘোষণা করা হয় যে, 'এহতিয়াতুয যোহর' আদায় করা হবে। অনেক মানুষই তাতে অংশ নেয়। 'এহতিয়াতুয যোহর'কে ফকীহগণ বিদআত বলেছেন। জুমার নামায শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহের কোন একটি পাওয়া যায়নি এ সন্দেহের ভিত্তিতে কতক দেশে 'ইহতিয়াতুয যোহর' আদায় করা হয়। আমি চীনের তুর্কিস্তানেও এর প্রচলন দেখেছি। সঠিক কথা হলো, এর কোন ভিত্তি নেই, তাই তা পরিহার করা দরকার। মসজিদের এক কোণায় হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর মাযার আছে বলে বর্ণনা করা

হয়। সেই হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি., যাঁর নাম ও কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রত্যেকটি মুসলিম শিশু অবগত। তিনি ইসলামের জন্যে শতাধিক যুদ্ধ লড়েছেন। তার উক্তি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে- 'যে রাতে আমাকে কোন নববধূ দেয়া হবে, কিংবা দেয়া হবে আমার কোন সন্তানের জন্মের সুসংবাদ; তা আমার জন্যে ঐ রাত থেকে অধিক প্রিয় নয়, যা হবে ভীষণ বিপদসংকুল আর আমি তখন মুহাজিরদের কোন বাহিনীর সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত থাকবো। (আল ইসাবা, ২/২১৮)

ইয়ারমুকের যুদ্ধের সময় তাঁর টুপি হারিয়ে গিয়েছিলো। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তা অনুসন্ধান করান। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে, এ টুপির মধ্যে আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চুল রেখেছিলাম। যে যুদ্ধেই আমার সাথে এ টুপিটি থাকে সেখানেই আমি সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করি। (আল ইসাবা, ২/২১৭)

এটিও কুদরতের একটি কারিশমা যে, এতগুলো যুদ্ধ করার পরও হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর বিছানায় মৃত্যু হয়। তাঁর এ উক্তি আব্দুল্লাহ্ ইবনে মোবারক রহ. উদ্ধৃত করেছেন যে-

لقد طلبت القتل مظانه، فلم يقدر لی إلا أن أموت على فراشی، و ما من عملی بشئ أرجی عندی بعد أن لا إله إلاالله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلنی تمطر إلى الصبح حتی نغير على الكفار.

'যেখানেই নিহত হওয়ার সম্ভাবনা দেখেছি; শাহাদাতের অন্বেষায় সেখানেই আমি ছুটে গিয়েছি। কিন্তু বিছানায় মৃত্যুবরণ করাই ছিলো আমার নিয়তি। কালিমায়ে তাইয়েবার পর আমার নিজের কোন আমলের উপর এতো অধিক (সওয়াবের) আশা নেই, যতো রয়েছে ঐ রাতের উপর, যা আমি মাথার উপর ঢাল রেখে এমতাবস্থায় অতিবাহিত করি যে, ভোর পর্যন্ত আসমান থেকে বৃষ্টি হতে থাকে, আর ভোর বেলায় আমরা কাফেরদের উপর আক্রমণ করি।'

তারপর তিনি অসিয়ত করেন- আমার সমস্ত অস্ত্র ও অশ্ব যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্যে দিয়ে দেয়া হয়। হিমসে তাঁর ইনতিকাল হয়েছে বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে। তবে এমন একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, তাঁর ইনতিকাল হয়েছে মদীনা মুনাওয়ারায় এবং হযরত ওমর রাযি.-ও তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করেছেন। আল্লামা হামবী রহ. এটিকেই সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন যে, অধিকাংশ বর্ণনা তাঁর হিমসে মৃত্যুবরণ করার উপরই প্রমাণ বহন করে। (মু'জামুল বুলদান, ৩০৩, আল ইসবা ২/২১৯) এ মসজিদেরই আরেক কোণায় হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর সাহেবযাদা হযরত

ওবায়দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি.-এর কবর আছে বলা হয়। আল্লামা হামবী রহ. হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি.-এর কবরের নিকট দজলা ও ফুরাত বিধৌত ইরাক বিজয়ী হযরত ইয়ায বিন গনাম রাযি.-এর কবর আছে বলে উল্লেখ করেছেন। হিমসেরই আরেক জায়গায় হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এরও মাযার তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, বিভিন্ন সাহাবী ও বুযুর্গের মাযার সম্পর্কে এতো বিভিন্নমুখী বর্ণনা রয়েছে যে, নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলা মুশকিল।

জুমার নামাযের পর খালিদ বিন ওয়ালীদ রাযি. মসজিদের খতীব অত্যন্ত ভালোবাসা ও উষ্ণতার সাথে মিলিত হন। তিনি মসজিদের বিশেষ বিশেষ জায়গা পরিদর্শন করান। আমরা মসজিদ থেকে বের হলে বয়ঃবৃদ্ধ এক ব্যক্তি পথ প্রদর্শনের জন্যে আমাদের সঙ্গী হন। এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে তিনি বলেন যে, এখানে হযরত কা'বে আহবার রহ.-এর বাড়ি ছিলো। কা'বে আহবার ঐ সমস্ত তাবেঈর অন্যতম, যাঁরা মূলত ইহুদী ছিলেন এবং পূর্বের আসমানী কিতাবসমূহের বড়ো আলেম ছিলেন। নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় যুগে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর যিয়ারত থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর মুসলমান হন। তাঁর থেকে অনেক ইসরাইলী রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আমি উলূমুল কুরআন গ্রন্থে তার সনদগত মান নিয়ে আলোচনা করেছি।

হিম্স থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে 'কিলআতুল হিস্ন' নামে প্রসিদ্ধ একটি দুর্গ রয়েছে। পথপ্রদর্শক আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যান। অত্যন্ত দৃঢ় এ দুর্গটি সবুজ-শ্যামল উপত্যকাসমূহের মাঝে উঁচু একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। মূলত খৃষ্টানরা এ দুর্গ নির্মাণ করেছিলো। এ অঞ্চলের সবচেয়ে উঁচু জায়গা হওয়ার কারণে তারা একে আশেপাশের মুসলমান জনবসতির উপর লুণ্ঠন ও হত্যাকান্ড চালনার জন্যে ব্যবহার করতো। অবশেষে আইয়ুবী যুগে মুসলমানগণ তা জয় করে এ অনিষ্টের পথ রুদ্ধ করেন। এলাকার সর্বোচ্চ পাহাড়ের উপর নির্মিত এ দুর্গের প্রাচীরে আরোহণ করে যারা এটি জয় করেছেন, পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে এর উচ্চতাকে প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তিই কেবল তাদের সাহস ও সংকল্প অনুমান করতে পারবে। দুর্গের প্রাচীর থেকে চতুর্দিকের সবুজ-শ্যামল উপত্যকাসমূহের দৃশ্য ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। এখানকার একটি মসজিদে আমরা আছরের নামায আদায় করি।

হিমাতে

দামেশক থেকে বের হতেই হিমাত শহরের যুবক আলেম শাইখ মারহাফের নিকট থেকে আমাদের মোবাইলে বার বার ফোন আসতে থাকে যে, হল্‌ব

যাওয়ার পথে কিছু সময়ের জন্যে হিমাত শহরে অবশ্যই অবস্থান করবেন। হল্‌বের প্রসিদ্ধ আলেম শাইখ নুরুদ্দীন আতরের সঙ্গে (ইলমে হাদীস বিষয়ে যাঁর একাধিক কিতাব আলেমগণের নিকট সমাদৃত হয়েছে) আমার সিরিয়ার প্রথম সফরের সময় থেকে সাক্ষাৎ ছিলো। শাইখ মারহাফ জানান যে, তিনিও হিমাতে রয়েছেন এবং তাঁরও বাসনা, আমরা যেন যাওয়ার পথে সেখানে বিরতি যাত্রা বিরতি করি।

হিমাত সিরিয়ার আরেকটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শহর। সেখানে বড়ো বড়ো আলেমের জন্ম হয়েছে। আল্লামা ইয়াকুত হামবী রহ. (মু'জামুল বুলদানের গ্রন্থাকার) ও আল্লামা যায়নুদ্দীন হামবী রহ. (আল আশবাহ ওয়ান নাযায়েরের ব্যাখ্যাকার) এখানকারই অধিবাসী ছিলেন। শহরটি 'আসি' নদীর তীরে অবস্থিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে তাহযীব-তামাদ্দুনের দিক থেকে শহরটি প্রসিদ্ধ ছিলো। ইমরুল কায়েস এ শহর সম্পর্কে বলেছেন-

تقطع اسباب اللبانة الهوى
عشية جاوزنا حماة وشيزرا

'ভালোবাসা 'হিমাত' ও 'শীযার' অতিক্রমের সন্ধ্যায়
বাসনা পূরণের সকল উপায় ছিন্ন করে দেয়।'

নিকট অতীতেও শহরটি আলেমগণের কেন্দ্র ছিলো। বাথ পার্টি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আলেমগণকে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়। তাদেরকে গণহারে হত্যা করা হয়। এখনও অনেক আলেম কারাবন্দী রয়েছেন।

শহরটি হলবের পথেই। তাই শাইখ মারহাফের এ দাওয়াত কবুল করার ইচ্ছা জাগে। আমরা মাগরিবের সময় সেখানে প্রবেশ করি। শাইখ মারহাফের বাড়িতে যখন পৌঁছি, তখন সেখানে হিমাতের আলেমগণের বেশ বড় একটি সমাবেশ ঘটেছিলো। শাইখ নুরুদ্দীন আতরও উপস্থিত ছিলেন। ইশা পর্যন্ত এখানে আলেমগণের সঙ্গে উপভোগ্য মজলিস চলতে থাকে। উপস্থিত সকলে আমাকে হাদীসের ইজাযতদানের ফরমায়েশ করেন। আমি আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাদেরকে আমার সমস্ত শাইখের সনদসমূহের ইজাযত দেই। শাইখ নুরুদ্দীন আতর বর্তমানে 'বুলুগুল মুরামে'র ভাষ্যগ্রন্থ লিখছেন। তার প্রথম খন্ডসহ আরো কিছু গ্রন্থ তিনি আমাকে প্রদান করেন। সময় ছিলো সংক্ষিপ্ত এবং গন্তব্য ছিলো দূরে; এজন্যে ইশার নামাযের পর আমরা দ্রুত সেখান থেকে রওয়ানা হই।

মুআররা ও দায়রে সামআনে

হিমাত থেকে বের হওয়ার পর হলবের আগে পথে 'মুআররা' নামক আরেকটি প্রাচীন শহর আসে। এর প্রসিদ্ধ নাম 'মুআররাতুন নু'মান'। প্রসিদ্ধ আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী হযরত নু'মান বিন বাশীর রাযি. এখান দিয়ে যাওয়ার পথে ইনতিকাল করেন এবং এখানেই সমাহিত হন। এ কারণেই একে 'মুআররাতুন নু'মান' বলা হয়। এ শহরেই আরবী ভাষার বিখ্যাত কবি আবুল আলা মুআররা জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ছাড়া আরো যতো আলেম 'মুআররা' সম্বন্ধ দ্বারা প্রসিদ্ধ, তারা সকলে এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

মুআররা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে 'দায়রে সামআন' নামে একটি জায়গা রয়েছে। 'সামআন' একটি জনবসতির নাম [স্মর্তব্য যে, 'সামআনী' সম্বন্ধ দ্বারা যে সমস্ত আলেম পরিচিত রয়েছেন, (যেমন আল্লামা আব্দুল কারীম সামআনী) তাদেরকে এ শহরের দিকে সম্বন্ধ করে 'সামআনী' বলা হয়না। 'সামআন' নামক কোন পূর্বপুরুষের দিকে সম্বন্ধ করে তাদেরকে 'সামআনী' বলা হয়। আল লুবাব ফী তাহযীবিল আনসাব, ইবনে আসীর কৃত, ২/১৩৮] এখানে এক খৃষ্টান পাদ্রীর গীর্জা ছিলো। আরবী ভাষায় পাদ্রীদের গীর্জাকে 'দায়ের' বলা হয়। এ কারণে এর নাম হয় 'দায়রে সামআন'। এ জায়গাটি এ কারণে ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে যে, হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. এখানে অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন এবং গীর্জার পাদ্রীর নিকট থেকে নিজের জন্যে কবরের জায়গা ক্রয় করেন। (তারিখুল ইসলাম, যাহাবী কৃত, ৭/২০৫ পৃঃ) তারপর এখানেই তাঁর ইনতিকাল হয়। এখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। যদিও তাঁর নামে হিম্‌সেও একটি মাযার রয়েছে, যার আলোচনা আমি ইতিপূর্বে করেছি। কিন্তু সঠিক কথা হলো, তিনি 'দায়রে সামআনে' সমাহিত হয়েছেন। নির্ভরযোগ্য সকল ঐতিহাসিক এ কথাই বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যু ও দাফন হয়েছে 'দায়রে সামআনে'। (তবাকাতে ইবনে সাআদ, ৫/৪০৪-৪০৫ পৃঃ, তারিখুল ইসলাম, যাহাবী কৃত, ৭/২০৫ পৃঃ, সীরাতে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইবনে জাওযী কৃত, ৩২৩ পৃঃ)

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর মাযারে

আমাদের গাড়ি দায়রে সামআনে প্রবেশ করলো। পাশেই ছোট একটি জনবসতি। তাতে রয়েছে বড়ো একটি মসজিদ। মসজিদের সীমানার মধ্যেই হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর মাযার। তাঁর পায়ের দিকে রয়েছে তাঁর স্বামীভক্ত স্ত্রী হযরত ফাতেমার মাযার। উভয়ের কবরে সালাম পেশ করার সৌভাগ্য লাভ হয়।

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের সম্মানিত নাম পরিচয় দানের অপেক্ষা রাখে না। তিনি ইসলামের ইতিহাসের সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁকে পঞ্চম খলীফায়ে রাশেদ বলা হয়। (আল্লামা জাওযী রহ. হযরত মুজাহিদ রহ., সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ. ও হাসান বসরী রহ. প্রমুখের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, তাঁরা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. কে সুপথপ্রাপ্ত খলীফায়ে রাশেদগণের মধ্যে পরিগণিত করেছেন। সিরাত ৭২-৭৩) তিনি এমন সময় নেতৃত্বের লাগাম হাতে নেন, যখন বনী উমাইয়া খলীফাগণের মধ্যে বাদশাহীর রং এসে গিয়েছিলো। শাসন পরিচালনায় শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলার গুরুত্ব অবশিষ্ট ছিলো না। তাঁর পূর্বে সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক তাঁর খেলাফতকালে সংশোধনের অসম্পূর্ণ চেষ্টা করেন। কিন্তু সেগুলো ছিলো কিছু শাখাগত বিষয়ের সংশোধন। সে যুগের সচেতন আলেমগণ বিদ্যমান পরিস্থিতির জন্যে ব্যথিত ও চিন্তিত ছিলেন। তৎকালীন সময়ের যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম রজা ইবনে হাইওয়া রহ. ছিলেন অন্যতম তাবেঈ। তিনি অনেক সাহাবীর ছাত্র ছিলেন। সে যুগে তাঁকে মনে করা হতো শামের সবচেয়ে বড়ো আলেম। (তাযকিরাতুল হুফফায, যাহাবী কৃত, ১/১১৮) তিনি পরিস্থিতি সংশোধনের জন্যে খলীফা সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিকের নৈকট্য অর্জন ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। এমনকি খলীফা তাঁর উপর আস্থা পোষণ করতে আরম্ভ করেন। সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক যখন অন্তিম রোগে আক্রান্ত হন এবং পরবর্তী খলীফার নাম ঘোষণা করার সময় হয়, তখন তিনি তাঁর ছেলে আইয়ুব বা দাউদের নাম প্রস্তাব করার ইচ্ছে করেন। কিন্তু হযরত রজা ইবনে হাইওয়া রহ. তাঁকে বলেন- আল্লাহ তাআলাকে ভয় করুন! আপনি আপনার প্রভুর নিকট যাচ্ছেন। তিনি আপনাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবেন। সোলায়মান বললেন- তাহলে আপনি কার বিষয়ে পরামর্শ দেন। হযরত রজা ইবনে হাইওয়া রহ. বললেন- ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নাম ঘোষণা করুন। সোলায়মান ইবনে আব্দুল মালিক নিজ বংশের লোকদের পক্ষ থেকে চরম বিরোধিতার আশংকা করছিলেন। কিন্তু হযরত রজা ইবনে হাইওয়া রহ. তাঁকে উৎসাহিত করেন এবং সাহস প্রদান করেন। পরিশেষে তিনি তাঁর খলীফা হিসেবে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের নাম ঘোষণা করেন। (তারিখুল ইসলাম, যাহাবী কৃত, ৭/১৯২-১৯৩ পৃঃ)

খেলাফতের দায়িত্ব লাভের পূর্বে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ. ছিলেন সুন্দর পোষাকধারী এক পরিপাটি যুবক। তাঁর চালচলন ছিলো শাহজাদাদের মতো। কিন্তু খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করতেই তাঁর জীবনে বিপ্লব ঘটে। আবুল ফরজ ইস্পাহানী হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর

একজন সমকালীন নেককার লোক থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা ধোপাকে বলে রাখতাম- হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর কাপড় ধোয়া বাঁচা পানি দ্বারা আমাদের কাপড় ধোবে। কারণ, তিনি অধিক পরিমাণে মেশক ব্যবহার করতেন। এ কারণে আমারা ধোপাকে অতিরিক্ত পয়সাও দিতাম। কিন্তু খেলাফত লাভের পর তাঁর কাপড়ের চেহারাই পাল্টে যায়। (আল আগানী, ৮/১৫৫ পৃঃ) খেলাফতের ঘোষণা এবং সর্বপ্রথম খুতবা দানের পর প্রত্যাবর্তনের জন্যে তাঁর নিকট শাহী বাহন আনা হয়। কিন্তু তিনি তা ফিরিয়ে দেন এবং নিজের ব্যক্তিগত খচ্চরে আরোহণ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। সর্বপ্রথম তিনি নিজের ও নিজের খানদানের সমস্ত সম্পদ বায়তুলমালে জমা দেন। পূর্বের শাসকরা মানুষের যেসব সম্পদ লুণ্ঠন করেছিলেন এক এক করে সব ফিরিয়ে দেন। অন্যায় কর বিলুপ্ত করেন। নিজে সাদামাটা জীবন যাপন করেন। অনেক সময় একজোড়া কাপড় কয়েক মাস পর্যন্ত ধুয়ে পরিধান করতেন। আল্লাহ তাআলার সম্মুখে জওয়াব দেয়ার ভয়ে সর্বদা প্রকম্পিত থাকতেন। তাঁর স্ত্রী বলেন- তিনি সারাদিন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকার পর রাতে যখন ঘরে আসতেন, তখন ইশার নামাযের পর আল্লাহর দরবারে হাত তুলে অনেক রাত পর্যন্ত ক্রন্দন করতেন। সরকারী বাবুর্চীখানার চুলায় অযুর পানি গরম করাও তিনি মেনে নিতেন না। ন্যায়-নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠা ও মাখলুকের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করার জন্যে বড়ো থেকে বড়ো কুরবানী করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি রাষ্ট্র পরিচালোনার জন্যে আড়াই বছরের কিছু কম সময় পেয়েছিলেন। মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন। এ আড়াই বছরে তিনি দেশের চেহারাই পাল্টে দেন। খেলাফতে রাশেদার পরিপূর্ণ নমুনা বাস্তবায়ন করে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। মহান এ খলীফার পুরো জীবনী ধারণ করার উপযোগী এ সফরনামা নয়। আল্লামা ইবনে জাওযী রহ. তাঁর জীবন চরিতের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন। উর্দু ভাষায় মাওলানা আব্দুস সালাম নদবী রহ.-এর 'সীরাতে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.' তার উৎকৃষ্ট সারসংক্ষেপ।

ইসলামী ইতিহাসের এ মহান ব্যক্তিত্বের কবরে সালাম আরয করার সময় অন্তরে বিস্ময়কর এক ভাব বিরাজ করছিলো। মহান কৃতিত্বের অধিকারী আকশচুম্বী এ পর্বতের সম্মুখে নিজের অস্তিত্বকেও পৃথিবীর জন্যে বোঝা অনুভূত হচ্ছিলো। তাঁর পায়ের দিকে তাঁর স্বামীভক্ত স্ত্রী হযরত ফাতেমা রহ. সমাহিত রয়েছেন। সেই ফাতেমা, যিনি একজন শাহজাদীরূপে বিলাস-বৈভবের মধ্যে প্রতিপালিত হন। ওমর ইবনে আব্দুল আযীযকে একজন শাহজাদা মনে করেই তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। কিন্তু তিনি যখন তাঁর স্ত্রীকে বলেন- তুমি আমার সঙ্গে থাকতে চাইলে নিজের সমস্ত অলংকার, হীরে-জহরত এবং নিজের

যাবতীয় সম্পদ বাইতুলমালে জমা দিতে হবে। তখন তিনি নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছিলেন যে, এরচেয়ে শতগুণ সম্পদ বিলিয়ে দিয়েও আমি আপনার সঙ্গেই থাকতে চাই। এরপর সারাটি জীবন তিনি নিজের স্বামীর সঙ্গে দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন।

আল্লাহ্ তাআলা এ সকল পবিত্র স্বভাবের প্রেমিকগণের উপর রহমত নাযিল করুন।

হল্‌ব

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ.-এর মাযার থেকে রওয়ানা হয়ে অনেক রাতে হল্‌ব পৌঁছি। এটি দামেশকের পরে সিরিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাচীন শহর। একে 'হালাবুশ শাহাবা'ও বলা হয়। জনশ্রুতিতে এর নামকরণের কারণ প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এখানে হযরত ইবরাহীম আ. অবস্থান করেছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে সাদা রংয়ের বকরী ছিলো। জুমার দিন তিনি তার দুধ দোহন করে ফকিরদের মধ্যে বিতরণ করতেন। তখন ফকিররা বলতো- 'হালাবা-হালাবা'। আর কেউ 'হালাবাশ শাহ্‌বা'ও বলতো। আরবী ভাষায় দুধ দোহন করাকে 'হল্‌ব' বলা হয়। আর 'শাহ্‌বা' অর্থ সাদা বকরী। তাই এ বাক্যের অর্থ হলো, 'তিনি সাদা বকরীর দুধ দোহন করেছেন'। আল্লামা হামবী রহ. এ কথা উদ্ধৃত করে আপত্তি করেছেন যে, সে সময় হযরত ইবরাহীম আ.-এর ভাষাও আরবী ছিলো না এবং সিরিয়ার লোকদের ভাষাও আরবী ছিলো না। তবে তাঁরা এ সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন যে- সুরিয়ানী বা ইবরানী ভাষার শব্দের সঙ্গে আরবী ভাষার শব্দের যথেষ্ট মিল রয়েছে। হয়তো এর কোন এক ভাষায় 'হল্‌ব' শব্দটি দুধ দোহনের অর্থে ব্যবহার হতো। (মু'জামুল বুলদান, হামবী কৃত, ৩/২৮২)। কিন্তু আল্লামা রাগেব তব্বাখ রহ. হলবের যে ইতিহাস লিখেছেন তাতে তিনি এ ঘটনাকে ভিত্তিহীন বলেছেন। তাঁর মতে এ শহর আমালেকারা গড়ে তুলেছে এবং তাদের শাসকের নাম ছিলো 'হল্‌ব'। এ কারণে শহরের নামও হয় 'হল্‌ব'। আর এখানকার ভূমি ও পাথর সাদা ছিলো বিধায় তাকে 'শাহ্‌বা' বলা হয়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ (আ'লামুন নুবালা, হালাবুশ শাহবার ইতিহাস, ১/৮৩ পৃঃ) এ ঘটনা সঠিক হোক বা না হোক এ বর্ণনা 'তাওয়াতুরে'র সাথে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে এ শহরের কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে। এখানে তার কিছু স্মৃতি-নিদর্শনও পাওয়া যায়।

ডক্টর হামুর সাহেবের বন্ধু ডক্টর মাহমুদ হারিতানী হলবের অধিবাসী। তিনি হলবের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। 'ইহয়াউল আরাবিল কাদীমা' নামে গ্রন্থও রচনা করেছেন। আমরা হল্‌ব পৌঁছতেই এ মর্মে তাঁর ফোন পাই যে, আপনি হলবে অবস্থানকালে এখানকার ঐতিহাসিক

জায়গাসমূহে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ডক্টর হামুর আমাকে ফরমায়েশ করেছেন। আমার দোস্ত ডক্টর আব্দুস সাত্তার আবু গুদ্দাহ (যিনি শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহর ভাতিজা) হলবেরই অধিবাসী। সে সময় কোন এক কাজে তিনি দেশের বাইরে ছিলেন। হলবের রুচিশীল ব্যবসায়ী জনাব আদীব বায়েনজেকীকে তিনি এ মর্মে ফোন করেন যে, হলবে অবস্থানকালে তিনি যেন আমাকে পথপ্রদর্শন করেন। হলবের প্রসিদ্ধ আলেম শাইখ সাঈদ বায়েনজেকী (হাফিযাহুল্লাহু) কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তান এসেছিলেন। তখন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্যে গুরুত্বের সাথে দারুল উলূমে তাশরীফ এনেছিলেন। তিনি ফোনে আমাকে রাতের খাবারের দাওয়াত করেন।

এ সব প্রস্তাবের মধ্যে আমরা এভাবে সমন্বয় করি যে, প্রথমদিন আমরা ডক্টর হারিতানীর দিকনির্দেশনার দ্বারা উপকৃত হই। পরে শাইখ সাঈদ বায়েনজেকী ও আদীব বায়েনজেকীর দিকনির্দেশনা গ্রহণ করি। আমার হলবে আসার খবর শুনে সেখানকার দুই তরুণ আলেম উস্তায সাঈদ রুস্তম ও উস্তায জাবের কা'দান হোটেলে চলে আসেন। তারপর তাঁরাও আমাদের সঙ্গে থাকেন। ডক্টর হারিতানী আমাদেরকে সর্বপ্রথম প্রাচীন ও ঐতিহাসিক দূর্গে নিয়ে যান। দুর্গটি হলবের প্রাচীন শহরের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। ৩১২ খ্রিস্টাব্দে রোমকরা এটি নির্মাণ করে (আ'লামুন নুবালা, তব্বাখ কৃত, ১/৮৪)। ডক্টর হারিতানী বলেন- এ দুর্গের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, শক্তিবলে কেউ এটিকে জয় করতে পারেনি। (মুসলমানগণও এটি সন্ধির ভিত্তিতে জয় করে।) এর কারণ এর সেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, যা সে যুগে ছিলো নজিরবিহীন। প্রথমত, তার চতুর্দিকে একটি গভীর পরিখা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রতি পদে পদে প্রতিরোধব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যেন প্রত্যেক ইঞ্চিতে দুশমনের সঙ্গে জোরদারভাবে মোকাবেলা করা যেতে পারে। আমি বিশ্বের অনেক দুর্গ দেখেছি, কিন্তু সে সব দুর্গের প্রতিরোধব্যবস্থার রহস্য পূর্বে কখনও জানার সুযোগ হয়নি। ডক্টর মাহমুদ হারিতানীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ দ্বারা এই প্রথম বুঝতে পারি যে, দুর্গ নির্মাণ করতে প্রতিরোধমূলক কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা হয় এবং বিশেষ করে এ দূর্গে কী কী ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

দুর্গের মধ্যে একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদের আঙ্গিনার একটি জায়গাকে 'মাকামে ইবরাহীম' বলা হয়। জনশ্রুতি আছে যে, এ জায়গায় এক সময় ইবরাহীম আ. অবস্থান করেছিলেন। যারা হলবের নামকরণের পিছনে হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুধদোহন করাকে কারণ বলেন, তারা আরো বলেন যে, এ জায়গাতেই তিনি দুধ দোহন করতেন। কিন্তু এ কথার কোন সনদ নেই।

দুর্গের এক জায়গায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের লোকেরা খনন কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। সেখানে শহরের তিনটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। যার দ্বারা বোঝা যায় যে, শহরটি তিন বার ধ্বংস হয়েছে এবং পুনঃনির্মাণ হয়েছে। একটি দেয়াল সম্পর্কে হারিতানী সাহেব বলেন- এটি চারহাজার বছরের পুরাতন দেয়াল। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

দুর্গ থেকে নীচে নামলে সামনে সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ুবীর কবর। এর ডানদিকে একটি মাধ্যমিক স্তরের মাদরাসা রয়েছে। যার সম্পর্কে বলা হয় যে, আমাদের শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. ও শাইখ মোস্তফা আয্যারকা রহ. এখানে শিক্ষা লাভ করেছেন। এরপর আমরা হলবের উমাইয়া জামে মসজিদে পৌঁছি। দামেশকের উমাইয়া জামে মসজিদ ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক বানিয়েছেন। আর হলবের উমাইয়া জামে মসজিদ নির্মাণ করেছেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত সোলায়মান বিন আব্দুল মালিক। বর্তমানে বিশাল এ মসজিদটি সংস্কার কাজের জন্যে বন্ধ রয়েছে। হারিতানী সাহেব বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তা খুলে দেখান। মসজিদের হলকক্ষে একটি কবর রয়েছে। বলা হয় যে, এটি হযরত যাকারিয়া আ.-এর কবর। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা ছাড়া কথাটি কতটুকু সঠিক তা নিশ্চিত করে বলা কঠিন। দামেশকের উমাইয়া জামে মসজিদের মতো এ মসজিদটিও আলেমগণের কেন্দ্র ছিলো। এখানে জ্ঞান-গরিমার কতো মহীরুহের পাঠদানের বৈঠক যে, ছিলো তা আজ কারো জানা নেই। আমরা এ মসজিদেই যোহরের নামায আদায় করি।

বর্তমানে মেরামতের জন্যে মসজিদটি বন্ধ রয়েছে। এ কারণে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হচ্ছিলো পার্শবর্তী আরেকটি মসজিদে। এটি ছিলো মূলত একটি মাদরাসা। এখানেও বড়ো বড়ো আলেম দরস দিয়েছেন। এরই একটি কক্ষে নুরুদ্দীন যঙ্গী রহ. নির্মিত সেই মেহরাবটি সংরক্ষিত রয়েছে, যা খ্রিস্টানদের হাত থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত হলে সেখানে বসানোর নিয়তে তিনি বানিয়েছিলেন। নুরুদ্দীন রহ.-এর হাতে বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত হওয়া ভাগ্যে ছিলো না। এ সৌভাগ্য লাভ হয় সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবীর। মিম্বরটি তিনি সেখানে পৌঁছে দেন। কিন্তু অজানা কারণে মেহরাবটি সেখানে নেয়া সম্ভব হয়নি। সুতরাং মনোমুগ্ধকর কারুকাজ করা কাঠের সুন্দর সে মেহরাবটি আজ পর্যন্ত এখানেই রয়েছে। আছরের নামায আমরা এ মসজিদেই আদায় করি।

মসজিদের সাথেই হলবের প্রাচীন বাজার রয়েছে। সেখানে প্রবেশ করলে উপলব্ধি হয় যে, বহুশতাব্দী ধরে এটি তার আসল গঠনে অবিকৃত আছে। প্রাচীন আরবী কিতাবসমূহে বাজারের সাথে সবসময় 'খানাতে'র উল্লেখ পড়ে এসেছি। এগুলো ব্যবসায়ীদের মুসাফিরখানা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। তারা মাল ক্রয়ের

জন্যে এখানে অবস্থান করতো। হারিতানী সাহেব বলেন যে, এ বাজারে পঞ্চাশোর্ধ্ব 'খানাত' রয়েছে। তিনি আমাদেরকে নমুনা হিসাবে তার একটি দেখান। এর মধ্যে প্রশস্ত একটি চৌরাস্তার নিকট নির্মিত হোটেল সদৃশ কয়েকটি কক্ষ রয়েছে। বাইরের ব্যবসায়ীরা নিজেদের পণ্য চৌরাস্তায় এনে নামাতো এবং নিকটবর্তী কোন একটি মুসাফিরখানায় অবস্থান করতো। যার মধ্যে সে যুগ অনুপাতে বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকতো।

পবিত্র চুল

ইশার নামাযের পর আমরা শাইখ বাযেনজেকীর খানার দাওয়াত গ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তীতে জানতে পারি যে, রাতের এ দাওয়াত ছিলো মূলত আদীব বাযেনজেকী সাহেবের পক্ষ থেকে। তবে আয়োজন করা হয়েছে সাঈদ বাযেনজেকীর বাড়িতে। আদীব বাযেনজেকী সাহেবের খোশনসীব যে, তাঁর নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি পবিত্র চুল সংরক্ষিত রয়েছে। ওসমানী খলীফা সুলতান আব্দুল হামীদ পর্যন্ত তিনি তার 'মুত্তাসিল সনদ' (অবিচ্ছিন্ন সূত্র পরম্পরা)-ও বর্ণনা করে থাকেন। সুলতান আব্দুল হামীদ সম্পর্কে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামমের তাবাররুক সংগ্রহের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। পরিপূর্ণ 'মুত্তাসিল সনদ' হয়তো তাঁর কাছেও ছিলো না। কিন্তু তিনি যেই গুরুত্বের সাথে এবং যাচাই-বাছাই করে এসব তাবাররুক সংগ্রহ করেছিলেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিশুদ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সুলতান আব্দুল হামীদের নিকট বেশ কয়েকটি পবিত্র চুল ছিলো। সেগুলো সংরক্ষণ এবং তা থেকে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিকে তা দিয়ে ছিলেন। তিনজনের মধ্যস্থতায় তার একটি পবিত্র চুল আদীব বাযেনজেকী সাহেবের পিতার হাতে আসে। তিনি একজন বিত্তবান ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর ইনতিকালের পর আদীব বাযেনজেকী সাহেব তাঁর সকল উত্তরাধিকারীর নিকট আবেদন করেন যে, পবিত্র চুলটি তাকে দেয়া হলে পিতার পরিত্যক্ত অন্যান্য সম্পদ থেকে তিনি দাবি প্রত্যাহার করে নিবেন। এ ভাবে এ মহান বরকতময় চুলটি তাঁর হাতে আসে। তিনি বছরে একবার জনসাধারণকে পবিত্র চুলটি দর্শন করিয়ে থাকেন। আমার আবেদনে তিনি দয়া করে শাইখ সাঈদ বাযেনজেকী সাহেবের বাড়িতে ছোট একটি সমাবেশ করে পবিত্র চুলের যিয়ারতের ব্যবস্থা করেন। তিনি বরকতময় মহান এ চুলটি একটি শিশিতে মেশক ও আম্বর ভরে তার মধ্যে সংরক্ষণ করেছেন। রাতের খাবারের পর তিনি উপস্থিত সবাইকে তার যিয়ারত করান। আমরা সবাই এ নেয়ামত দ্বারা ভূষিত হই।

শরীয়তের আলোকে পবিত্র চুল যিয়ারতের গুরুত্ব

এ পর্যায়ে শরীয়তের মানদন্ডে পবিত্র চুলের যিয়ারত এবং তা তাবাররুক হওয়ার বিধান কী, তা আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। কারণ, এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রান্তিকতা লক্ষ্য করা যায়। অনেক সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে তাঁর পবিত্র চুল সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিতরণ করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম সেগুলোকে সংরক্ষণ করা এবং সেগুলো দ্বারা বরকত লাভ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। এ বিষয়ে কয়েকটি হাদীস নিম্নে প্রদত্ত হলো।

এক.

হযরত আনাস বিন মালেক রাযি. বলেন- বিদায় হজের সময় যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুন্ডন করেন, তখন প্রথমে মাথার ডান দিকের চুল মুন্ডন করেন এবং এক-দু'টি করে চুল সাহাবীদের মধ্যে বিতরণ করেন। অতঃপর বাম দিকের চুল মুন্ডন করেন এবং হযরত আবু তালহা রাযি.-কে চুলগুলো দিয়ে বলেন-

اقسمه بين الناس

'মানুষের মধ্যে চুলগুলো বিতরণ করে দাও!'

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল হজ্জ ১/৪২১, করাচী থেকে মুদ্রিত)

দুই.

সহীহ বুখারী শরীফে হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মাথা মুন্ডন করেন, তখন হযরত আবু তালহা রাযি. সর্বপ্রথম তাঁর পবিত্র চুল গ্রহণ করেন। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাবু মা য়ুগসালু বিহী শা'রুল ইনসান, ১/২৯)

তিন.

হযরত মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ. বলেন- আমি হযরত ওবায়দা সালমানী রহ.-কে বললাম, আমার নিকট নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চুল রয়েছে। আমি হযরত আনাস রাযি. থেকে এগুলো পেয়েছি। হযরত ওবায়দা রহ. বললেন- আমার নিকট যদি এগুলোর একটি চুলও থাকে তবে আমার জন্যে তা দুনিয়া এবং তার মধ্যের সবকিছু থেকে উত্তম। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল উযূ, বাবু মা য়ুগসালু বিহী শা'রুল ইনসান, ১/২৯)

চার.

হযরত আনাস রাযি. বলেন- আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমতাবস্থায় দেখেছি যে, নাপিত তাঁর পবিত্র মাথা মুন্ডন করছিলো, আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর চতুর্পার্শ্বে সমবেত ছিলেন। তাঁরা চাচ্ছিলেন যে, রাসুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন চুল পড়তেই তা যেন তাঁদের কারো হাতে পৌঁছে। (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু কুরবিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ২/৩৯ পৃঃ)

পাঁচ.

ওসমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহিব বলেন- আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে একটি পেয়ালা দিয়ে হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর নিকট পাঠান। হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর নিকট নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু চুল ছিলো। তিনি একটি শিশির মধ্যে সেগুলো রেখেছিলেন। কোন মানুষের বদনজর লাগলে বা অন্য কোন রোগ হলে সে একটি পাত্রে পানি ভরে হযরত উম্মে সালামা রাযি.-এর নিকট পাঠাতো। (যাতে পবিত্র চুল পানিতে চুবিয়ে সে পানি অসুস্থ ব্যক্তিকে পান করানো যায়)। ওসমান ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন- আমি ঐ শিশির মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখলাম, তার মধ্যে লাল রংয়ের চুল ছিলো। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুশ শাইবি, ২/৮৭৫)

ছয়.

হযরত আনাস রাযি.-এর মাতা হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে বিছানা বিছিয়ে দিতেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বিশ্রাম করতেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়লে হযরত উম্মে সুলাইম রাযি. একটি শিশির মধ্যে তাঁর পবিত্র ঘাম ও পবিত্র চুল সংগ্রহ করতেন এবং তার মধ্যে সুগন্ধি ভরে রাখতেন। হযরত আনাস রাযি.-এর ইনতিকালের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ওসিয়ত করেন যে, তাঁর কাফনের 'হানুতে'র মধ্যে যেন এ সুগন্ধি দিয়ে দেয়া হয়। (সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইসতীযান, বাবু মান যারা কওমান ফাকালা ইন্দাহুম, ২/৯২৯)

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আরো আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগ্রত হয়ে উম্মে সুলাইমকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী করছো? তিনি উত্তর দেন, আমি শিশুদের জন্যে এর বরকতের আশা রাখি। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি ঠিক করেছো।

সাত.

হযরত আনাস রাযি. ইনতিকালের সময় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চুল বের করে তাঁর ছাত্র সাবেত বুনানীকে দেখান এবং বলেন যে, এটি আমার জিহ্বার নিচে রেখে দাও। তাঁর জিহ্বার নিচে তা রেখে দেয়া হলো। এ অবস্থায় তাঁর ইনতিকাল হলো এবং তা সহই তাঁকে দাফন করা হলো। (আল ইসাবা, হাফেয ইবনে হাজার রহ. কৃত, আনাস রাযি.-এর জীবনী, ১/৮৪)

এসমস্ত বর্ণনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চুল বা অন্যান্য স্মৃতি বিজড়িত জিনিস দ্বারা বরকত লাভ

—৭

করা শুধু জায়েযই নয়, বরং বিরাট সৌভাগ্যের বিষয়। সাহাবায়ে কেরাম এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তা সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। (তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম, ৩/৩২৩ পৃঃ তে এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আলেমগণ সেখানে দেখতে পারেন।)

তবে এ বিষয়ে দু'টি কথা স্মরণযোগ্য। প্রথম কথা এই যে, বরকতের জন্যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবাররুকসমূহ সংরক্ষণ করা, সেগুলোর আদব রক্ষা করা এবং সেগুলো ভিজিয়ে পানি পান করা জায়েয এবং প্রমাণিত, কিন্তু এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা, যার মধ্যে শিরকের গন্ধের অনুপ্রবেশ ঘটতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ, তার সামনে রুকু বা সেজদার আকার ধারণ করা জায়েয নেই। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরক ও তার সাদৃশ্য থেকে দূরে থাকার তালীমই দিয়েছেন সর্বপ্রথম।

দ্বিতীয় কথা এই যে, সাহাবা ও তাবেঈদের যুগে বিভিন্ন জনের নিকট যে সমস্ত পবিত্র চুল সংরক্ষিত ছিলো, সেগুলো সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চিতভাবে জানা ছিলো যে, এগুলো বাস্তবিকই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবাররুক। পক্ষান্তরে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ডে যে সব তাবাররুকের কথা বর্ণনা করা হয়, সেগুলো সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভের কোন উপায় নেই। তবে সেগুলো বাস্তবিকই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবাররুক হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে। কতক ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা সবল, আর কতক ক্ষেত্রে দুর্বল। এ কথা যেহেতু সুস্পষ্ট যে, সাহাবী ও তাবেঈগণ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবাররুকসমূহ সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, এ কারণে এটাও স্পষ্ট যে, এ ধারা তাঁদের সন্তানদের মধ্যেও অব্যাহত ছিলো। তাই যেখানে বংশ পরম্পরায় কোন তবাররুক সংরক্ষিত হয়ে আসছে, সেখানে জনশ্রুতি ও প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে এ সম্ভাবনা প্রবল, আর যেখানে এরূপ জনশ্রুতি নেই, সেখানে এ সম্ভাবনা দুর্বল।

কিন্তু রাসুলের মহব্বতের অধিকারী একজন ঈমানদারের জন্যে শুধু এ সম্ভাবনাও যথেষ্ট যে, সে যে তাবাররুকের যিয়ারত করছে তা বাস্তবিকই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চুল এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র দেহের সঙ্গে তা লেগে থাকার মর্যাদা লাভ করেছে। শুধু এ সম্ভাবনার ভিত্তিতেও যদি তার যিয়ারত করা হয়, তবে তা শুধু জায়েযই নয়, বরং ভালোবাসার দাবিও বটে। তবে প্রত্যেক জিনিসকে তার যথাস্থানে রাখাও জরুরী। যেখানে নিশ্চয়তা লাভের কোন উপায় নেই, সেখানে তাকে নিশ্চয়তার মান দেয়াও ঠিক নয়।

আদীব বাযেনজেকী সাহেব আমাদেরকে যে পবিত্র চুল যিয়ারত করান, তাঁর থেকে নিয়ে সুলতান আব্দুল হামীদ পর্যন্ত এর সনদ বিদ্যমান রয়েছে। অপরদিকে একথা প্রমাণিত যে, সুলতান আব্দুল হামীদ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কয়েকটি চুল গুরুত্বের সাথে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। এ কারণে এগুলো প্রকৃত তাবাররুক হওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট শক্তিশালী। যদিও সুলতান আব্দুল হামীদের উপরে গিয়ে এর সনদ জানা নেই। যাইহোক, আমাদের মতো লোকদের জন্যে এ সম্ভাবনাও কি কম নেয়ামত ছিলো? আল্লাহ তাআলার অসীম অনুগ্রহে তা দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়।

শাইখ সাঈদ বাযেনজেকী- যাঁর বাড়িতে আদীব সাহেব নৈশভোজ এবং এ সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন- মাশাআল্লাহ অত্যন্ত উচ্ছল প্রকৃতির বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব। তিনি আমাদের যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশি সম্মান ও ভালোবাসার আচরণ করেন। তিনি বলেন যে, হলবের আকর্ষণীয় অংশ আমি আপনাদেরকে দেখাতে চাই। আগামীকাল সারাদিন আমি আপনাদের সঙ্গে থাকবো। হলবের সে সমস্ত প্রাচীন মসজিদ-মাদরাসা ঘুরিয়ে দেখাবো, যেগুলো অতীতে বড়ো বড়ো আলেমের কেন্দ্র ছিলো। অনেক রাতে সমাবেশ সমাপ্ত হয়।

হল্‌বের প্রাচীন মহল্লা

ওয়াদা মোতাবেক পরদিন সকাল সাড়ে নয়টায় শাইখ সাঈদ বাযেনজেকী কিছু সঙ্গীসহ আমাদেরকে সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাশরীফ আনেন। হলবের তরুণ আলেম শাইখ সাঈদ রুস্তম ও উস্তায জাবের কা'দান আজও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্যে চলে আসেন। এভাবে বড়ো একটি কাফেলা হয়ে যায়।

শাইখ সাঈদ আমাদেরকে হলবের এমন এক এলাকায় নিয়ে যান, যেখানে পৌঁছে বাস্তবিকই মনে হচ্ছিলো যে, আমরা কয়েক শতাব্দী অতীতে চলে গিয়েছি। তাঁরা আমাদেরকে 'বাবে ইন্তাকিয়া'য় গাড়ি থেকে নামান। এটি ছিলো হল্‌ব শহরের নগররক্ষাপ্রাচীরের সেই ফটক, যা ইন্তাকিয়ার দিকে উন্মুক্ত হতো। এ কারণে একে 'বাবে ইন্তাকিয়া' বলা হতো। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ রাযি. ও হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ রাযি. হল্‌ব বিজয়কালে এ ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করেছিলেন। দামেশকের মতো এ শহরটিও অবরুদ্ধ করার পর সন্ধিচুক্তির মাধ্যমে বিজিত হয়। এটিই ছিলো সে জায়গা, যেখান থেকে সাহাবায়ে কেরাম প্রথমবার বিজয়ী বেশে হলবে প্রবেশ করেন। ফটকের নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আমারা প্রাচীন ধাঁচের মহল্লা ও পুরাতন সড়কের এক দীর্ঘ সারি দেখতে পাই। শাইখ সাঈদ বাবে ইন্তাকিয়ার কয়েক গজ দূরের একটি মসজিদের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যান। সহাবায়ে কেরাম হলবে প্রবেশ করার পর এখানে ঢাল

রেখে বিশ্রাম করেছিলেন। হলবের ইতিহাসসমূহে উল্লেখ আছে যে, ঐ জায়গাতেই সাহাবায়ে কেরাম সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রথম দিকে একে 'মসজিদে গাযায়েরী' বলা হতো। শাইখ আবুল হাসান আলী বিন আব্দুল হামীদ আল গাযায়েরী উচ্চস্তরের আল্লাহর ওলী এবং হযরত সিররি সাক্তী রহ.-এর অন্যতম মুরীদ ছিলেন। পরবর্তীতে নুরউদ্দীন ঐঙ্গী রহ. এখানে একটি ওয়াক্ফ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সে যুগের শাফেয়ী ফকীহ ও দুনিয়াবিরাগী বুযুর্গ আল্লামা শুয়াইব ইবনে আহমাদ উন্দুলুসী রহ.কে ফিকহে শাফেয়ী পাঠদানের জন্যে নিয়োজিত করেন। তারপর থেকেই একে 'মসজিদে শুয়াইব' বলা হয়। (আ'লামুন নুবালা, তব্বাখ কৃত, ১/৯৫) সাহাবায়ে কেরাম শহরে প্রবেশ করে এখানে ঢাল রেখেছিলেন, এ কারণে একে 'মসজিদুল আতরাস'ও বলা হয়। যার অর্থ 'ঢাল ওয়ালা মসজিদ'।

কল্পনার চক্ষু সে সকল দৃঢ়সংকল্প সহাবায়ে কেরামকে এখানে তাবু ফেলা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছিলো, যাঁরা আরবের মরু প্রান্তর থেকে আল্লাহর কালিমা নিয়ে বের হয়েছিলেন এবং রহমতের মেঘ হয়ে রোম ও ইরানের দিগন্ত আচ্ছন্ন করেছিলেন। আল্লাহু আকবার!

শাইখ সাঈদ অত্যন্ত আনন্দদীপ্ত, রুচিশীল ও পরিচ্ছন্ন বুযুর্গ। তিনি বলেন- 'এখন আমি আপনাকে পায়ে হাঁটিয়ে ক্লান্ত করতে চাই। কারণ, আপনাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাচ্ছি, সেখানে গাড়ি যেতে পারবে না এবং আপনার মতো ব্যক্তির এ এলাকায় যাওয়া ছাড়া হলবের সফরও সম্পূর্ণ হবে না।' আমি কষ্ট বরণ করার জন্যে আগে থেকেই আগ্রহান্বিত ছিলাম। তখন হালকা-হালকা বৃষ্টিও হচ্ছিলো। শাইখ সাঈদ কোথা থেকে যেন ছাতার ব্যবস্থা করেন। আমরা শহরের সেই প্রাচীন গলিতে প্রবেশ করি, যা শতো শতো বছর ধরে অবিকৃত রয়েছে। শাইখ সাঈদ বলেন- এ মহল্লার নাম 'জালুম'। হলবের ইতিহাসে জায়গায় জায়গায় এর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহল্লাটি আলেম, ফকীহ্, মুহাদ্দিস, সাহিত্যিক ও সুফীগণের কেন্দ্র ছিলো। এখানে অল্প-অল্প ব্যবধানে মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা ছিলো। এগুলোর প্রত্যেকটি ছিলো ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন না কোন মহীরুহের কেন্দ্র।

শাইখ সাঈদ কিছুক্ষণ পর পর বলছিলেন যে, এটি অমুক মাদরাসা। এখানে অমুক বুযুর্গ পাঠদান করতেন। এটি অমুক খানকা। এখানে অমুক আল্লাহর ওলী বাস করতেন। এ সমস্ত জায়গা ও বুযুর্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে প্রয়োজন বিরাট এক ভলিউম। আর সত্য কথা হলো, অনেক জায়গার বিস্তারিত আলোচনা আমার মনেও নেই। তবে ঐ মহল্লার সংকীর্ণ গলি এবং তার দুদিকে নির্মিত বাড়িসমূহ অতিক্রমকালে মন-মগজে অপার্থিব এক আনন্দ উপলব্ধি

হচ্ছিলো। গলিগুলো ছিলো লম্বা এবং বর্তমান যুগের তুলনায় সংকীর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বাড়িঘর ছিলো পুরাতন ধাঁচের, কিন্তু প্রশস্ত ও আলোকিত। না জানি কতো আলেম, ফকীহ্ ও আল্লাহর ওলীর পবিত্র শ্বাস-প্রশ্বাস এখানকার বাতাসে ছড়িয়ে আছে। আজও এখানে এসে নুরানিয়াত উপলব্ধি হয়। প্রাচীন হলবের এ এলাকার যেসব জায়গা শাইখ সাঈদ দেখান, তার মধ্যে মাত্র তিনটি জায়গার আলোচনা করে ক্ষান্ত হবো।

আল্লামা সিবতে ইবনুল আজমী রহ.-এর রূমী মসজিদ

জালুম মহল্লায় 'মুংলিবুগা' নামে বিশাল একটি মসজিদ রয়েছে, যাকে রূমী মসজিদও বলা হয়। এ মসজিদে আল্লামা ইবনুল আজমী রহ. দরস দান করতেন। তিনি অষ্টম শতাব্দীর বড়ো মুহাদ্দিসগণের অন্যতম। তাঁর নাম ছিলো ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে খলীল আল বুরহান। তাঁকে 'বুরহানে হালবী'ও বলা হয়। তবে তিনি 'সিবতে ইবনুল আজমী' উপাধি দ্বারা অধিক প্রসিদ্ধ। যার অর্থ 'ইবনুল আজমীর নাতী'। এটিও একটি মজার ঘটনা যে, তাঁর নানা- আবু হামেদ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আজমী- যাঁর দিকে সম্বন্ধ করে তাঁকে 'সিবতে ইবনুল আজমী' বলা হয়। পরবর্তীতে তিনি অতো বেশি প্রসিদ্ধ ছিলেন না। এখন আবু হামেদ ইবনুল আজমীর পরিচয় দানের জন্যে তাঁকে 'সিবতে ইবনুল আজমী'র নানা বলতে হবে। যার অর্থ দাঁড়ায়- ইবনুল আজমীর নাতীর নানা।

আল্লামা সিবত ইবনুল আজমী এই জালুম মহল্লাতেই জন্ম গ্রহণ করেন। অভিধানে তিনি 'কামুস' এর গ্রন্থকার আল্লামা ফিরোয আবাদী রহ.-এর শাগরিদ। হাদীসশাস্ত্রে শামের ওলামায়ে কেরাম ছাড়া হাফেয যয়নুদ্দীন ইরাকী রহ., হাফেয ইবনুল মুলকিন রহ. ও হাফেয বুলকিনী রহ.-এর মতো হাফেযে হাদীসগণের ছাত্র ছিলেন। তাঁদের থেকে ইলম অর্জন করার জন্যে তিনি কায়রোতে সফর করেন। অবশেষে হলবে অবস্থান করে পাঠদান ও গ্রন্থ রচনার কাজে মশগুল হন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. ৭৩৬ হিজরীতে যখন হলবে তাশরীফ আনেন, তখন আল্লামা সিবতে ইবনুল আজমী রহ.-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জনের নিয়ত করে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যে হাফেয ইবনে হাজার রহ. নিজ হাতে 'মুসালসাল বিল আওয়ালিয়্যাত' হাদীস সনদ সহ লিখে তাঁকে দেখান। সনদের মধ্যে এমন একজন শাইখের নাম তিনি বৃদ্ধি করেন, যার নাম মূল সনদের মধ্যে ছিলো না। আল্লামা সিবতু ইবনুল আজমী রহ. বিষয়টি বুঝতে পারেন কি না, তা পরীক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিলো। কিন্তু তিনি সাথে সাথে বুঝে ফেলেন এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ.-কে নিশ্চিত করে বলেন যে, এ বৃদ্ধি সঠিক নয়। অতঃপর তিনি হাফেয ইবনে হাজার রহ.-এর দিকে ইঙ্গিত করে একজন ছাত্রকে লক্ষ্য করে

বলেন- ‘এ ব্যক্তি আমার সঙ্গে এমন সময় মিলিত হয়েছে, যখন আমি অর্ধেক মানুষ হয়ে গিয়েছি।’ তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আমি অর্ধাঙ্গ ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর যখন আমার স্মরণশক্তি দুর্বল হয়ে গেছে, তখন সে এসেছে। (الضوء اللامع, সাখাবী কৃত, ১/১৪৪)

পরবর্তীতে হাফেয ইবনে হাজার রহ. তাঁর থেকে হাদীসের ইজাযত গ্রহণ করেন। তাঁর বুখারী শরীফের ভাষ্যগ্রন্থ হতে উপকৃত হন। তিনি তাঁর ইলম ও যুহ্দের অনেক প্রসংশা করেছেন এবং বলেছেন বর্তমানে তিনি হল্ব শহরের শাইখ। যাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তাঁর সাথে আমার পত্র যোগাযোগ রয়েছে। (الضوء اللامع, সাখাবী কৃত, ১/১৪৪)

‘তাযকিরাতুল হুফফাযে’র টীকাকার আল্লামা তাকীউদ্দীন ফাহাদ রহ. তাঁর আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলেন, ৮১৩ হিজরীতে যখন তিনি হজের উদ্দেশ্যে মক্কা মোকাররমায় এসেছিলেন, তখন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। মীনাতে তাঁর নিকট হাদীস পড়েছি। তিনি আমাকে হাদীসের সাধারণ ইজাযত দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন- ‘আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিরাপদে রেখে উম্মাতে মুসলিমাকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন।’ (লাহযুল আলহায, ইবনে ফাহাদ রহ. কৃত, যুয়ুলু তাযকিরাতিল হুফফায, ৩১৪)

শাইখ সিবতে ইবনুল আজমী রহ. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও ইবনে মাজা-র টীকাও লিখেছেন। সিহাহ সিত্তার রিজাল সম্পর্কিত তাঁর ‘নিহায়াতুস সউল’ (نهاية السؤل) কিতাবটি মুদ্রিত হয়েছে। তাঁর অনেক কিতাব দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে।

জ্ঞান-গরিমায় উচ্চ মার্গের হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ইবাদত, ইতাআত, যুহ্দ, তাকওয়া ও হুসনে আখলাকেরও নমুনা বানিয়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন যে, বেশির ভাগ সময় তিনি কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন, বেশি বেশি রোযা রাখতেন এবং রাত্রি জাগরণ করতেন। ধন-দৌলতের প্রতি কোন লোভ ছিলো না। সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। দুই বার তাঁকে বিচারপতির পদ পেশ করা হয়, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন।

তৈমুর লং যখন হল্ব আক্রমণ করেন, তখন তিনি নিজের কিতাবগুলো নিয়ে দুর্গের ভিতর চলে যান। তৈমুর লং শহর দখল করলে তাঁকে বন্দী করা হয়। তৈমুর যখন দামেশকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন আর তিনি মুক্ত হয়ে বাড়িতে ফিরে আসেন, তখন বাড়ির সবাই সেখান থেকে নিরুদ্দেশ ছিলো। দীর্ঘদিন পর জানা যায় যে, তারা পালিয়ে এক জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। পরবর্তীতে তারা সকলে ফিরে আসে। শাইখের কিতাবগুলোও দুর্গ থেকে পাওয়া যায়।

আরেকবার কোন এক শত্রুট্ট হল্‌ব অবরোধ করে। মানুষ ভীত সন্ত্রস্ত ছিলো। এমতাবস্থায় হলবের এক অধিবাসী আল্লামা সিরাজ বুলকিনী রহ.-কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি বলছেন- 'হল্‌ববাসী যেন কোন আশংকা না করে। তোমরা হাদীসের সেবক মুহাদ্দিস ইবরাহীম (সিবতে ইবনুল আজমী) এর নিকট গিয়ে বলো- তিনি যেন 'উমদাতুল আহকাম' কিতাবটি পাঠ করেন। যাতে করে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সমস্যা দূর করে দেন।' লোকটি জাগ্রত হয়ে শাইখকে স্বপ্নের কথা বলে। শাইখ জুমার দিন একদল ছাত্রের সামনে 'উমদাতুল আহকাম' পাঠ করে মুসলমানদের বিপদ দূর হওয়ার জন্যে দুআ করেন। আল্লাহ তাআলার মর্জি, সে দিনই শেষ বেলায় হলবের অধিবাসীরা আক্রমণকারীদের উপর জয় লাভ করে।

ঘটনাটি হাফেয সাখাবী রহ. উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনাটি সঠিক হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা এই যে, আল্লাহ তাআলা কতক সময় তাঁর কোন বান্দাকে স্বপ্নে দেখিয়ে অন্যদেরকে সুসংবাদ দিয়ে থাকেন। অনেক সময় স্বপ্নে যাকে দেখানো হয় সে নিজেও জানতে পারে না। যাইহোক, তার বাচনিক ভবিষ্যতের কোন বিষয় বলে দেওয়া হয়। এটি এক প্রকারের 'রুইয়ায়ে সালেহা' বা 'শুভ স্বপ্ন'।

যে মসজিদের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, 'মুংলিবুগা' নামক হলবের একজন ন্যায়বিচারক গভর্ণর অষ্টম শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেন। এ কারণে একে 'জামে মুংলিবুগা' বলা হয়। আল্লামা সিবতে আজমী এখানে হাদীসের দরস চালু করেন। হাফেয ইবনে হাজার রহ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে এখানেই তাশরীফ এনেছিলেন। মসজিদটি এখনও মজবুত ও আবাদ রয়েছে। আমরা যখন মেহরাবের ঐ জায়গায় পৌঁছি, যেখানে আল্লামা সিবতে ইবনুল আজমী দরস দিতেন বলে প্রসিদ্ধ রয়েছে, তখন আমাদের সঙ্গীদের মধ্য থেকে উস্তায জাবের কা'দান আমাকে এক অদ্ভুত ধরনের ফরমায়েশ করে বসেন। তিনি বলেন যে, আমি জানতে পেরেছিলাম যে, শাইখ সাঈদ বাযেনজেকী আপনাদেরকে জামে মুংলিবুগায় নিয়ে যাবেন, তাই আমি বাড়ি থেকে আপনার সহীহ মুসলিমের ভাষ্যগ্রন্থ 'তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিম' সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আল্লামা সিবতুল আজমীর জায়গায় বসে আপনার সামনে এর কিছু অংশ পাঠ করবো। তিনি এমন আঙ্গিকে আবেদন করেন যে, আমি আর না করতে পারলাম না। এখানে বসে তিনি 'তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে'র কিছু অংশ আমার সামনে পাঠ করেন।

জামে মুংলিবুগা দেখার পর শাইখ সাঈদ বাযেনজেকী বলতে লাগলেন যে, প্রাচীন ধাঁচের মাদরাসার একটি ঝলক তো আপনি দেখলেন, এখন আমি আপনাকে সুফিয়ায়ে কেরামের একটি খানকা দেখাতে চাই। (খানকাকে এ

এলাকায় 'যাবিয়া' বলে) সুতরাং তিনি আমাদেরকে নকশবন্দী মাশায়েখের একটি 'যাবিয়া'য় নিয়ে যান। শামের 'যাবিয়া' সম্পর্কে অনেক আলোচনা আমি বিভিন্ন কিতাবে পড়েছি, কিন্তু এই প্রথমবার নিজ চোখে তা দেখার সুযোগ হয়। এখানে মসজিদের উপর তলায় যিকিরকারীদের জন্যে প্রাচীন যুগে নির্মিত নির্জন কক্ষ রয়েছে। সেগুলোতে মুরিদরা চিল্লা লাগাতেন। বর্তমানে যিনি যাবিয়ার ব্যবস্থাপক, তিনি অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেন। তিনি বলেন যে, এখনও এখানে সাধারণ মানুষের দরস ছাড়া যিকিরের মজলিসও হয়ে থাকে।

মাকামুল খলীল

এরপর শাইখ বাযেনজেকী আমাদেরকে 'জালুম' মহল্লা থেকে আরেকটি মহল্লায় নিয়ে যান। এখানে প্রাচীন কাল থেকে 'মাকামুল খলীল' নামে প্রসিদ্ধ একটি মসজিদ রয়েছে। মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এ জায়গায় হযরত ইবরাহীম আ. অবস্থান করেন। আমরা ঐ মসজিদে যোহরের নামায আদায় করি। নামাযের পর ইমাম সাহেব কেবলার দিকের দেয়ালের নিকটবর্তী গর্তের মধ্যে একটি পায়ের চিহ্ন দেখান। যার সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পদচিহ্ন। তারপর তিনি কেবলার দিকের আরেকটি কক্ষে নিয়ে যান। সেখানে একটি মেহরাবের মধ্যে একটি পাথর উপর দিকে উঠে ছিলো। কথিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর সঙ্গে হেলান দিয়ে বসতেন। এ সব বর্ণনা সত্যায়নের ও নির্ভরযোগ্যভাবে প্রমাণের কোন উপায় নেই। হযরত ইবরাহীম আ. যে, সিরিয়ায় অবস্থান করেছেন তা নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত, কিন্তু তিনি কোথায় অবস্থান করেছেন তা নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। এটা ঠিক যে, শত-শত বছর ধরে এ জায়গা 'মাকামুল খলীল' নামে প্রসিদ্ধ এবং প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ.

এ মসজিদেরই উত্তরে বিখ্যাত হানাফী ফকীহ আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ.-এর মাযার অবস্থিত। আল্লামা কাসানীর কিতাব 'বাদাইউস সানায়ে' দ্বারা আমাদের মতো তালিবে ইলম দিনরাত উপকৃত হয়ে থাকি। সুন্দর বিন্যাসের দিক থেকে এটি হানাফী ফিকহের সুন্দরতম কিতাব। আল্লাহ তাআলা কিতাবটিকে অসাধারণ মাকবুলিয়াত দান করেছেন। এ কিতাবটি সংকলনের বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, আল্লামা আলাউদ্দীন কাসানী রহ.-এর উস্তায আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ সমরকান্দী রহ.-এর মেয়ে ফাতেমাও আলেমা ছিলেন। তিনি তার পিতার সংকলিত কিতাব মুখস্থ করেছিলেন। তিনি রূপ-সৌন্দর্যেও ছিলেন অনন্যা। কতিপয় শাহজাদার পক্ষ থেকে তার বিবাহের প্রস্তাব

এসেছিলো। কিন্তু তাঁর পিতা তাকে ভালো কোন আলেমের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। এ সময় তাঁর শাগরিদ আল্লামা কাসানী রহ. তাঁর খেদমতে আসেন। তিনি তাঁর কাছে অনেক কিতাব পড়েন। শুধু তাই নয়, বরং 'তুহফাতুল ফুকাহা' কিতাবের 'দমজে'র পদ্ধতিতে বিরাট ভাষ্যগ্রন্থ লেখেন। অর্থাৎ, মতন ও শরাহ একজান ও একপ্রাণ হয়ে যায়। উস্তায ভাষ্যগ্রন্থ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং নিজ মেয়ে ফাতেমাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেন। এ কিতাবকে তার মহর নির্ধারণ করেন। এমনকি আল্লামা কাসানী রহ. সম্পর্কে এ প্রবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে যায় যে-

شرح تحفته و تزوج ابنته.

'তিনি তার উস্তাযের কিতাবের ব্যাখ্যা লিখেছেন এবং তার মেয়েকে বিবাহ করেছেন।'

আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. থেকে শুনেছি যে, এরপর এ পরিবার থেকে যখন কোন ফাতাওয়া বের হতো তার উপর বাপ-বেটি ও জামাই তিনজনের সাক্ষর থাকতো।

আল্লামা কাসানী রহ.-এর গুণবতী স্ত্রী তাঁর আগেই ইনতিকাল করেন। আল্লামা কাসানী রহ. প্রতি শুক্রবার রাতে তাঁর কবরে যাওয়া কখনও ছাড়েননি। পরবর্তীতে তাঁকেও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সমাহিত করা হয়। এমনকি হলবের অধিবাসীদের মধ্যে এ কবর দু'টি 'দম্পতির কবর' নামে প্রসিদ্ধ ছিলো। মানুষের মধ্যে এ কথাও প্রসিদ্ধ ছিলো যে, এখানে দোআ করলে কবুল হয়ে থাকে। (আল ফাওয়াহিদুল বাহিয়্যা, ১/৫৩, ও আ'লামুন নুবালা, তব্বাখ কৃত, ৪/২৮৬-২৮৮)

আলহামদুলিল্লাহ! উভয়ের কবরে সালাম পেশ করার এবং ইসালে সওয়াব করার তাওফীক লাভ হয়। এভাবে শাইখ সাঈদ বাযেনজেকীর সাহচর্যে প্রাচীন হলবের এ ভ্রমণ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও প্রাণবন্ত হয়। দুপুরে নিজ বাড়িতে নিজের পক্ষ থেকে তিনি মধ্যাহ্ন ভোজের অয়োজন করেন। (কারণ, গত রাতের নৈশভোজ ছিলো আদীব বাযেনজেকীর পক্ষ থেকে।) শহরের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকেও দাওয়াত দিয়েছিলেন। মাগরিব পর্যন্ত সেখানে মনোমুগ্ধকর এক সমাবেশ হয়।

পরের দিন সকালে আমরা বিমানযোগে হল্‌ব থেকে আম্মানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখানে তিনদিন অবস্থান করি। 'জাহানে দীদা'য় আমি জর্দানের বিভিন্ন জায়গার বিবরণ লিখেছি। আরো সুন্দর ও বিস্তারিত আলোচনা এসেছে শ্রদ্ধেয় বড়ো ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী' ওসমানী সাহেব (মুদ্দা যিল্লুহুম)-এর সিরিয়ার ভ্রমণকাহিনীতে। যা 'আল বালাগে' 'আম্বিয়া কি সারযমীন মেঁ' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

কিরগিজিস্তান সফর

(রজব ১৪২৭ হিজরী, আগষ্ট ২০০৬ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মধ্য এশিয়ার যেসব দেশ সত্তরাধিক বছর সেভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে ছিলো এবং সেভিয়েত ইউনিয়ন খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাওয়ার পর স্বাধীনতা লাভ করেছে, সেগুলো এখন উজবেকিস্তান, তাজাকিস্তান, কিরগিজিস্তান, কাজাখস্তান ও তুর্কমেনিস্তান নামে পৃথক পৃথক দেশ হয়েছে। এ পুরো অঞ্চলটিকেই একসময় তুর্কমেনিস্তান বলা হতো। এক সময় তা জ্ঞানগরিমার অনেক বড়ো কেন্দ্র ছিলো। সেখান থেকে ইসলামী ইতিহাসের সে সকল উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন, যাঁদের ইলম দ্বারা পুরো মুসলিম বিশ্ব আজ ফয়েয লাভ করছে। সেভিয়েত ইউনিয়নের শাসনকালে এসব দেশের আলেম ও নেককার লোকদের উপর যে প্রলয় ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ হয়তো কখনোই সাধারণের সামনে আসবে না। সত্তর বছর পর্যন্ত মুসলিম জাহান থেকেই শুধু নয়, বরং সমগ্র বিশ্ব থেকে এসব দেশের যোগাযোগ এমনভাবে বিচ্ছিন্ন ছিলো যে, না বাইরের কোন লোক সহজে সেখানে যেতে পারতো, না সেখানকার কোন লোক বাইরে আসতে পারতো; বরং চিঠিপত্রের মাধ্যমেও তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব ছিলো না।

স্বাধীনতা লাভের পর এখন সেখানে যাতায়াতের পথ উম্মুক্ত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উজবেকিস্তান এমন একটি দেশ, যেখানে মুসলমানদের ইলমী ইতিহাসের বড়ো-বড়ো কেন্দ্র বুখারা, সমরকন্দ, তিরমিয, ফারগানা ও তাসখন্দ অবস্থিত। ১৯৯২ ঈসায়ীতে উলামায়ে কেরামের একটি জামাতের সাথে আমি

সেখানে সফর করেছি। কিন্তু আফসোস! ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সেখানকার সফরনামা লেখা হয়ে ওঠেনি।

আলহামদুলিল্লাহ! এসব এলাকায় তাবলীগ জামাতের লোকেরা অত্যন্ত মেহনত ও হিকমতের সাথে তাদের কাজ ছড়িয়ে দিয়েছে। তাবলীগ জামাতেরই অন্যতম তৎপর সদস্য- জনাব জাভেদ হাজারবী সাহেব তার কতিপয় সঙ্গীর সহযোগিতায় কিরগিজিস্তানে একটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি প্রায় দেড় বছর ধরে কিরগিজিস্তান সফর করার জন্যে আমাকে পীড়াপীড়ি করছিলেন। এসব দেশে তিনি বার বার সফর করেছেন। এসব দেশের অবস্থা সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। তিনি বলেন যে, অন্যান্য দেশের তুলনায় কিরগিজিস্তানে দ্বীনী দাওয়াত ও তালীমের পরিবেশ অধিক অনুকূল। একারণে এখানে বহুমুখী দ্বীনী কাজের প্রয়োজন রয়েছে এবং তার উপকারেরও বিরাট আশা রয়েছে। পরবর্তীতে তার সে কথা সত্যায়িতও হয়।

এ বছর রজব মাসের শেষে যখন দারুল উলূমের শিক্ষা বছর শেষ হয়, তখন আমি এ সফরের সংকল্প করি। জাভেদ হাজারবী সাহেব ছাড়া জনাব হাফেয গিয়াস উদ্দীন সাহেবও সফরসঙ্গী হন। ইতিপূর্বে তিনি যদিও সেখানে যাননি। কিন্তু সেখানকার দাওয়াতী ও তালীমী কর্মকান্ডে এখান থেকে সহযোগিতা করেছেন।

করাচী থেকে কিরগিজিস্তানের রাজধানী বিশকেকে (Bishkek) সরাসরি কোন বিমান থাকলে চার-সাড়ে চার ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছা সম্ভব। কিন্তু এখনও নিয়মতান্ত্রিক কোন এয়ারলাইনস করাচী থেকে কিরগিজিস্তানে সার্ভিস চালু করেনি। এ কারণে সেখানে যেতে হয় দুবাই বা ইস্তাম্বুল হয়ে। ফলে সফর হয় অনেক দীর্ঘ। তবে কিরগিজিস্তানের এক ব্যবসায়ী আযীয সাহেব সপ্তাহে একবার একটি প্রাইভেট বিমান চার্টার করে পাকিস্তানে যাতায়াত করে থাকেন। তার মধ্যে যাত্রীদের যাওয়ার সুবিধা এবং কার্গো ব্যবস্থাও রয়েছে। আগে তিনি করাচী আসতেন, কিন্তু এখন ইসলামাবাদ এসে সেখান থেকেই চলে যান। বিশকেক যাওয়ার জন্যে এ পথটিই আমার কাছে সহজ মনে হয়। সুতরাং ২৭শে রজব, ১৪২৭ হিজরী, মোতাবেক ২৩শে আগস্ট, ২০০৬ ঈসায়ী সকালে আমরা করাচী থেকে ইসলামাবাদ পৌঁছি। আযীয সাহেবের বিমানযোগে মাগরিবের কাছাকাছি ইসলামাবাদ থেকে রওয়ানা হই। পুরাতন ধাঁচের একটি রাশিয়ান বিমান। এয়ারকন্ডিশনের ব্যবস্থা নেই। পথের বেশিরভাগ সময় গরম অনুভব হয়। আযীয সাহেব আমাদের জন্যে ভালো আসনের ব্যবস্থা করেন। বিমানের ব্যবস্থা অনুপাতে তিনি অনেক কষ্ট করে আমাদেরকে সম্ভাব্য সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেন। প্রায় তিন ঘণ্টার সফর ছিলো। কিরগিজিস্তানের সময় পাকিস্তান থেকে এক ঘণ্টা এগিয়ে। এ জন্যে যখন আমরা বিশকেক অবতরণ করি, তখন

সেখানে রাত এগারোটা বাজছিলো। এসব দেশে 'মুফতী' একটি সরকারী পদ। যা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মর্যাদা রাখে। এ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ ফাতাওয়াদানের চেয়ে মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় ব্যবস্থাপনার কাজ অধিক করে থাকেন। মুরাদ আলী জামানুফ কিরগিজিস্তানের মুফতী। তাঁরই দাওয়াতপত্রের ভিত্তিতে আমরা কিরগিজিস্তানের ভিসা পেয়েছি। তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেন। বিশকেকের বিমানবন্দর আন্তর্জাতিক মানের। বিমানবন্দরের দায়িত্বশীল অফিসারগণ ও সহকারী মুফতী সাহেব বিমানের সিঁড়িতে আমাকে স্বাগত জানান। ভি,আই,পি লাউঞ্জের মাধ্যমে ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য ধাপ সম্পন্ন করেন। মুফতী মুরাদ আলী সাহেব সে সময় সফরে ছিলেন। সহকারী মুফতী সাহেব ও তাঁর সঙ্গীগণ তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমা চান। বিমানবন্দর থেকে যখন রওয়ানা হই, তখন সরকারী পাইলট আগে-আগে যাচ্ছিলেন। এখানকার লোকেরা বলে যে, কিরগিজিস্তানে এই প্রথম দ্বীনের একজন তালিবে ইলমকে এ পরিমাণ সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

মোখতার সাহেব বিশকেকের একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ী। তিনি এখানে তাবলীগ জামাতের কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। তিনি আমাদের অবস্থানের জন্যে নিজের বাড়ি খালি করে দেন। তাঁর বাড়িতে যখন পৌঁছি, তখন রাত বারোটা বেজে গিয়েছিলো। স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের বড়ো একটি দল খাবারের দস্তরখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা হয়। প্রায় রাত দেড়টায় বিছানায় যাওয়ার সুযোগ হয়।

পরের দিন (২৮শে রজব) সকাল ৯টায় বিশকেকের কেন্দ্রীয় মসজিদে স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের একটি সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। আলিশান এ মসজিদটি শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। মসজিদ সংলগ্ন কক্ষসমূহে মুফতী সাহেবের অফিস। এখান থেকে সারা দেশের ধর্মীয় বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ পুরো ব্যবস্থাপনাকে 'মুফতিয়াত' বলা হয়।

এ অঞ্চলের আলেমগণ শুরু থেকেই হানাফী মাযহাবের অনুসারী। সেভিয়েত ইউনিয়নের শাসনকালে অধিকাংশ মজবুত আকীদার আলেমকে নির্দয়ভাবে শহীদ করা হয়। অনেককে সাইবেরিয়ার তুষারাঞ্চলে এমনভাবে ফেলে রাখা হয় যে, তাঁরা সেখানেই ধুঁকে ধুঁকে মারা যান। যে সব আলেম বেঁচে ছিলেন, তাঁদের জন্যেও পাঠদান ও ওয়াজের অনুমতি ছিলো না। কিন্তু তাঁরা লুকিয়ে লুকিয়ে জরুরী তালীম চালু রাখেন। কোন কোন আলেম নিজ-বাড়ির কক্ষে সবার অগচোরে রাত তিনটা থেকে ফজর পর্যন্ত পাঠদান করতেন। তাঁদের কাউকে কাউকে সরকারের পক্ষ হতে কার্পাস ক্ষেতে কৃষি কাজের জন্যে নিয়োজিত করা হয়। তাঁরা ক্ষেতের কাজ করতেন আর লুকিয়ে লুকিয়ে পাঠদান

করতেন। ছাত্ররা হাতে কাঁচি নিয়ে সেখানে যেতো এবং ক্ষেতের আড়ালে উস্তাযের নিকট পাঠ গ্রহণ করতো। এভাবে জান বাজি রেখে তাঁরা দ্বীন ও ইলম যতোটুকুই সংরক্ষণ করেছেন তাই শত প্রশংসার যোগ্য। বলাবাহুল্য যে, এ অবস্থায় ছাত্রদেরকে শুধু প্রয়োজনীয় ইলমই শেখানো সম্ভব ছিলো। বিস্তৃত ও গভীর ইলম শেখানো ছিলো অত্যন্ত কঠিন। এ কারণে এ সময় যে সমস্ত তালিবে ইলম শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে অনুসরণীয় হন; তাঁরা এদিক থেকে তো শত মোবারকবাদের যোগ্য যে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে যতটুকু ইলম তাঁরা শিখেছেন তাই বিরাট কিছু, কিন্তু তাঁদের থেকে বিস্তৃত ও গভীর ইলমের আশা করা অবশ্যই অতিরঞ্জন হবে। যার ফলে অনেক মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে স্থবিরতা ও সংকীর্ণতা সৃষ্টি হয়েছে। ছোট ছোট মাসআলা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। স্বাধীনতা লাভ করার পর বিভিন্ন অঞ্চলের লোক এসব দেশে এসে নিজ নিজ মতাদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করে, তা এ মতবিরোধকে আরো উসকে দেয়। এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে, একদিকে সাধারণ মুসলমানগণ সেভিয়েত ইউনিয়নের প্রচারকৃত মতাদর্শ ও সংস্কৃতি দ্বারা এ পরিমাণ প্রভাবিত যে, দ্বীনের একান্ত মৌলিক ফরয সম্পর্কেও তারা অনবহিত। পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতিতে ডুবে গিয়ে তারা ইসলামী প্রতীক ও নিদর্শনসমূহকেও বিদায় জানিয়েছে। রাস্তায় চলাচলকারী নারীদের অর্ধনগ্ন পোষাকের মধ্যে অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়েও ইসলামের কোন স্বকীয়তা খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে নামাযের দ্বিতীয় জামাত করা, জুমার নামাযের পর ইহতিয়াতুয্ যোহর নামায পড়া এবং সালাফীদের আগমনে 'ইসতিওয়া আলাল আরশ' বা 'আল্লাহ তাআলার আরশে সমাসীন হওয়া'র মতো বিষয়ের প্রতিও মনোযোগ ব্যয় হচ্ছে।

এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে আমার আসা উপলক্ষে ওলামায়ে কেরাম, মসজিদের ইমাম এবং ধর্মীয় নেতাদের উদ্দেশ্যে দু'টি সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমটি ছিলো সকাল নয়টায়। এ সমাবেশে আমি আরবীতে প্রায় দেড় ঘণ্টা বয়ান করি। আরবী বোঝার মতো অনেক লোক যদিও উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বহুসংখ্যক এমন লোকও ছিলেন, যাদের আরবী বুঝতে সমস্যা হচ্ছিলো। এ কারণে 'মাদরাসা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.'-এর উস্তায মাওলানা মাকছাদ সাহেব সাথে সাথে কিরগিজ ভাষায় অনুবাদ করেন। আমার বক্তব্যের মূল বিষয় ছিলো, কিরগিজিস্তানের বর্তমান অবস্থায় দ্বীনী কাজকে কীভাবে আগে বাড়ানো প্রয়োজন এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে ওলামায়ে কেরাম ও ধর্মীয় নেতাদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিৎ। এ বিষয়ে উপস্থিত সুধী মন্ডলীর নিকট আমি আকুলভাবে নিবেদন করি যে, তারা যেন খুঁটিনাটি বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত না হয়ে ইসলামের সর্বসম্মত মৌলিক বিষয়ের দাওয়াত ও শিক্ষাদানের প্রতি

নিজেদের মনোযোগকে কেন্দ্রিভূত করেন। কারণ, এগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ সাধারণ মানুষ অনবহিত ও উদাসীন।

আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ তাওফীকে বয়ানটি অত্যন্ত প্রভাব সৃষ্টি করে। উপস্থিত একজন বলেন যে, আমারা চল্লিশটি প্রশ্ন লিখে এনেছিলাম, তার মধ্যে অনেকগুলোর উত্তর বয়ানে পেয়ে গেছি। অবশিষ্ট প্রশ্নগুলো আপনার নিকট আমাদেরকে করতে হবে। সুতরাং আরো আধা ঘণ্টা সময় প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। অবশিষ্ট প্রশ্নের জন্যে ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে দ্বিতীয় সমাবেশ রাখা হয় ইশার নামাযের পর। সেখানে আরও প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। আলহামদুল্লিাহ! এ সমাবেশের পর উপস্থিত লোকেরা বলেন যে, আমাদের কতক মতবিরোধ তো শেষ হয়ে গেছে। আর যেগুলো অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা সংকল্প করছি যে, সেগুলোকে আমাদের মনোযোগের কেন্দ্র না বানিয়ে দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে দাওয়াত ও তালীমের উপর আমাদের শ্রম ব্যয় করবো।

মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কিরগিজী আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপনকারী তরুণ আলেম। তিনি একাধারে এগারো বছর দারুল উলূমে শিক্ষা লাভ করেন। দু' বছর পূর্বে শিক্ষা সমাপন করে দেশে ফিরে বিশকেকের 'কালমা' মহল্লার মসজিদে পাঠদান আরম্ভ করেন। মাশাআল্লাহ! এখন তা নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আজকের যোহরের নামায ও দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা এ মাদরাসায় করা হয়। কেন্দ্রীয় মসজিদের সমাবেশ থেকে অবসর হলে তিনি আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যান। যোহরের নামাযের তখনও কিছু সময় বাকি ছিলো। এ সুযোগে তিনি বিশকেক শহরটি ঘুরিয়ে দেখান। এটি সুন্দর একটি শহর। সড়কগুলো প্রশস্ত। আধুনিক ডিজাইনের আড়ম্বরপূর্ণ ভবন। সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি। উজ্জ্বল প্রশান্তিময় পরিবেশ। শহরের চতুর্দিকে উঁচু উঁচু পাহাড় ছড়িয়ে আছে। সেগুলোর চূড়ায় এখনো বরফ জমে আছে। পাদদেশ দিয়ে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে। প্রায় এক ঘণ্টা সময় ভ্রমণ করার পর আমরা কালমা মসজিদে পৌঁছি। সেখানে যোহরের নামায আদায় করি। মাদরাসা পরিদর্শন করি। বর্তমানে মাদরাসাটিতে দরসে নিযামীর দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বছর একটি করে শ্রেণী বাড়ানো হচ্ছে। উস্তাযগণ ও ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। আলহামদুলিল্লাহ! এটা দেখে মন আনন্দে ভরে যায় যে, বহু বছর পর এ শহরে ইলমে দ্বীনের প্রদীপ প্রজ্বলিত হওয়ার সূচনা হয়েছে। আল্লাহ তাআলার শোকর যে, পৃথিবীর যেখানেই যাওয়ার সুযোগ হয়, সেখানেই আমাদের দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলেম কিছু হলেও পাই। তাদেরকে যখন দ্বীনের খেদমতে মশগুল থাকতে দেখি, তখন চোখ জুড়িয়ে যায়। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কিরগিজী যখন দারুল

উলূমে লেখাপড়া করতেন, তখন স্বল্পভাষী ও কম মিশুক ছিলেন। একাগ্রতার সাথে তালীমে মশগুল থাকতেন। দেশে ফেরার পূর্বে প্রয়োজনীয় কিতাব সংগ্রহের জন্যে অনেক দিন পর্যন্ত দারুল উলূমেই অবস্থান করেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখানে এসে তিনি অনেক কল্যাণকর কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন।

কিরগিজিস্তানে নিয়োজিত পাকিস্তানের দূত জনাব আলম বুরুহী সাহেব আছরের নামাযের পরে বিকালের নাশতার আয়োজন করেন। সেখানে কিরগিজিস্তানে অবস্থানকারী কতিপয় মান্যগণ্য পাকিস্তানী ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোও উদ্দেশ্য ছিলো। আলম বুরুহী সাহেব পাকিস্তানের দূত হিসাবে বেশ গ্রহণযোগ্য ও সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি পাকিস্তান সরকারের অর্থানুকুল্যে কিরগিজ ভাষার অনুবাদসহ হাজার হাজার কপি কুরআনে কারীম তৈরী করান, এখানকার আলেমদের দ্বারা তা সংশোধন করান এবং বিতরণের ব্যবস্থা করেন। সাধারণত আমাদের দূতাবাসগুলোর ব্যাপারে ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে যে, তারা এমন কর্মতৎপরতা দেখান না, যেমন অন্যান্য দেশের দূতাবাসের পক্ষ থেকে দেখা যায়। কোন জায়গায় যখন আমাদের দূতাবাসের কল্যাণকর কোন কাজ সামনে আসে তখন খুবই আনন্দ পাই। এখানকার লোকেরা বলে যে, আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের দূতাবাস এখানে অধিক তৎপর ও সমাদৃত। বিকালের এ নাশ্‌তায় এমন অনেক পকিস্তানীর সাথে দেখা হয়, যারা এখানে ব্যবসা ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন। আমাদেরকে মাগরিবের নামায পড়তে হবে কেন্দ্রীয় মসজিদে। মাগরিবের নামাযের পর সেখানে আমার আম বয়ানের ঘোষণা হয়েছিলো। আমি যখন সেখানে পৌঁছি, তখন মসজিদের হলকক্ষ লোক দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। এটি ছিলো দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাধারণ মুসলমানদের সমাবেশ। মাগরিব নামাযের পর প্রায় দেড় ঘণ্টা আমার বয়ান হয়। মাওলানা মাকসাদ সাহেব সাথে সাথে কিরগিজ ভাষায় তা তরজমা করেন। একথা স্পষ্ট যে, কিরগিজিস্তানের বর্তমান অবস্থায় সাধারণ মুসলমানদের দ্বীন সংরক্ষণের জন্যে তাবলীগ জামাতের সাথে জড়িত হওয়ার চেয়ে উত্তম কোন পন্থা নেই। একারণে এখানকার জরুরী কিছু বিষয়ের উপর আলোকপাত করা ছাড়া এ বিষয়ের উপরই আমি অধিক জোর দেই যে, তারা যেন তাবলীগ জামাতে তৎপরতার সাথে অংশ নেন। এ কাজকে যেন তারা নিজেদের জন্যে মহান নেয়ামত মনে করে গ্রহণ করেন। ইশা পর্যন্ত বয়ান চলতে থাকে। ইশার নামাযের পর আলেমদের প্রশ্ন-উত্তরের দ্বিতীয় ধারা চালু হয়। যার বিবরণ আমি উপরে তুলে ধরেছি।

পরের দিন ছিলো জুমাবার। সকাল দশটায় 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. মাদরাসা'য় যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিলো। মাদরাসাটি তাবলীগ জামাতের কয়েক ভাই মিলে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাদের মধ্যে আমাদের সফর সঙ্গী ও দাওয়াতদাতা

জাভেদ হাজারবী সাহেব শীর্ষে রয়েছেন। তিনি বার বার এখানে সফর করে মাদরাসার বেশির ভাগ ব্যবস্থাপনা করেন। স্বাধীনতা লাভের পর বিশকেকে এ মাদরাসাটিই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। মাওলানা মাকসাদ সাহেব- যিনি এ সফরে আমার বয়ানসমূহের তরজমা করছিলেন- এ মাদরাসারই উস্তায। এ মাদরাসার বেশির ভাগ উস্তায রায়বেন্ড থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তারা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এখানকার খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মাদরাসায় এখন তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতি বছর একটি করে শ্রেণী বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আলহামদুলিল্লাহ! মাদরাসার ভবন বেশ প্রশস্ত। মাদরাসা এখন আরও জমি পেয়েছে। মাশাআল্লাহ! মাদরাসার শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনা উন্নত দেখতে পাই। এখানে উস্তাযদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বয়ানের সুযোগ হয়। নবজাতক এ মাদরাসার উন্নতি দেখে মন আনন্দে ভরে উঠে।

জুমার নামায পড়তে হবে কেন্দ্রীয় মসজিদে। জুমার নামাযের পূর্বে সেখানে আমার বয়ানের ঘোষণাও হয়েছিলো। সুতরাং জুমার আগে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট বয়ান হয়। মাশাআল্লাহ! মসজিদ নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। তাদের মধ্যে যুবকদের সংখ্যা অনেক দেখে আনন্দিত হই। বিশকেক থেকে প্রায় ৭০ কি.মি. দূরে 'কারাবলতা' (Karabalta) নামে একটি ছোট শহর রয়েছে। পাঁচটার সময় আমরা ঐ শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লাগে। শহরের উপকণ্ঠে 'কালাক' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে এখানে আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। বর্তমানে এখানে আছরের নামায হয় সাড়ে চারটায়। সেই নতুন মসজিদে আমরা আছরের নামায পড়ি। নামাযের পর আমার বয়ান হয়। মাওলানা আব্দুর রহীম এতদঅঞ্চলে তৎপরতার সঙ্গে দাওয়াত ও তালীমের কাজে অংশ নিয়ে থাকেন। তিনিই এ সফরের দাওয়াত করেছিলেন। তিনি বলেন যে, তার চাচা দামুল্লা মুহাম্মাদ সফর সাহেব একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। তিনি এ গ্রামেই বাস করেন। চলাফেরা করতে অক্ষম। তিনি এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো আলেম। পরহেযগার ও বযুর্গ ব্যক্তি। আমরা তাঁর বাড়িতে যাই। বাড়ি তো নয়, ছাপড়া সদৃশ একটি বাসা। দুনিয়ার সমস্ত চাকচিক্য থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে তার মধ্যে তিনি মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন করছেন। তিনি ছিলেন كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل -এর প্রতিচ্ছবি। নূরানী চেহারায় আল্লাহর ভয় ও পরহেযগারীর আলো উদ্ভাসিত ছিলো। আমরা যাওয়ায় তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি ইলম অর্জন করেছেন কীভাবে? তিনি বললেন- সেভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবের পর তাজাকিস্তানে চলে যাই। সেখানে একজন শায়েখের নিকট তাঁর কার্পাশ ক্ষেতে লুকিয়ে

লুকিয়ে মুখতাসারুল বিকায়া ও হিদায়া প্রভৃতি কিতাব পড়ি। পরবর্তীতে নিজেও ছাত্রদেরকে এভাবেই পড়াতে থাকি। বাস্তবিকই এঁদের মতো বুযুর্গ দেখলে অনুমিত হয় যে, এঁরা দ্বীনের হেফাজতের জন্যে কী অসাধারণ কুরবানীই না করেছেন! আমাদের মতো যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা বিনা পরিশ্রমে ঈমানের দৌলত দান করেছেন এবং এ পথে একটি কাঁটাও পায়ে বিদ্ধ হয়নি, তারা ঈমানের সেই মধুরতা কী করে অনুধাবন করতে পারি, যা ঐ সমস্ত বুযুর্গ জান বাজি রেখে অর্জন করেছিলেন। ঐ বুযুর্গের সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের সাক্ষাৎ অন্তরে গভীর রেখাপাত করে।

এখান থেকে ফেরার পথে কারাবলতা শহরে মাগরিব নামাযের সময় হয়ে যায়। আমরা সেখানকার কেন্দ্রীয় মসজিদে যাই। আমাদের সফরসঙ্গী জনাব হফেয ফিরোজ উদ্দীন সাহেব মসজিদ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করে আযান দেন। এখানকার লোকদের মধ্যে এই আদব দেখতে পাই যে, আযান শুরু হলে মসজিদের বাইরে যতো লোক দাঁড়িয়ে ছিলো, সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে পড়ে। আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে। জানতে পারলাম যে, এখানের সাধারণ নিয়ম হলো, আযান শুনে সবাই বসে পড়ে। বসে বসেই আযানের জওয়াব দেয়। দামুল্লা আব্দুল খলীল সাহেব এ মসজিদের ইমাম। ('দামুল্লা' এখানকার বড়ো আলেমদের উপাধী।) তিনি এ এলাকার মুফতীও। বিশকেকে ওলামায়ে কেরামের সমাবেশে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে, দারুল উলূম করাচীতে আমি গিয়েছিলাম এবং আপনার ফাতাওয়ার কিতাবও সাথে এনেছিলাম। তিনি আল্লামা যারনুজী রহ. লিখিত 'তা'লীমুল মুতাআল্লিম' এর কিরগিজ ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

মাগরিবের পরে আমরা বিশকেক ফিরে আসি। এবার আমাদের মেজবানগণ আমাদের অবস্থানস্থল পরিবর্তন করে শহরের উপকণ্ঠের বিনোদনপূর্ণ একটি স্থানের এক বাঙলোতে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাঙলোটি একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। আমরা এখানেই রাত কাটাই। এখানকার সৌন্দর্য তো রাতের অন্ধকারে আমরা বুঝতে পারিনি, কিন্তু ফজরের নামাযের পর যখন প্রাতঃভ্রমণে বের হই, তখন অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য আমাদের সামনে বিরাজ করছিলো। আকাশচুম্বী পাহাড়ের পাদদেশ দিয়ে একটি স্রোতস্বিনী পাহাড়ের সঙ্গে আছড়ে প্রবাহিত হচ্ছিলো। তীরে রয়েছে সুদূরবিস্তৃত ফলের বাগান। বাগানের গাছগুলি আপেল, নাশপাতি, আলুচু দ্বারা ছিলো পরিপূর্ণ। মূল নদীর ছোট ছোট কয়েকটি শাখা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিলো। এগুলোর পানি ছিলো অত্যন্ত ঠান্ডা, মিষ্টি, স্বচ্ছ ও ভাবোদ্দীপক। কিরগিজিস্তানের ৮০%-এর চেয়েও অধিক এলাকা পাহাড়ে পরিপূর্ণ। পাহাড়গুলো দেশটির সৌন্দর্য দ্বিগুন করেছে।

এখানকার সমস্ত ফল অত্যন্ত মিষ্টি ও সুস্বাদু। এখানে প্রত্যেক দস্তরখানে যে 'গরমা' দেখতে পাই, তা অত্যন্ত রসালো ও সুমিষ্ট ছিলো। এমন 'গরমা' আমি অন্য কোথাও দেখিনি। এ ছাড়া তরমুজ, নাশপাতি, আনজির ও সাফতালুও অসাধারণ সুস্বাদু ও রসালো। প্রত্যেক খাবার এখানে ফল দ্বারা শুরু করার প্রচলন রয়েছে। বাদাম, পেস্তা ও কাজু এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এবং সবই উন্নত জাতের।

আওশ শহরে

আজ শনিবার। পূর্ব প্রোগ্রাম মতো আমাদেরকে কিরগিজিস্তানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর 'আওশ' যেতে হবে। বিশকেক থেকে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ শহর। নাশতার পর আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। প্রায় দশটার সময় কিরগিজ এয়ারওয়েজের ফকার বিমান আমাদের নিয়ে রওয়ানা হয়। পথের আকাশচুম্বী পাহাড়চূড়াসমূহ ছুঁই-ছুঁই করে এক ঘণ্টা ওড়ার পর এগারোটার দিকে আমরা আওশ বিমানবন্দরে অবতরণ করি।

আওশ কিরগিজিস্তানের অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক শহর। এখানে বড়ো বড়ো আলেম-ফাযেলের জন্ম হয়েছে। আল্লামা হামভী রহ. 'মু'জামুল বুলদান' (১/২৮০)-এ এ শহর সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখেন যে, এটি ফারগানার নিকটে অবস্থিত। অত্যন্ত উর্বর। অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের সমন্ধ এ শহরের সাথে রয়েছে। এর ১০ কিলোমিটার দূর থেকে উজবেকিস্তানের সীমানা আরম্ভ হয়। আন্দোজান ও ফারগানা (যা 'হিদায়া'র গ্রন্থকারের বাসস্থান ছিলো) এর নিকটবর্তী শহর। আওশ থেকে প্রায় ৭০ মাইল দূরে কিরগিজিস্তানের আওযোজান্দ শহর অবস্থিত। যা আল্লামা কাজী খান রহ. (ফাতাওয়ায়ে কাজী খানের লেখক)-এর মাতৃভূমি। যেখানে শামসুল আয়িম্মা সারখসী রহ. বন্দীখানার মধ্যে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'মাবসূত' কিতাব সংকলন করেন।

আওশ বিমানবন্দরে সে অঞ্চলের কাযী সীন সাহেব এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ স্বাগত জানান। শহরের মসজিদের ইমাম মাওলানা ওবায়দুল্লাহ- যিনি আরবীও বলতে পারেন- আমাদেরকে তাঁর গাড়িতে করে নিয়ে যান। রাস্তায় একটি পাহাড়ের নিকট গাড়ি থামিয়ে তিনি বলেন যে, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক পাহাড়। একে 'সোলায়মান আ.-এর পাহাড়' বলা হয়। এ এলাকায় একথা প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন এক সময় হযরত সোলায়মান আ. এ পাহাড়ে অবস্থান করেছিলেন। পাহাড়ে প্রাচীন একটি ঘর রয়েছে। বলা হয় যে, এটি বাদশাহ্ জহির উদ্দীন বাবরের ঘর । হিন্দুস্তান আক্রমণ করার পূর্বে তিনি এটি বানিয়েছিলেন। পাহাড়ের সুড়ঙ্গ সদৃশ একটি গুহায় সরকার একটি জাদুঘর তৈরী করেছে। সেখানে শহরের তিন হাজার বছরের নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে।

যোহরের নামায আমরা বরাত মসজিদে আদায় করি। সেখানে যোহরের নামাযের পর আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। প্রায় এক ঘণ্টা সময় বয়ান হয়। এর মধ্যে সে দেশের মুফতী মুরাদ আলী জামানুফ অনেক দূর থেকে সফর করে এসে পৌঁছেন। তিনি বলেন যে, শুধুমাত্র দেখা করার উদ্দেশ্যে তাজিকিস্তানের সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে এসেছি। আমাকে এখনি ফিরে যেতে হবে।

এ এলাকার সবচেয়ে বড়ো আলেম দামুল্লা শাইখ আব্দুস সাত্তার সাহেব এখানে তাশরীফ এনেছিলেন। বর্তমানে তাঁকে দেশের সবচেয়ে বড়ো আলেম মনে করা হয়। সেভিয়েত ইউনিয়নের শাসনামলে তিনি তাজিকিস্তান গিয়ে সেখানকার শাইখ রশীদের নিকট লুকিয়ে লুকিয়ে ইলম অর্জন করেন। তিনি বলেন- শাইখ রশীদের বাড়ির একটি কক্ষে রাত তিনটার সময় আমাদের তা'লীম আরম্ভ হতো এবং ফজরের আগে আগে তা শেষ হয়ে যেতো। ফলে কেউ বুঝতে পারতো না যে, এখানে দ্বীনের তালীম দেয়া হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, এমন পরিবেশে বিস্তারিত তালীম দেওয়া সম্ভব ছিলো না। এ কারণে 'হিদায়া'র পর হদীসশাস্ত্রের শুধু মিশকাত শরীফ পড়ানো হতো। শাইখ আব্দুস সাত্তার সাহেবও মিশকাত শরীফ পর্যন্ত শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি সরাসরি 'সিহাহ সিত্তা' পড়তে পারেননি। পরবর্তীতে তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক এ পদ্ধতিরই একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এ শহরের সমস্ত ইমাম ও আলেম তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাগরিদ। কিরগিজিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর আওশ শহর থেকে কিছু দূরে প্রকাশ্যে নিয়মতান্ত্রিকভাবে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে মিশকাত শরীফ পর্যন্ত তালীম দেওয়া হয়। সত্তরজন ছাত্র শিক্ষাধীন রয়েছে। আমাদের সফরসঙ্গী জাভেদ হাজারবী সাহেব যখন তাঁকে বললেন যে, এখন তো দাওরায়ে হাদীসের শিক্ষাদানও হতে পারে। তখন তিনি উত্তর দিলেন যে, আমি নিজে 'সিহাহ সিত্তাহ্' পড়িনি তাই আমি কী করে পড়াবো? তখন জাভেদ সাহেব বললেন, আমরা পকিস্তানের মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপনকারী কিছু আলেমকে এখানে পাঠানোর চেষ্টা করবো, যারা কমপক্ষে কিছুদিন এখানে হাদীসের দরসদানের খেদমত আঞ্জাম দিবেন।

সন্ধ্যা পর্যন্ত এলাকার আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাত ও পরামর্শ চলতে থাকে। মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা বিমানযোগে বিশকেকের উদ্দেশ্যে ফিরতি পথ ধরি। বিশকেকে অবতরণ করে নিকটবর্তী একটি মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করি। আমরা প্রথমে যেভাবে প্রোগ্রাম তৈরী করেছিলাম, তাতে আজ কিরগিজিস্তানের সফর শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো। তারপর দুইদিন কাজাখস্তানে কাটানোর প্রোগ্রাম ছিলো। কাজাখস্তানের রাজধানী 'আলমাতে' এখান থেকে গড়িতে দেড় ঘণ্টার পথ। সেখানকার সহকারী মুফতী

শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন ইতিপূর্বে চেচনিয়াতে ছিলেন। সেখান থেকে এসে শিক্ষা সমাপন করার জন্যে দীর্ঘদিন আমাদের দারুল উলূমে অবস্থান করেন। তিনি আমার কিরগিজিস্তানের সফরের সংবাদ শুনে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করেন, কমপক্ষে দুইদিনের জন্য হলেও যেন আমি কাজাখস্তান ঘুরে আসি। এর ভিত্তিতে আমি পাকিস্তান ফেরার জন্য 'আলমাতে' থেকে বুকিংও করিয়েছিলাম। কিন্তু একদিন পুর্বে জানতে পারি যে, কাজাখস্তানের ভিসা পেতে দেরি হচ্ছে। এত দ্রুত ভিসা পাওয়া সম্ভব হবে না। এ কারণে আমাদের কাজাখস্তানের সফর স্থগিত হয়। তখন শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইন আমার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য নিজেই সে রাতে বিশকেক চলে আসেন। অপরদিকে মুহাম্মাদ বেলাল সাহেব (যিনি একজন পাকিস্তানী এবং কিরগিজিস্তানের একটি এয়ার লাইনের মালিক) ঐ রাতে বিশকেকের শহরতলীর একটি বিনোদনকেন্দ্রের একটি রেষ্টুরেন্টে নৈশ ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমাদেরকে বিমানবন্দর থেকে সেখানে যেতে হবে। শাইখ মুহাম্মাদ হুসাইনকেও সেখানেই দাওয়াত দেওয়া হয়। এ জায়গার নাম 'এঙ্গিতাশ'। দুই পাহাড়ের মাঝে প্রবাহিত একটি নদীর তীরে অবস্থিত এটি। সুন্দর এ পরিবেশে আমরা ইশার নামায আদায় করি। ইতিমধ্যে শাইখ মুহাম্মাদ হোসাইন এসে পৌঁছেন। তিনি কাজাখস্তানে তার তলীমী ও দাওয়াতী তৎপরতার বিবরণ শোনান। সেখানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন। স্থানীয় ভাষায় দ্বীনীবিষয় সম্বলিত বই-পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এ সমস্ত বিবরণ শুনে আনন্দিত হই। অঙ্গারে সেঁকে 'মুসাললাম' দুম্বা তৈরী করা এ রেষ্টুরেন্টের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তা দ্বারাই মেহমানগণের আপ্যায়ন করা হয়। মনোমুগ্ধকর এ মজলিস অনেক রাতে শেষ হয়।

তার পরের দুই দিন কোন প্রোগ্রাম ছিলো না। সফরসঙ্গীরা প্রস্তাব করেন যে, বিশকেক থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ দূরে 'অশোককুল' নামে একটি ঝিল রয়েছে। যা দুনিয়ার হাতেগোনা প্রসিদ্ধ কয়েকটি ঝিলের মধ্যে পরিগণিত হয়। আগামীদিন সেখানে সফর করা হোক। এতো দূরের সফর করতে আমি দ্বিধাদ্বন্দ্ব করছিলাম। কিন্তু সঙ্গীদের আগ্রহ দেখে আমিও রাজি হয়ে যাই। পরের দিন (২৭ আগষ্ট) সকালে বিশকেকে একটি বিবাহ ছিলো। আমি আমার অবস্থানস্থলে কিছু কাজ করতে চাচ্ছিলাম, এ কারণে আমার সফর সঙ্গী জনাব হাফেয ফিরোয উদ্দীন সাহেবের নিকট বিবাহ পড়ানোর জন্যে আবেদন করি। তিনি সেখানে চলে যান। আর আমি আমার অবস্থান স্থলে থেকে যাই। কিন্তু এ সময় 'আওশে'র এক দল আলেম আমার নিকট আসেন। তারা অনেকগুলো মাসআলা সম্পর্কে কথা বলেন। দুপুরের পর আমরা অশোককুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পথে 'বালকচে' শহরের একটি মসজিদে আছরের নামায আদায় করি। মাগরিবের সময় অশোককুল পৌঁছি। ঝিলের তীরের একটি হোটেলে রাত

কাটাই। ফজরের পর ঝিল ঘুরে দেখি। ঝিলটি তিনশ' কিলোমিটার লম্বা এবং আশি কিলোমিটার চওড়া। এর পানি সাধারণ ঝিলসমূহের মতো মিষ্টিও নয়, আবার সাগরের পানির মতো তিতাও নয়। হালকা নোনা পানি। বলা হয় যে, এখানে গোসল করা স্বাস্থ্যের জন্যে অত্যন্ত উপকারী। অনেক সাথী তাতে গোসল করার স্বাদ উপভোগ করেন। ঝিলসংলগ্ন পাহাড়সারি তার সৌন্দর্যকে অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে। নাশতার পর আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি। বিশকেক ফিরে এসে যোহরের নামায আদায় করি। সেদিনই আছরের পর উজবেকিস্তান এয়ার লাইন্‌সযোগে আমরা প্রথমে তাশখন্দ পৌঁছি। সেখানে তিন ঘণ্টা অপেক্ষার পর লাহোরের উদ্দেশ্যে অন্য বিমান পাই। রাত সাড়ে বারোটায় লাহোর পৌঁছি। রাত আড়াইটায় এয়ার বিলিভ-এর বিমানে রওয়ানা হয়ে ফজরের নিকটবর্তী সময়ে করাচী পৌঁছি।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আলবেনিয়ায় কয়েকদিন

(শাবান, ১৪২৭ হিজরী, সেপ্টেম্বর, ২০০৬ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى آلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিরগিজিস্তান সফরের পর শাবান মাসে কয়েকদিন আলবেনিয়ায় সফর করার সুযোগ হয়। স্বচক্ষে দেশটি দেখার পর সেখানকার অবস্থা আমার কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় মনে হয়েছে। তার মধ্যে আক্ষেপ, অনুতাপ ও শিক্ষার উপকরণ যেমন রয়েছে, তেমনি উপকরণ রয়েছে আশাব্যঞ্জক সংকল্পেরও। এ সফরের বৃত্তান্ত পেশ করার পূর্বে আলবেনিয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তার সামন্য ইতিহাস তুলে ধরা জরুরী মনে করছি। আলবেনিয়া পূর্ব ইউরোপের সে সব উপদ্বীপের একটি অংশ, যেগুলোকে 'বলকান' বলা হয়। তুর্কী ভাষায় পাহাড়কে বলা হয় 'বলকান'। এ পুরো অঞ্চলটি যেহেতু উঁচু উঁচু পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত, এ কারণে ওসমানী খেলাফতের শাসনামলে এর নাম রাখা হয় 'বলকান'। পুরো বলকান অঞ্চল কয়েকটি দেশের সমন্বয়ে গঠিত। তার মধ্যে আলবেনিয়া ছাড়া যুগোশ্লাভিয়া, ইউনান, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া অন্তর্ভুক্ত। এখন যুগোশ্লাভিয়াও কয়েকটি দেশে বিভক্ত হয়েছে। মাকদুনিয়া, কসোভো, বসনিয়া ইত্যাদি এখন স্বাধীন দেশে পরিণত হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনামলে এগুলো ছিলো যুগোশ্লাভিয়ার অংশ।

আলবেনিয়া বলকানের সর্বকনিষ্ঠ দেশ। যা ভূমধ্য সাগরের একটি শাখা এড্রিয়াটিক (Adriatic) উপসাগরের তীরে অবস্থিত। ২৮৭৪৮ বর্গ কিলোমিটারব্যাপী বিস্তৃত। এখানের অধিবাসীদেরকে প্রাচীন যুগ থেকে 'ইলিয়ারিয়ান' (Illyrian) বলা হতো। এ অঞ্চলের প্রাচীন নামও ছিলো

'ইলিয়ারিয়া'। প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনুমান করেছেন যে, এ জাতির ইতিহাস খ্রিস্টপূর্ব এক হাজার বছর পর্যন্ত পৌঁছে। শুরুতে এখানে বিভিন্ন বাদশাহর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। প্রায় ১৬৮ খৃস্টপূর্বে রোম সম্রাট এটি জয় করে তাদের একটি প্রদেশ বানিয়েছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এখানে রোম সম্রাটদের আধিপত্য বহাল থাকে। সাম্প্রতিককালীন গবেষণা দ্বারা জানা যায় যে, ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ইসলাম তার ইতিহাসের প্রথম শতকগুলোতেই এ অঞ্চলে পৌঁছেছিলো। এখানে বহু সংখ্যক মুসলমানের বসবাসও ছিলো। চতুর্দশ খ্রিস্টশতাব্দীতে তুরস্কের ওসমানী খেলাফত বলকানের অন্যান্য দেশের মতো এ দেশটিকেও জয় করে। তারপর এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে, তুর্কীরা তাদের বিজিত অঞ্চলসমূহ থেকে কিছু বালকদের তালীম-তারবিয়াত দানের জন্যে ইস্তাম্বুল নিয়ে আসতো। তাদেরকে সেখানে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়া ছাড়া উন্নত মানের সামরিক প্রশিক্ষণও দেয়া হতো। সেকেন্দার বেগ ছিলো এমনই একটি বালক। মেধা ও বীরত্বে সে ছিলো অদ্বিতীয়। সামরিক প্রশিক্ষণে সজ্জিত হয়ে যখন সে বড়ো হয়ে ওঠে এবং জানতে পারে যে, সে মূলত আলবেনিয়ার অধিবাসী, তখন কোন এক অজুহাতে অনুমতি নিয়ে আলবেনিয়ায় চলে যায়। সেখানকার লোকদেরকে সুসংহত করে ১৪৪৩ ঈসায়ীতে তুর্কী খেলাফতের বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করে। আলবেনিয়াকে তুর্কী খেলাফত থেকে মুক্ত করে সে নিজে তার শাসক হয়। এভাবে আলবেনিয়া প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত ওসমানী খেলাফত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। কিন্তু সেকেন্দার বেগের মৃত্যুর পর তুর্কীরা পুনরায় আলবেনিয়াকে দখল করে। এভাবে পুনরায় তা ওসমানী খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

উনবিংশ খ্রিস্ট শতাব্দীতে পশ্চিমা শক্তিবলয় ওসমানী খেলাফতকে খন্ড খন্ড করার ষড়যন্ত্র করে। তার ফলে আলবেনিয়ায় মুক্তি সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং তা ওসমানী খেলাফত থেকে পৃথক হয়ে যায়। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় বড়ো বড়ো পশ্চিমা শক্তি দুর্বল দেশগুলোকে বানরের রুটি ভাগ করার ন্যায় ভাগ করে নেয়। (যার বিস্তারিত ঘটনা হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.-এর লিখিত 'নকশে হায়াত'-এ রয়েছে।) তখন এ দেশ ইতালীর নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মুসোলিনী এর উপর আক্রমণ করে। তখন অভ্যান্তরীণ প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ হয়। অবশেষে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়ারই একজন নেতা আনোয়ার হোজা দেশের নেতৃত্ব সামাল দেয়। আলবেনীয় ভাষায় আলেম বা ধর্মীয় নেতাকে 'হোজা' বলা হয়। সে ছিলো একজন ধর্মীয় নেতার ছেলে। তবে সে নিজে ফ্রান্স থেকে শিক্ষা লাভ করে, ফলে কট্টর কমিউনিস্টে পরিণত হয়। আলবেনিয়াকে সে এমন এক কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত করে, যার জুলুম-অত্যাচার অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রকেও হার মানায়।

আনোয়ার হোজা আলবেনিয়াকে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ধর্মহীন রাষ্ট্র ঘোষণা দেয় এবং সে দাবি করে যে, একমাত্র আলবেনিয়াতেই কমিউনিজমকে আসল ও অবিকৃত রূপে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।

স্মর্তব্য যে, পুরো ইউরোপে আলবেনিয়াই একমাত্র দেশ, যেখানে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। (১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের আদমশুমারী অনুপাতে আলবেনিয়ার মোট অধিবাসী ছিলো ৩২৫৫৮৯১ জন। তার মধ্যে ২৫০৬৩৮১ জন ছিলো মুসলমান। তাই দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭% ছিলো মুসলমান।) কিন্তু আনোয়ার হোজার সরকার চরম জুলুম-অত্যাচারের মাধ্যমে ইসলামের একেকটি চিহ্নকে ধ্বংস করতে কোনরূপ ত্রুটি করেনি। সকল মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়। অনেক মসজিদকে শহীদ করে দেয়া হয়। কতক মসজিদকে যাদুঘর, কতককে সিনেমা ঘর, আর কতককে টয়লেটে পরিণত করা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ করা হয়। দ্বীনী শা'আয়ের বা ধর্মীয় প্রতীক ও নিদর্শনসমূহের উপর আমল করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। এমন ঘটনাও ঘটেছে যে, কারো সম্পর্কে রোযা রাখার সংবাদ পেয়ে তাকে জোর করে মদ পান করিয়ে বা শুয়োরের গোশত খাইয়ে রোযা ভাঙতে বাধ্য করা হয়েছে। সে সময় যারা লুকিয়ে রোযা রাখতো তারা অন্ধকারে সাহরী খেতো। কারণ ঘরে আলো জ্বলতে দেখলে পুলিশ রোযা রাখার অপরাধে তাদেরকে ধরে নিয়ে যেতো। এমন এমন লোক তৈয়ার করা হয়, যারা ইমামের বেশ ধরে এসে মানুষকে বলতো যে, দ্বীন সম্পর্কে আমরা তোমাদেরকে এতো দিন যা বলেছি, তা ধোঁকা দেয়ার জন্যে বলেছি। আসলে মৃত্যুর পর আর কোন জীবন নেই। শুয়োর ও শরাব হারাম নয়। তোমরা তোমাদের খুশি মতো যেভাবে ইচ্ছা জীবন যাপন করতে পারো।

অপরদিকে আলবেনিয়ার লোকদেরকে বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত রাখার জন্যে সারা পৃথিবী থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এখান থেকেও কেউ বাইরে যেতে পারতো না এবং বাইরেরও কেউ এখানে আসতে পারতো না। এমনকি আভ্যন্তরীণ রেডিও শুনতেও নিষেধাজ্ঞা ছিলো। দেশের বাইরে স্বাধীনভাবে পত্রযোগাযোগও ছিলো অসম্ভব।

আলবেনিয়ায় এমনিতেও আলেমের সংখ্যা ছিলো কম। যারাও বা ছিলো তাদেরকে হয় শহীদ করে দেয়া হয়, না হয় স্থায়ীভাবে জেলখানায় বন্দী করে রাখা হয়। সুতরাং এ দেশের উপর দিয়ে প্রায় চল্লিশটি বছর এমনভাবে অতিবাহিত হয় যে, এখানকার মুসলমানদের না দ্বীনের উপর আমল করার কোন সুযোগ ছিলো, না দ্বীনের বিষয়ে ইলম অর্জন করার কোন উপায় ছিলো।

পৈশাচিক জুলুম-অত্যাচারের জঘণ্য এ যুগ ১৯৯০ ঈসায়ীতে এসে শেষ হয়। চল্লিশ বছরের অধিক সময়ে এমন এক প্রজন্ম এখানে বেড়ে ওঠে, যারা

বংশীয়ভাবে তো মুসলমান ছিলো, কিন্তু দ্বীনের বুনিয়াদি বিষয়েও তাদের কোন জ্ঞান ছিলো না। ফলে ইসলামের নিদর্শন ও প্রতীকসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পদে পদে নানা রকমের বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়ে যায়। যে দেশে এক সময় দুই হাজার মসজিদ ছিলো, এখন সেখানে অল্প কয়টি মসজিদ ছাড়া অবশিষ্ট সবগুলো মসজিদ কমিউনিষ্ট বর্বরতার শিকার হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। যেগুলো অবশিষ্ট ছিলো, তারাও এমন জরাজীর্ণ অবস্থায় যে, সেগুলো ব্যবহারোপযোগী ছিলো না। মাদরাসা থাকার তো প্রশ্নই ছিলো না, বরং দ্বীনের কোন কথা বলে দেয়ার মতো লোকও ছিলো বিরল। কমিউনিস্ট বন্দীখানা থেকে মুক্তি পেতেই মানুষ পশ্চিমা বিশ্বের জীবন প্রণালী অবলম্বন করতে আরম্ভ করে। অশ্লীলতা ও নগ্নতার সয়লাব বয়ে যায়। অপরদিকে খ্রিস্টান মিশনারীরা এ অঞ্চলকে নিজেদের শিকারের জন্যে অভয়ারণ্য বানিয়ে নেয়। মানুষের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সেখানে তাদের ধর্ম প্রচার আরম্ভ করে দেয়।

এমতাবস্থায় সেখানে মুসলিম বিশ্বের তাবলীগী ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ভূমিকা পালন করা ছিলো ভীষণ প্রয়োজন। কিন্তু মুসলিম বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন এ ভূখন্ড একদিকে মুসলিম বিশ্বের মনোযোগ থেকে হয় বঞ্চিত, অপরদিকে কমিউনিস্ট পরে যে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তারা জনগণকে মোটের উপর ধর্মীয় স্বাধীনতা দিলেও ইসলামী দলগুলো এক সময় তাদের ক্ষমতার জন্যে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে এ আশংকায় তারা সব সময় তটস্থ থাকে। এ কারণে ইসলামী তৎপরতার ব্যাপারে আলবেনীয় সরকার সব সময় সংকীর্ণতার পরিচয় দিতে থাকে। আমেরিকার ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনায় তাদের এ সংকীর্ণতা আরো বৃদ্ধি পায়।

এ প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বৃটেনের কিছু আলেম এবং মুসলমান যুবকদের একটি সংগঠন 'মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউট' ১৯৯৩ ঈসায়ীতে আলবেনিয়ায় তাদের তালীম, তাবলীগ ও সামাজিক তৎপরতা আরম্ভ করে। তারাই আলবেনিয়ার প্রধান মুফতী শাইখ সবরী কোচীকে বৃটেনে আসার দাওয়াত দেয়। তিনি দশ দিনের সফরে বৃটিশ মুসলমানদেরকে আলবেনিয়ার দুরাবস্থা সম্পর্কে অবহিত করেন। মুফতী শাইখ সবরী কোচী রহ. ছিলেন একজন বর্ষীয়ান আলেম। যিনি কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামী ইলম শিক্ষা করে আলবেনিয়ার শেকুদারা শহরে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছিলেন। কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তিনি তাঁর খেদমত অব্যাহত রাখেন। এর শাস্তি হিসেবে তাঁকে ২৩ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়। তিনি বিশ বছর কারাগারে বন্দী জীবন অতিবাহিত করেন। তারপর কারাজীবন থেকে মুক্তি লাভ করেন ঠিকই, কিন্তু বার্ধক্য সত্ত্বেও তাঁকে কঠিন কায়িক পরিশ্রমের কাজ করতে বাধ্য করা হয়। ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান

ঘটে। তখন তিনি কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শেকুদারার প্রাচীন মসজিদ 'পলম্বাট' উদ্বোধন করেন।

শাইখ সবরীর বৃটেন সফরের পর 'মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনস্টিটিউট' (MWI) আলবেনিয়াতে নিজেদের তৎপরতা আরো বেগবান করে। আলহামদুলিল্লাহ! এখন তারা অত্যন্ত জোরালোভাবে সেখানে কাজ করে যাচ্ছে। সংগঠনের প্রধান মাওলানা হানীফ সাহেব বৃটেনের দারুল উলূম বারী থেকে শিক্ষাসমাপন করেছেন। তিনিই আমাকে বৃটেন থেকে পত্র লিখে তাঁর সঙ্গে আলবেনিয়ায় সফর করার জন্যে দাওয়াত করেন। তাঁর মতে এ সফরের উদ্দেশ্য ছিলো, আলবেনিয়ার অবস্থা স্বচক্ষে দেখে আমি প্রথমত তাঁর সংগঠনকে পরামর্শ দেবো যে, তারা সেখানে কীভাবে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে বাইরের মুসলমানদেরকে অবহিত করে তাদেরকে এখানকার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। তৃতীয়ত, তাঁর ধারণা ছিলো যে, সেখানকার প্রভাবশালী লোকদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলে সেখানে কাজ করার পরিবেশ অনুকূল হবে। আর পাশাপাশি কিছু ইসলাহী বয়ানও হবে। সুতরাং ৮ শাবান ১৪২৭ হিজরী, মোতাবেক ৪ঠা ডিসেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে আমি লন্ডনের গেটওয়াক বিমানবন্দর থেকে মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ সাহেব ও মাওলানা শফীক আব্দুর রহমানের সঙ্গে বিকাল পৌনে চারটায় রওয়ানা হয়ে রাত পৌনে আটটায় আলবেনিয়ার রাজধানী 'তিরানা' বিমানবন্দরে অবতরণ করি। তিন দিনের অবস্থানকালে তিরানা, কারভিয়া, স্কোদরা, দাররুস, কোয়ায়া, বেলিশ, আলবিসান, বোভগ্রাদিস ও কোরচে ভ্রমণ করি।

তিরানা (Tirana)

তিরানা বর্তমানে আলবেনিয়ার রাজধানী। এখানের বিমানবন্দরে অবতরণ করেই আমরা শহরের উপকণ্ঠের লেকনাস (Lecnas) মহল্লার আলবাকের মসজিদে গিয়ে ইশার নামায আদায় করি। এটি এ শহরের তাবলীগ জামাতের মারকায মসজিদ। পৃথিবীর যেখানেই যাওয়ার সুযোগ হয়, সেখানেই মাশাআল্লাহ তাবলীগ জামাতের কাজকে উজ্জ্বল ভূমিকায় দেখতে পাই। তার উপকারিতা সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। আলহামদুলিল্লাহ! আলবেনিয়াতেও তাবলীগ জামাতের কাজ হচ্ছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অন্যান্য জায়গার তুলনায় এখানে তাবলীগ জামাতের তৎপরতা এখনো সীমিত এবং দুর্বল। সে সব কারণ দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা যখন আলবাকের মসজিদে যাই, তখন সেখানে তাবলীগ জামাতের কিছু ভাই সমবেত ছিলেন। ইশার নামাযের পর আমি সেখানে উর্দুতে বয়ান করি। জামাতের তৎপর সাথী মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাহেব আলবেনিয়ার অধিবাসী। তিনি রাইবেন্ডের মাদরাসা থেকে

শিক্ষা অর্জন করেছেন। সাবলীলভাবে উর্দু বলে থাকেন। মাশাআল্লাহ! অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ আলেম তিনি। এখানে এবং পরবর্তীতে আমার পুরো সফরে তিনিই দোভাষীর দায়িত্ব পালন করেন। আলবেনীয় ভাষায় দ্বীনী বই-পুস্তকের অভাব রয়ছে। তাই আমি তাকে দ্বীনের মৌলিক বিষয়সম্বলিত কিতাবসমূহের আলবেনীয় ভাষায় অনুবাদ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। সেগুলো প্রকাশ করার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি এর জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আমার প্রস্তাব মতো এ কাজের ধারার সূচনা 'তালীমুল ইসলামে'র তরজমার মাধ্যমে করা হচ্ছে।

কমিউনিজম থেকে মুক্তি লাভের পর শাইখ সবরী কোচী রহ.- যাঁর আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে- 'আলমাশীখাতুল ইসলামিয়্যাহ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেন। দেশে ইসলামের পুনর্জীবনের খেদমত আঞ্জাম দেয়া এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রতিষ্ঠানটিকে মুসলমানদের প্রতিনিধি মনে করা হয়। তুলনামূলক বড়ো পরিসরে দ্বীনী খেদমত আঞ্জাম দেয়ার ক্ষেত্রে সারা দেশে এই একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর প্রধান অফিস এখন তিরানাতে। আগামী দিন সকালে এ প্রতিষ্ঠানের লোকদের সঙ্গে দেখা করার প্রোগ্রাম ছিলো। আমি আমার সাথীদের সহ সেখানে যাই। তিরানার মুফতী শাবান সালীহু সাহেব অত্যন্ত উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। তিনি বলেন যে, কমিউনিজম আমলের পূর্বে 'আলমাশীখাতুল ইসলামিয়্যাহ' আলবেনীয় ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি তৎপর প্রতিষ্ঠান ছিলো। কমিউনিস্ট শাসনামলে তা বন্ধ করে দেয়া হয়। ১৯৯১ ঈসায়ীতে শাইখ সবরী কোচী রহ.-এর পুনঃসংস্কার করেন। এর তত্ত্বাবধানে দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কয়েকটি মাদরাসা খোলা হয়েছে। সেগুলোতে এখন ১৯০০ ছাত্র-ছাত্রী পড়াশোনা করছে। 'মাশীখা'র নিকট পনেরো হাজার হেক্টর ওয়াক্‌ফকৃত জমি রয়েছে। সেগুলোকে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। তার মধ্যে একটি ইসলামী ইউনিভার্সিটি ও একটি রেডিও স্টেশন প্রতিষ্ঠা এবং একটি ইসলামী পত্রিকা চালু করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

মুফতী শাবান সালীহু আলবেনিয়ার ইতিহাসবিদ আলী পাশা সাহেবকেও দাওয়াত করেছিলেন। তিনি আমাদের সামনে আলবেনিয়ার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনিই গবেষণা করে উদঘাটন করেন যে, ইসলাম ওসমানী খেলাফতের অনেক পূর্বেই আলবেনিয়াতে প্রবেশ করেছিলো। তাঁর মতে ওসমানী খেলাফত এ অঞ্চল জয় করার পর ইসলামের তালীম ও তাবলীগের জন্যে দীর্ঘস্থায়ী কোন কাজ এখানে করেনি। অপরদিকে এমন কিছু রাজনৈতিক পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করে, যে কারণে আলবেনিয়ার অধিবাসীদের চোখে তারা

সমাদৃত সরকার ছিলো না। এ কারণেই পরবর্তীতে এখানে প্রথমে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার এবং পরে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুফতী শাবান সালীহুর সাথে সাক্ষাৎকালে এ ব্যাপারেও ঐক্যমত হয় যে, 'আলবেনিয়ান ইসলামিক কমিউনিটি' ও 'মুসলিম ওয়েলফেয়ার' দেশে ধর্মীয় ও জনসেবামূলক কর্মকান্ডে পরস্পরকে সহযোগিতা করবে।

তিরানা শহরের প্রাণকেন্দ্রে সবচেয়ে উন্নত এলাকায় প্রাচীন একটি মসজিদ রয়েছে। একে মারকাযী মসজিদ বলা হয়। কমিউনিস্ট শাসনামলে এটি শহরের একমাত্র মসজিদ ছিলো, যাকে সুন্দর নির্মাণশৈলীর কারণে শহীদ করা হয়নি। তার মধ্যে নামায পড়া বন্ধ করে দিয়ে একটি যাদুঘরে পরিণত করা হয়। মুফতী শাবান সালীহু বলেন, স্বাধীনতার পর ১৯৯১ ঈসায়ীতে মসজিদটি পুনরায় উদ্বোধন করা হয়। সে সময় মসজিদে বড়ো একটি সমাবেশ হয়। মুফতী শাবান কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে যখন এর উদ্বোধন করেন, তখন উপস্থিত লোকদের অনেকের চোখ থেকেই অশ্রু ঝরছিলো। একদিন আমরা এ মসজিদে যোহরের নামায আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ! অনেক নামাযীই সেখানে দেখতে পাই। তাদের মধ্যে আলবেনীয় বংশোদ্ভূত লোকও ছিলো। তবে বহু সংখ্যক অন্যান্য দেশের মুসলমানও ছিলো। জীবিকার সন্ধানে তারা এখানে বসবাস করেন।

মেযবানগণ শহরের সে জায়গাটিও দেখান, যেখানে কমিউনিস্ট শাসনামলে আনোয়ার হোজার প্রতিকৃতি বসানো ছিলো। স্বাধীনতা লাভের পর জনগণ তা উপড়ে ফেলে।

স্কোদরা (Shkodra)

আলবেনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম গুরুত্বপূর্ণ শহর স্কোদরা। এককালে শহরটি আলবেনিয়ার রাজধানী ছিলো। এখানে অনেক আলেমও জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য অঙ্গনের নামী-দামী ব্যক্তিদেরও এখানে জন্ম হয়েছে। শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী মরহুমও এ শহরেই জন্ম গ্রহণ করেন। জগদ্বিখ্যাত মহিলা মাদার তেরেসাও এখানেরই লোক ছিলেন। তিনি স্বাধীনতার পর এখানে খ্রিস্টবাদের প্রচার-প্রসারের জন্যে বড়ো একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ শহরের প্রাচীনতম মসজিদ হলো, পলম্বট মসজিদ। প্রাচীন নিদর্শন হিসেবে এটি রেখে দেয়া হয়। কিন্তু নামায বন্ধ ছিলো। স্বাধীনতার পর শাইখ সবরী কোচী রহ. মসজিদটি খুলে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন। মসজিদটি এখনও শহরের এক কোণায় জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। তবে স্বাধীনতা লাভের পর শহরে আরো মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। পারুটস মহল্লায় একটি নতুন মসজিদ দেখি। একজন আলবেনীয় মুসলমান তাঁর ছেলেদেরকে ওসিয়ত করে গিয়েছিলেন যে,

যখনই ইসলামের দুশমন সরকার থেকে দেশ মুক্ত হবে, তখনই তাঁর জন্যে ইসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে অবশ্যই যেন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তিনি ইনতিকাল করেন। তাঁর প্রভাবশালী দুই ব্যবসায়ী ছেলে স্বাধীনতা লাভের পর মসজিদটি নির্মাণ করেন। 'জামে আবু বকর' নামে আরেকটি আলীশান মসজিদ রয়েছে। কুয়েতের এক ব্যবসায়ী পরিবার এটি নির্মাণ করেছেন।

স্কোদরার কিছু অধিবাসীর সাথে সাক্ষাৎ হয়। এখানকার একজন মুসলমান ব্যবসায়ী তার বাড়ির বাগানে দুপুরের খানা খাওয়ান। সেখানে আঞ্জির বৃক্ষ ছায়া বিস্তার করছিলো। তাঁর নিকট জানতে পারি যে, আলহামদুলিল্লাহ! ক্রমান্বয়ে শহরে মসজিদ নির্মাণ ও তাবলীগের কাজে অগ্রগতি হচ্ছে। কিন্তু নতুন প্রজন্ম দ্বীন থেকে এতো দূরে সরে গেছে যে, তাদের ফিরিয়ে আনতে অনেক চেষ্টা-সাধনা প্রয়োজন।

স্কোদরা যাওয়ার পথে আমাদের সঙ্গীরা পথে 'ক্রুইয়া' (Kruya) নামক দুর্গও দেখান। একটি পাহাড়ের উপর তা অবস্থিত। এটি ওসমানী যুগে নির্মিত একটি দুর্গ। ইতিপূর্বে আমি সেকেন্দার বেগের যে বিদ্রোহের কথা আলোচনা করেছি, তার কারণে পঁচিশ বছর পর্যন্ত দুর্গটি সেকেন্দার বেগের নিয়ন্ত্রণে ছিলো। তার মৃত্যুর পর পুনরায় তা ওসমানী খেলাফতের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এখন দুর্গটিকে প্রত্নদির্শনের একটি যাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে।

দাররুস ও কাওয়ায়া

দাররুস আলবেনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী এবং সুন্দর পর্যটনকেন্দ্র। যা এড্রিয়াটিক সাগরের তীরে অবস্থিত। এখান থেকে কিছু দূরে 'কাওয়ায়া' নামের ছোট একটি শহর রয়েছে। কোন এক অজানা কারণে এ শহরে দ্বীনদার লোকদের সংখ্যা সম্ভবত অন্যান্য শহরের তুলনায় অধিক। এখানের একটি মসজিদে মাওলানা শিব্বীর সাহেব ইমামতী ও পাঠদানের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। তিনি জামেয়া ইমদাদিয়া ফয়সালাবাদ থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। এ মসজিদে আমাদের মাগরিবের নামায পড়ার প্রোগ্রাম ছিলো। মাগরিবের পরে আমার বয়ান হবে। কিন্তু দীর্ঘ সফরের কারণে আমাদের পৌঁছতে কিছুটা বিলম্ব হয়ে যায়। আমরা পৌঁছে দেখি, অনেক মানুষ নামায পড়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। মসজিদের বাইরে আমাদেরকে জামাত করতে হয়। এ বিষয়টি এখানকার সব জায়গাতেই চোখে পড়ে যে, এখানকার লোকদের মধ্যে এখনও বয়ান শোনার মানসিকতা গড়ে ওঠেনি। বয়ান করতে হলে নামাযের পর সাথে সাথে সংক্ষিপ্তাকারে করতে হয়। তারপর আর সম্ভব হয় না। সুতরাং আমরা নামায শেষ করতে করতে লোকজন চলে যায়। কিন্তু মাশাআল্লাহ মসজিদ নামাযীদের দ্বারা পরিপূর্ণ দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। লোকেরা জানায় যে,

আল্লাহর মেহেরবানীতে এ শহরের গড় নামাযীর সংখ্যা অন্যান্য জায়গার তুলনায় অধিক। মাওলানা শিব্বীর সাহেব একজন তরুণ আলেম। মাশাআল্লাহ! এখানে হিকমতের সাথে তিনি তালীম ও তাবলীগের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। একটি ইবতিদায়ী মাদরাসাও পরিচালনা করছেন। স্থানীয় যে সব লোক তাঁকে এ কাজে সহযোগিতা করছেন তাদের সাথে সাক্ষাৎ হয়। একটি উপকূলীয় হালাল খাবারের হোটেলে তারা নৈশভোজের আয়োজন করেন। খানা খাওয়ার পর আমরা দাররুস শহরে ফিরে এসে এড্রিয়াটিক উপসাগরের তীরে রাত কাটাই।

বেলিশ ও সেখানকার মাদরাসা

দাররুস থেকে আমরা আরেকটি ছোট শহর বেলিশে (Belesh) যাই। শহরটি পাহাড়বেষ্টিত একটি ঝিলের তীরে অবস্থিত। মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউট এখানে একটি দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। একটি পুরাতন মসজিদ সংস্কার করে দারুল উলূমটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনামলে মসজিদটি একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিলো। তার মধ্যে ময়লা আবর্জনা ও নাপাকীর স্তুপ জমে গিয়েছিলো। মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউট এটি পরিষ্কার করে আবাদ করে। কুয়েতের কতিপয় মুসলমানের সহযোগিতায় মসজিদটি এমনভাবে পুনঃনির্মাণ করা হয় যে, সেখানে একটি আবাসিক মাদরাসারও ব্যবস্থা হয়েছে। তারা একটি মাদরাসা চালু করার ব্যবস্থাও করেছেন। অবস্থানস্থল হিসেবে জায়গাটি শিক্ষাকার্যক্রমের জন্যে খুব উপযুক্ত। ঝিলের তীরে সুন্দর পরিবেশে বড়ো শহরের হৈ হুল্লোড় থেকে দূরে অবস্থিত। এখানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে উপযুক্ত উস্তায ও পরিচালকের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু মাশাআল্লাহ! মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউটের যুবকরা এ জটিল কাজটিও এভাবে সমাধা করেন যে, হিন্দুস্তান থেকে তিনজন আলেম- মাওলানা নাযীর, মাওলানা সিরাজ ও মাওলানা মাকসূদ সাহেবকে- এখানে কাজ করার জন্যে দাওয়াত দেন। এই তিন তরুণ আলেম অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে এখানে কাজ আরম্ভ করেন। তাঁরা স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করেন এবং অনেক কষ্টের পর নিজেদের পরিবারকে এখানে নিয়ে আসেন। উপমহাদেশের জীবনাচার থেকে আলবেনীয় জীবনাচার ছিলো অনেক ভিন্ন। এ কারণে তাঁদের নিজেদেরকে এবং তাঁদের পরিবার-পরিজনকে এখানকার জীবনাচারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সহজ ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত কষ্ট করে নিজেদেরকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাদের ভাষা ও মন-মানসিকতা বোঝার চেষ্টা করেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখন তাঁদের ব্যবস্থাপনায় আলবেনিয়ার কয়েকটি অঞ্চলে বেশ কয়েকটি মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। তাঁদের খেদমতের ফল-ফুল দেখা যাচ্ছে। আমরা বেলিশে যে

মাদরাসা দেখি, সেখানে বেশকিছু ছাত্র হোস্টেলে থাকে। তাদের যাবতীয় খরচ মাদরাসা বহন করে। ছাত্রদের থেকে তিলাওয়াত শুনে মন আনন্দে ভরে ওঠে। বোঝা যাচ্ছিলো যে, উস্তাযগণ অত্যন্ত মেহনত করে ছাত্রদেরকে পাঠদান করছেন। এ মাদরাসাটি ছাড়া মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউট অন্যান্য জায়গাতেও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাদের ব্যয়ভারও মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউট বহন করে থাকে।

শাইখ সবরী কোচী রহ. যখন বৃটেন এসেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, আলবেনিয়ার লেকসোভিক শহর গ্রিসের সীমান্তে অবস্থিত। সেখানে গ্রিসের পক্ষ থেকে খুব জোরেশোরে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করা হচ্ছে। অপরদিকে এখানে কোন মসজিদ নেই। তাই তিনি বৃটিশ মুসলমানদের নিকট আবেদন করেছিলেন, তারা যেন নিজেদের ব্যয়ে সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ! মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউট নিজ দায়িত্বে এটি বাস্ত বায়নের ভার নেয়। সচ্ছল ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 'জামে আন নূর' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। ২০০২ ঈসায়ীতে তা উদ্বোধন করা হয়। মসজিদ নির্মাণ ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউট আলবেনিয়াতে জনসেবামূলক অনেক কাজও আরম্ভ করেছে। শীতের মওসুমে কম্বল ইত্যাদি বিতরণ, দরিদ্র এলাকায় খাদ্য যোগান দেয়া, পশ্চাদপদ কিছু অঞ্চলে পাইপ লাইন বিছানো, কতক জায়গায় ঔষধের ব্যবস্থা করা, রমাযান মাসে ইফতারীর ব্যবস্থা করা, মোটকথা স্থানীয় বিভিন্ন প্রয়োজনকে সামনে রেখে বিভিন্ন ধরনের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে।

এলবাসান

তিরানা ও স্কোদরার পর দেশের তৃতীয় বৃহত্তম শহর হলো 'এলবাসান' (Elbasan)। এটি দেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। আমরা বেলিশ থেকে এখানে আসি। এখানকার মসজিদটি ছিলো পাশা ওসমানীর যুগের। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসনামলে তা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এখন এটাকে নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। যোহরের নামায আমরা ঐ মসজিদে আদায় করি। এখানকার মুফতী সাহেব জামেয়া ইসলামিয়া মদীনা মুনাওয়ারা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে স্বাগত জানান। যোহরের নামাযের পর এখানে আমার বয়ান হয়। যার তরজমা যথাপূর্ব মাওলানা ইসমাঈল সাহেব করেন।

পোগ্রাদেস ও কোরচে

এলবাসান থেকে রওয়ানা হয়ে অত্যন্ত সুদৃশ্য পাহাড়ী অঞ্চল অতিক্রম করে আমরা পোগ্রাদেস (Pogrades) পৌঁছি। এটি 'ওহিরদ' (Ohird) নামক সুদৃশ্য একটি ঝিলের তীরে অবস্থিত। যার পশ্চাতে মাকদুনিয়ার পাহাড় দৃষ্টিগোচর হয়।

এ সীমান্ত এলাকাটি একদিকে মাকদুনিয়া ও অপরদিকে গ্রিসের সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। এ এলাকারই ছোট একটি শহরের নাম 'কোরচে' (Korche)। মাগরিবের সময় আমরা এ শহরের প্রাচীন মসজিদে পৌঁছি। মসজিদটি ৫১০ বছর আগে নির্মিত হয়েছে। সেখানকার মুফতী 'চাযেম' (এটি 'কাসেম' এর বিকৃত রূপ) বলেন যে, এশহরটি আলেমগণের কেন্দ্র ছিলো। কমিউনিস্ট শাসনকালে এখানে নামায বন্ধ করে দেয়া হয়। তবে মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর পুনরায় এখানে নামায আরম্ভ হয়েছে। মাগরিবের আযান হলে আমরা ছাড়া চার-পাঁচজন লোক ছিলো। নামায শেষ হতে হতে এক কাতার পূর্ণ হয়। নামাযের পর এখানেও আমার সংক্ষিপ্ত বয়ান হয়। বড়ো আক্ষেপ নিয়ে এখান থেকে ফিরে আসি যে, চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার অধিবাসীর এ শহরে মসজিদে অতিকষ্টে এক কাতার পূর্ণ হলো। জামাতের বেশির ভাগ লোক ছিলেন মসজিদের ব্যবস্থাপকগণ, তাই আমি তাদের কাছে আবেদন করি যে, তারা প্রতিদিন কিছু সময় মানুষের সাথে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে তাদেরকে যেন মসজিদে আসার জন্যে দাওয়াত দেন এবং শহরে তাবলীগ জামাতের কাজের প্রসার ঘটান।

এটি ছিলো আলবেনিয়ায় আমাদের অবস্থানের শেষ রাত। যা আমরা ওহিরদ ঝিলের তীরে অবস্থিত ছোট একটি হোটেলে অতিবাহিত করি। পরের দিন আমরা তিরানা থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে ফিরতি পথ ধরি। আল্লাহ তাআলা এ দেশটিকে নৈসর্গিক সৌন্দর্য দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন। মানুষের মধ্যেও বাহ্যিক সৌন্দর্য ছাড়া সদাচরণ ও কোমলচরিত্র স্পষ্ট অনুভূত হয়। এ ভূখন্ডের শাসকরা অতীতে দেশ ও জাতির উপর অবর্ণনীয় জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছে। সারা দেশ থেকে ইসলামের প্রত্যেকটি নিদর্শন মুছে ফেলার চেষ্টা করা ছাড়া অর্থনৈতিকভাবেও দেশের জনগণকে এ পরিমাণ বঞ্চিত করেছে যে, এখন আলবেনিয়া ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাদপদ দেশ। স্বাধীনতা লাভের পর দেশটি কিছুটা উন্নতি করলেও এখনও ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় একে একটি গ্রাম বলে মনে হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে ইসলামকে দমন করার ও মুছে ফেলার যে পরিমাণ চেষ্টা করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে এখানকার লোকেরা যে, এখনও পর্যন্ত নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেয় তাও অনেক কিছু। কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোক দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কেও অনবহিত। শরাব ও শুয়োরের ছড়াছড়ি। উলঙ্গপনা চরম পর্যায়ে। অনেক লোক কালেমায়ে তায়্যিবা পর্যন্ত জানে না।

সার্বিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে এ দেশটি মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনসমূহের আশু তৎপরতা লাভের হকদার। আলবেনিয়ার সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, বর্তমানে এখানে একদিকে
—৯

তাবলীগ জামাতের কাজকে জোরালো করা প্রয়োজন, অপরদিকে মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউট যে সমস্ত খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছে, তাদের সাথে সহযোগিতা করে দেশটির বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন পুরা করা সম্ভব। এ নেক কাজে যারা সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যে নিম্নে মুসলিম ওয়েলফেয়ার ইনিষ্টিটিউটের পরিপূর্ণ ঠিকানা দেয়া হলো।

Muslim Welfare Institute
35, Wellington Street (St. Jhons)
Blockbunr, Lancashire BB18AF
U.K. England

এ ছাড়া বৃটেনে মাওলানা হানীফ সাহেবের সঙ্গে এ টেলিফোন নম্বরেও যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ফোনঃ ০০৪৪-৭৭৫৩৩৫৪৮১০

وَاٰخِرُدَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

রাশিয়ায় নয় দিন

(শাওয়াল, ১৪২৭ হিজরী, নভেম্বর, ২০০৬ খ্রিঃ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এখন থেকে প্রায় ছয় মাস পূর্বে মস্কোর মুসলমান ব্যবসায়ী আব্দুস সালাম সাহেব তাবলীগ জামাতের কাজে পাকিস্তানে আসেন। তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং বলেন যে, রাশিয়ায় অনেক মুসলমান অধিবাসী রয়েছে। কিন্তু আলেম না থাকার তুল্য। এখন রাশিয়ান মুসলমানদের কিছুটা ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ হয়েছে। ধর্মীয় বিষয়ে তাদের পথ নির্দেশনার প্রয়োজন। তাদের এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলো মাঠ পর্যায়ে দেখেই কেবল অনুধাবন করা সম্ভব। তাই আমার আবেদন, আপনি কিছু দিনের জন্যে রাশিয়ায় আসুন। তাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করুন। তাদের উদ্দেশ্যে ইসলাহী বয়ান করুন। তাছাড়া এসব সমস্যার বিষয়ে তাদেরকে শুধু পরামর্শ দেওয়াই নয়, বরং এমন কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থায়ী ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করুন, যার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান হতে থাকবে। আব্দুস সালাম সাহেব আমার নিকট এসেছিলেন তাবলীগ জামাতের তৎপর কর্মী জনাব ইরফান জান সাহেবের সঙ্গে। ইতিপূর্বে তিনি তাবলীগ জামাতের সাথে রাশিয়ায় অনেক সময় লাগেছেন। তিনিও আব্দুস সালাম সাহেবের কথা সমর্থন করেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, আমি এ সফরের জন্য প্রস্তুত হলে তিনিও সঙ্গে যাবেন।

আমি তখন দাওয়াত তো কবুল করি, কিন্তু কার্যত সফরের সুযোগ হয় এ বছর ঈদুল ফিতরের ছয় দিন পর ১লা নভেম্বর, ২০০৬ ঈসায়ীতে। তাবলীগ জামাতের তৎপর মুরব্বী জনাব জাভেদ হাজারবী- যাঁর সঙ্গে আমি কিরগিজিস্তান সফর করেছি- তিনিও সাথে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হন। দুবাইয়ের একটি মিটিং

থেকে অবসর হওয়ার পর জনাব জাভেদ হাজারবী সাহেব এবং জনাব ইরফান জান সাহেবের সঙ্গে ১লা নভেম্বর সকালে মস্কোর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আকাশ পথে পাঁচ ঘণ্টা সফরের পর মস্কোর বিমানবন্দরে অবতরণ করি। আব্দুস সালাম সাহেব ও তার সঙ্গীগণ স্বাগত জানানোর জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভি আই পি লাউঞ্জের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। মস্কোতে হালকা বরফপাত শুরু হয়েছিলো। দিন খুব ছোট হয়ে আসছিলো। আমরা যোহরের একেবারে শেষ ওয়াক্তে বিমানবন্দরের কার্যক্রম হতে অবসর লাভ করি। ভি.আই.পি. লাউঞ্জেই প্রথমে যোহর এবং পরে অসরের নামায আদায় করি। অবস্থানস্থলে যেতে যেতে মাগরিবের ওয়াক্ত হয়ে যায়। সে রাতটি এখানকার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সাক্ষাত এবং সফরের কর্মসূচীর চূড়ান্ত রূপ দিতে ব্যয় হয়। আব্দুস সালাম সাহেব বললেন যে, রাশিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে বহু সংখ্যক মুসলমান রয়েছে। শুধু মস্কোতে প্রায় ১২-১৫ লাখ মুসলমান বাস করেন। তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক রয়েছেন চেচনিয়া ও তাতারিস্তানের লোক। তারপর ইরান, আফগানিস্তান ও ভারত-পাকিস্তান থেকে আগত মুসলমানের সংখ্যাও অনেক। তবে রাশিয়ার দু'টি প্রদেশ এমন রয়েছে, যেগুলোতে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। এক. দাগিস্তান, যেখানের কমপক্ষে নব্বই শতাংশ অধিবাসী মুসলমান। দুই. তাতারিস্তান, যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা বায়ান্ন শতাংশ। আমাদের পারস্পরিক পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয় যে, মস্কোতে দু'রাত কাটিয়ে তারপর প্রথমে দাগিস্তান অতঃপর তাতারিস্তানে সফর করবো। সেখান থেকে ফেরার পর আরও দুদিন মস্কোতে অবস্থান করবো।

মস্কোতে বর্তমানে পাঁচটি বড়ো মসজিদ রয়েছে। এগুলো ছাড়া বিভিন্ন এলাকার মুসলমানগণ ছোট ছোট নামায ঘরও বানিয়েছেন। সেই বড়ো মসজিদগুলোর একটি রয়েছে 'প্রাসপিক্ট মীরা' মহল্লায়। রাশিয়ান ভাষায় বড়ো সড়ককে 'প্রাসপিক্ট' বলে। এ মসজিদটি সড়কের নামেই পরিচিত। ২রা নভেম্বর মাগরিবের পর এ মসজিদে আমার বয়ান ছিলো। এ মসজিদটিই রাশিয়ার 'আল ইদারাতুদ দ্বীনিয়া'র কেন্দ্র। এখানে রাশিয়ার প্রধান মুফতীর কার্যালয়ও রয়েছে। আমি কিরগিজিস্তানের সফরনামায় লিখেছি যে, যেসব দেশ কমিউনিস্ট রাশিয়ার অধীনে ছিলো, সেগুলোতে সার্বিকভাবে দ্বীনী অৎপরতা যদিও নিষিদ্ধ ছিলো, কিন্তু কোন কৌশলের কারণে তারা বুখারাতে সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি মাদরাসা চালু রেখেছিলো। সেখানে তাদের বিশ্বস্ত লোকদেরকে আরবী ও ইসলামী ইলমসমূহ মোটামুটিভাবে শিক্ষা দিয়ে মুফতী পদে অধিষ্ঠিত করা হতো। কমিউনিস্ট শাসনকালে এ পদের মর্যাদা ছিলো বেশিরভাগ লোকদেখানো। কমিউনিস্ট শাসন বিলুপ্ত হওয়ার পর যখন ধর্মীয় স্বাধীনতা দেয়া হয়, তখন ঐ পদটিও অবশিষ্ট রাখা হয়। এখন এ প্রতিষ্ঠান বাস্তবিকই দ্বীনী

কাজ করে যাচ্ছে। এর গুরুত্ব অনেকটা মুসলিম দেশগুলোর ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মতো। এ প্রতিষ্ঠানকে 'আল ইদারাতুদ দ্বীনিয়া' এবং তার প্রধানকে 'মুফতী' বলা হয়। এ প্রতিষ্ঠান মসজিদের ব্যবস্থাপনা এবং মুসলমানদের বিবাহ-তালাক ও অন্যান্য বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকে। সারাদেশের ধর্মীয় তৎপরতা এ প্রতিষ্ঠানের অধীনেই সম্পাদিত হয়। রাশিয়ায় যদিও এখন ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে, তবে বর্তমানে সারা বিশ্বে দ্বীনদার মুসলমানদের সম্পর্কে যে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে, তার কারণে এ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় তৎপরতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয়। যে সব লোক এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোন রূপ সম্পর্ক রাখা ছাড়া এ ধরনের ধর্মীয় তৎপরতা চালান, তাদেরকে মারাত্মক তল্লাশীর মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সময় সন্দেহের কারণে বন্দী জীবনও কাটাতে হয়। সারাদেশব্যাপী এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান মুফতী আইনুদ্দিন সাহেব (রাশিয়ায় 'আইন' এর উচ্চারণ সাধারণত 'গাইনে'র মতো করা হয়। এ জন্যে মানুষ তাকে 'গাইনুদ্দীন' বলে থাকে।) আমাদের মেযবান তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁর মাধ্যমেই রাশিয়ায় আমার ভিসার ব্যবস্থা করেন। রাশিয়ার বিশেষ এক প্রকার ভিসাকে ধর্মীয় ভিসা বলা হয়। মুফতী সাহেবের মাধ্যমে আমাদের জন্যে এ ধরনের ভিসার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এতে সুবিধা এই ছিলো যে, আমরা এর মাধ্যমে নির্বিঘ্নে সব ধরনের ধর্মীয় কাজ করতে পারি। সাধারণের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় বয়ানও তার অন্তর্ভুক্ত। মুফতী সাহেব আমাদের জন্যে একটি চিঠিও লিখে দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিলো যে- এঁরা 'আল ইদারাতুদ দ্বীনিয়া'র মেহমান। এঁদেরকে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হোক। এ প্রাসপিক্ট মীরার মসজিদ সংলগ্ন একটি ভবনে রয়েছে মুফতী সাহেবের পুরো সচিবালয়। মুফতী সাহেব নিজে যদিও সফরে ছিলেন, কিন্তু তার সহকর্মীগণ আমাদের আপ্যায়ন করেন এবং বলেন যে, আপনাদের সফরের শেষ নাগাদ তিনি ফিরে আসবেন। আমাদেরকে বলা হয় যে, কমিউনিস্ট শাসনকালে মুফতী সাহেবের এ অফিস ও এর অধীনস্থ ধর্মীয় তৎপরতা বন্ধ করে দেয়া থেকে রক্ষা করার জন্যে অনেক মুসলমান এ মসজিদের দরজায় শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। মাগরিবের নামাযের পর এ মসজিদেই আরবী ভাষায় আমার বয়ান হয়। সাইবেরিয়ার একজন আলেম শাইখ জাকির রাশিয়ান ভাষায় তার তরজমা করেন। তিনি তিউনিসিয়ার জামেয়া যায়তুনা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। মস্কো ও কাজানে আমার দোভাষী হিসেবে তিনি সাথে থাকেন। মস্কোর অবস্থা অনুপাতে সমাবেশ ছিলো বেশ বড়ো। অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে মানুষ এক ঘণ্টা বয়ান শ্রবণ করে। তাতে সেখানকার অবস্থা অনুপাতে আমি তাদেরকে দ্বীন ভিত্তিক জীবন কাটানোর পরামর্শ দেই। মস্কোর অবশিষ্ট বিবরন ইনশাআল্লাহ আমি পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

দাগিস্তানে

পূর্বপরিকল্পনা মোতাবেক ৩রা নভেম্বর ২০০৬ ঈসায়ী দুপুর একটায় মস্কো থেকে আমরা সাইবেরিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমানে দাগিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আড়াই ঘণ্টা পর দাগিস্তান প্রদেশের রাজধানী 'মাখাশকালা' বিমানবন্দরে অবতরণ করি।

দাগিস্তান মস্কোর দক্ষিণে কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea) ও ককেশাস পর্বতমালার মাঝে বিশাল বিস্তৃত এক ভূ-খন্ড। ইনশাআল্লাহ আমি সামনে আলোচনা করবো যে, এ ভূখন্ডের বেশিরভাগ অঞ্চল সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর শাসনামলেই বিজিত হয়ে মুসলমানদের হাতে চলে আসে। তারপর প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত এর উপর বিভিন্ন মুসলমান বাদশাহর শাসন চলতে থাকে। অবশেষে তা উসামানী খেলাফতের অধীনে আসে। কিছুদিন সফবী ও কাচারীদেরও শাসন চলে। তারপর রাশিয়ার শাসকরা অনেকবার তার উপর আক্রমণ করে এবং কয়েকবার তার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। অবশেষে ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীতে ইমাম শামেল আফেন্দী রহ. এখানে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ইমাম শামেল রহ. দাগিস্তানেরই অধিবাসী ছিলেন। তিনি উঁচু মাপের আলেম এবং নক্‌শবন্দী সিলসিলার শাইখও ছিলেন। তিনি এখানে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু রাশিয়ার জার-এর সৈন্য বাহিনী সব সময় তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে। রাশিয়ার সৈন্যদের সঙ্গে অত্যন্ত প্রজ্ঞা ও বীরত্বের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বছর যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে ১২৭৬ ঈসায়ীতে তিনি দেখেন যে, রাশিয়ান সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে তাঁকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। তাঁর সাথীদের মধ্যে মাত্র তিনশ' জন অবশিষ্ট রয়েছে। রাশিয়ান সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো প্রায় বিশ হাজার। এ সময় রাশিয়ান সৈন্যরা নিরাপত্তাদানের শর্তে তাঁর নিকট অস্ত্র সমর্পনের আবেদন করে। ইমাম শামেল রহ. এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। রাশিয়ার জার সরকারের এটি ভদ্রতা ছিলো যে, ইমাম শামেল রহ. কে সে অত্যন্ত সম্মান করে। সম্মানিত মেহমান রূপে তাঁকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। ইমাম শামেল রহ. হজ্জ করার বাসনা প্রকাশ করলে রাশিয়া সরকার তাঁকে অনুমতি দেয়। তিনি প্রথমে ইস্তাম্বুল যান। সেখানে সুলতান আব্দুল আযীয তাঁকে অত্যন্ত সম্মান করেন। পরে তিনি পবিত্র হেজাযে গমন করেন। পরিশেষে মদীনা মোনাওয়ারায় ইনতিকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

তাঁর অস্ত্রসমর্পনের পর এ পুরো অঞ্চল জার রুশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। কমিউনিস্টদের বলসেভিক বিপ্লব দেখা দিলে এই দাগিস্তানেরই আরেক জানবাজ মুজাহিদ শাইখ নাজমুদ্দীন আফেন্দী রহ. তাদের পথ রোধ করার জন্যে প্রাণপণ লড়াই করেন। শাইখ নাজমুদ্দীন আফেন্দী রহ. দাগিস্তানের বড়ো আলেম

ছিলেন। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কমিউনিস্টদের শাসন হবে জার রুশের শাসনের চেয়েও অনেক মারাত্মক। জারের শাসনামলে দ্বীনের উপর আমল করার যে সব সুযোগ তারা পাচ্ছেন, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি নিজের জানবাজ সাথীদের একটি দল গঠন করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত দাগিস্তানে কমিউনিস্টদের অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করেন। দাগিস্তানের কমিউনিস্টরা কতক শাইখকে এ সবুজ স্বর্গ দেখায় যে, আমরা ক্ষমতায় এলে আপনাদেরকে তেমন স্বাধীনতাই দেবো, যেমন বর্তমানে রয়েছে। সুতরাং তারা শাইখ নাজমুদ্দীনকে কমিউনিস্টদেরকে প্রতিহত করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু শাইখ নাজমুদ্দীন তাদেরকে বলেন যে, আমি তাদের সংকল্প সম্পর্কে অবহিত আছি। এরা যা কিছু বলছে সবই ধোঁকা। এ জন্যে আমি আমার শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাদের সঙ্গে লড়ে যাওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। সুতরাং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়তে থাকেন। কিন্তু পরিশেষে কমিউনিস্টরা বিজয়ী হয়। তাঁকে বন্দী করা হয়। বন্দী হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে তা কারও জানা নেই। বিভিন্ন কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। কিছু লোক বলে, তাকে বিমান থেকে নিচে ফেলে দেয়া হয়েছে, কেউ বলে তাঁকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত কথা এক আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউই জানে না। আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।

দাগিস্তান ছিলো ওলামায়ে কেরামের কেন্দ্র। কমিউনিস্ট সরকারের অমানবিক জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও এখানকার ওলামায়ে কেরাম জান বাজী রেখে দ্বীনের হেফাযত করেন। কমিউনিস্ট সরকারের সামনে ইলমে দ্বীন পড়া ও পড়ানো মৃত্যুকে দাওয়াত দেয়ার নামান্তর ছিলো না। কিন্তু এখানকার ওলামায়ে কেরাম নিজেদের ঘরের মধ্যে গোপন কক্ষ বানিয়ে ইলমে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার ধারা অব্যাহত রাখেন। ফলে আজও এখানকার নব্বই শতাংশের অধিক অধিবাসী মুসলমান। গুপ্তকক্ষে শিক্ষা গ্রহণকারী অনেক আলেম আজও বিদ্যমান রয়েছেন।

আমরা যখন মাখাশকালা বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখন সেখানে ওলামায়ে কেরামের বড়ো একটি দল স্বাগত জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিলেন। শাইখ ইয়াহইয়া এখানকার একজন প্রভাবশালী আলেম। তিনি ইন্টারনেটে আমার বিভিন্ন ফাতাওয়া ও রচনা পড়ে আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনিই এলাকার আলেমদেরকে আমার সম্পর্কে বলেছিলেন। তাই তারা স্বাগত জানানোর জন্যে সমবেত হয়েছিলেন। শাইখ ইয়াহইয়া আমাকে বলেন যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ শত শত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন। তাই সামনে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে বিমানবন্দরের মসজিদে সমবেত

হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে আপনার বয়ান করাকে মোনাসেব মনে করছি। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক ছিলেন আলেম। কিন্তু প্রত্যেক আলেমের সঙ্গেই কিছু সাধারণ মুসলমানও এসেছিলেন। ফলে মসজিদে বেশ বড়ো সমাবেশ হয়ে যায়। আছরের নামাযের পর আমি আরবীতে বয়ান করি। যা ছিলো প্রসিদ্ধ من أحيا سنة اميتت بعدى فله أجر مأة شهيد (যে ব্যক্তি আমার পরে বিলুপ্ত কোন সুন্নাতকে জীবিত করবে সে একশ' শহীদের সমান সওয়াব লাভ করবে।) হাদীসের ব্যাখ্যা সম্বলিত। পরে প্রশ্নোত্তরের ধারাও আরম্ভ হয়। কিন্তু শাইখ ইয়াহইয়া এ কথা বলে মাঝপথে তা বন্ধ করে দেন যে, ইনশাআল্লাহ, কাল রাতে এবং পরশু সকালে 'বুকদেলে' ওলামায়ে কেরামের অনেক বড়ো সমাবেশ হবে। অবশিষ্ট প্রশ্ন সেখানকার জন্যে রেখে দেয়া হোক। কারণ, মেহমানকে এখনই আরেকটি দীর্ঘ সফর করতে হবে। এভাবে মাগরিবের একটু আগে মজলিস সমাপ্ত হয়। আমরা মাগরিবের নামায পথে অন্য একটি মসজিদে পড়ি।

দাগিস্তানে আমাদের অবস্থানের পুরো প্রোগ্রাম শাইখ ইয়াহইয়া বিন্যস্ত করেছিলেন। সে মোতাবেক আজকের রাত আমাদেরকে শাইখ ইয়াহইয়ার শহর 'হাসিউতে' কাটানোর প্রোগ্রাম ছিলো। শহরটি ছিলো মাখাশকালা থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে। পথে শাইখ ইয়াহইয়া আমাদেরকে দাগিস্তানের ইতিহাস, এখানকার ওলামায়ে কেরামের অবস্থান, এখানকার প্রথা-প্রচলন ও কমিউনিস্ট শাসনকালের জুলুম-অত্যাচার সম্পর্কে অনেক কিছু বলেন। তিনি বলেন যে, আমার নানা একজন বড়ো মাপের আলেম ছিলেন। তিনি অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন বিষয়ের অনেক কিতাব নিজ বাড়িতে সংগ্রহ করেন। কমিউনিস্টরা যখন এ এলাকা দখল করে, তখন তিনি তাদের হাত থেকে নিজের কুতুবখানাকে রক্ষা করার জন্যে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে সেগুলো লুকিয়ে রাখেন। দীর্ঘদিন পর তাঁর স্মরণ হলো, ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে রাখা কিতাবগুলো উঁইপোকা খেয়ে না ফেলে। এ কারণে তিনি চুপিসারে ভূ-গর্ভস্থ কক্ষে গিয়ে কিতাবগুলো পরিষ্কার করতে আরম্ভ করেন। একজন গুপ্তচর (বাহ্যত সে একজন মুসলমানই ছিলো) কমিউনিস্ট পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে কুতুবখানার উপর অতর্কিত আক্রমণ চালায়। কিতাবগুলো ছিঁড়ে ফেলে এবং পদদলিত করে। শেষে সবগুলো কিতাবে আগুন লাগিয়ে দেয়। আমার নানাকে বন্দী করে নিয়ে যায়। আমার মা তখন অল্পবয়সী ছিলেন। তিনি এবং আমার নানী- তখন তিনি যুবতী ছিলেন- বড়ো অসহায়ভাবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। হাজার চেষ্টা করেও আর কখনও নানার দেখা পাননি। আজ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কারও জানা নেই, তাঁর শেষ পরিণতি কী হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনামল এ ধরনের ঘটনা দ্বারা পরিপূর্ণ। সে সময় যে জুলুম-অত্যাচার হয়েছে, আমার ধারণায় তা নির্ভরযোগ্য ও সঠিকভাবে কখনই সংকলিত করা সম্ভব হবে না।

শাইখ ইয়াহইয়া একথাও বলেন যে, বর্তমান সরকারের সময়ে অনেকটাই ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে। দেশের নতুন আইনে প্রত্যেক ধর্মের লোকদেরকে নিজেদের ধর্মের উপর আমল করা এবং তার তালীম-তাবলীগ করার ছাড় দেয়া হয়েছে। সুতরাং কমিউনিস্ট যুগে পুরো দাগিস্তান প্রদেশে- যা এক সময় মসজিদ-মাদরাসার কেন্দ্র ছিলো- শুধুমাত্র চব্বিশটি মসজিদ অবশিষ্ট ছিলো এবং তাও ছিলো বিরান। কিন্তু কমিউনিস্ট শাসন ব্যবস্থা বিলুপ্তির পর এখন পর্যন্ত প্রদেশটির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অনেক মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এখন দাগিস্তানের মসজিদসংখ্যা আড়াই হাজারেরও অধিক।

কথা বলতে বলতে আমরা হাসিউত শহরে প্রবেশ করি। এটি দাগিস্তান প্রদেশের সীমান্ত শহর। এখান থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার দূরে চেচনিয়া আরম্ভ হয়েছে। যার প্রধান শহর গ্রোজনী। গ্রোজনী এখান থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমরা যখন শহরে প্রবেশ করি, তখন ইশার নামাযের ওয়াক্ত ঘনিয়ে এসেছিলো। এ কারণে আমরা সোজা বড়ো একটি মসজিদে চলে যাই। জামাতে বহু সংখ্যক নামাযী অংশ নেন। এরা বহু দূর থেকে একজন তালিবে ইলমের আগমনে অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। ভাষার আড়াল সত্ত্বেও তাদের চেহারায় আমাদের জন্যে না জানি কতো নির্বাক পয়গাম ছিলো!

শাইখ ইয়াহইয়া আমাদেরকে তাঁর ভাইয়ের বাংলো সদৃশ বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর ভাই আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। দেখতে দেখতে বাংলোর একটি হলকক্ষে গণ্যমাণ্য লোকদের ভীড় জমে যায়। তাদের মধ্যে কয়েকজন আলেমও ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আরবীতে কথা হয়। তাঁরাই অন্যদের কাছে আমাদের কথা অনুবাদ করে তুলে ধরেন। প্রশ্নোত্তরের মাহফিলের মাঝেই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। অনেক রাত পর্যন্ত এ মাহফিল চলতে থাকে।

আমাদেরকে বলা হয় যে, বর্তমানে দাগিস্তান প্রদেশ রাশিয়ায় ওলামায়ে কেরামের সবচেয়ে বড়ো কেন্দ্র। প্রায় তিনশ' আলেম এখানেই উপস্থিত আছেন। তাদের মধ্যে যাঁরা বর্ষীয়ান ছিলেন, তাঁরা কমিউনিস্ট শাসনামলে গুপ্তকক্ষে শিক্ষা লাভ করেন। আর যুবকরা স্বাধীনতা লাভের পর সিরিয়া, মিসর বা সৌদি আরব থেকে শিক্ষা লাভ করে আসেন। পরের দিন সকালে আশেপাশের এলাকা থেকে আলেমদের আগমনের ধারা অব্যাহত থাকে। তাদের মধ্যে এলাকার সবচেয়ে বুযুর্গ আলেম ছিলেন শাইখ মুহাম্মাদ রমাযান সাম্মাখী। পুরো প্রদেশে তাঁকে 'ওস্তাযুল আসাতিযা' এবং নক্শবন্দী সিলসিলার বুযুর্গতম শাইখ মনে করা হয়। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে বহু মাইল পথ অতিক্রম করে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আলোকিত আপাদমস্তক তাঁর ইবাদত ও পরহেযগারীর সাক্ষ্য দিচ্ছিলো। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ইলমী ও স্থানীয় বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হয়।

তারপর শাইখ ইয়াহইয়া আমাদেরকে মাদরাসায় নিয়ে যান। 'জামেয়াতুল ইমাম আবুল হাসান আল আশয়ারী' নামে তিনি এটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড়ো মাদরাসা এটি। মাদরাসাটি এলাকার একজন বড়ো আলেম শাইখ মুহাম্মাদ আস সাইয়্যেদ ১৯৯২ ঈসায়ীতে ছোট একটি ভবনে প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০২ ঈসায়ীতে তার শানদার নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে শাইখ ইয়াহইয়া এর দায়িত্বে রয়েছেন। এখানে দশ বছরের পাঠ্যক্রম পড়ানো হয়। যা রাশিয়ান ভাষা এবং অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত করার সাথে সাথে তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের মানসম্মত কিতাব সম্বলিত। প্রায় তিনশ' ছাত্র এখানে শিক্ষাধীন রয়েছে। মেয়েদের মাদরাসা রয়েছে একটি পৃথক ভবনে। উস্তায ও ছাত্রদের সঙ্গে আরবীতে কথা বলার সুযোগ হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে শিক্ষার মান বেশ উন্নত মনে হয়। দাগিস্তানের অন্যান্য শহর ও মাদরাসায় এর আরও কিছু শাখা কাজ করছে।

দারবান্দের সফর

আমি দাগিস্তান সফরকালে দারবান্দের ঐতিহাসিক শহরও দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। দারবান্দকে 'বাবুল আবওয়াব'ও বলা হয়। সাহাবায়ে কেরাম এটা জয় করেছিলেন। সেখানে প্রায় চল্লিশজন সাহাবীর কবরও রয়েছে। শাইখ ইয়াহইয়া অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এ সফরের ব্যবস্থা করেন। এর অদূরেই চেচনিয়া। সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন চলছে। এ কারণে দাগিস্তানের জায়গায় জায়গায় পুলিশি তল্লাশী চলছিলো। শাইখ ইয়াহইয়া দাগিস্তানের একজন সংসদ সদস্যকে আমার সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে নিজে তার দামী গাড়ি চালিয়ে আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন। মাখাশকালা ও বুগদেলের ওলামায়ে কেরাম জানতে পেরে তারাও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সুতরাং ৮/১০টি গাড়ির এ কাফেলা দারবান্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা চলার পর দারবান্দের শহরে প্রবেশ করি। এখানে একটি মসজিদের সঙ্গে প্রাচীন ধাঁচের একটি মাদরাসাও রয়েছে। এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি শাইখ সিরাজ উদ্দীন এর প্রধান।

আমরা যোহরের নামাযের সময় সেখানে পৌঁছি। সে মসজিদেই নামায আদায় করি। তারপর দারবান্দের প্রাচীন শহরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। একটি পাহাড়ের পাদদেশে শহরটি অবস্থিত। পাহাড়ের ওপর দারবান্দের বিখ্যাত ঐতিহাসিক দুর্গ রয়েছে। শত শত বছর পার হয়ে যাওয়ার পরেও এখনও তা শান-শওকতের প্রতিচ্ছবি। দুর্গের গম্বুজ থেকে আশেপাশের হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য ছিলো অবিস্মরণীয়। পাহাড়ের পাদদেশে সুদূর বিস্তৃত দারবান্দ শহর। তার পিছনে আদিগন্ত বিস্তৃত কাস্পিয়ান সাগরের (Caspian Sea) নীলাভ পানি।

দুর্গের ডান-বামে রয়েছে সবুজ পাহাড় ও উপত্যকাসমূহ। আমাদের সকল সাথী দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এ দৃশ্য উপভোগ করেন।

যুলকারনাইনের প্রাচীর

বিশেষ যে কারণে আমি দারবান্দ দেখতে চাচ্ছিলাম তা এই যে, সমকালীন কিছু আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, হযরত যুলকারনাইনের নির্মাণকৃত এবং কুরআনে কারীমে উল্লেখিত সেই প্রাচীর, যা ইয়াজুজ-মাজুজের খুন-খারাবী ও লুণ্ঠন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নির্মাণ করা হয়েছিলো তা দারবান্দে অবস্থিত। তারা আরও বলেন যে, সে প্রাচীরের কিছু নিদর্শন এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। সুতরাং আমি ঐ দুর্গের বুরুজে পৌঁছার পর স্থানীয় ওলামায়ে কেরামের নিকট সেই প্রাচীর সম্পর্কে জানতে চাই। তারা একটি ভগ্নপ্রাচীরের দিকে ইশারা করেন, যা ঐ দুর্গের পাদদেশে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। কিন্তু এটি যুলকারনাইনের প্রাচীর হওয়ার সুদূর কোন আলামতও দেখতে পাচ্ছিলাম না। তার সবচেয়ে বড়ো কারণ এই যে, প্রাচীরটি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে দারবান্দ শহরের সমতল ভূখন্ড অতিক্রম করে সমুদ্র পর্যন্ত চলে গেছে। দুই পাহাড়ের মাঝে তা নির্মিত নয়। অথচ কুরআনে কারীমের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, যুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী পথ বন্ধ করার জন্যে। দুর্গের যে বুরুজের উপর আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তা একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। তার থেকে কিছু দূরে আরেকটি পাহাড় রয়েছে এবং দুই পাহাড়ের মাঝে একটি পথও রয়েছে। কিন্তু প্রথমত, এর মধ্যে প্রাচীরের কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ত, এ পাহাড় এতো উঁচু নয় যে, তা ইয়াজুজ-মাজুজের মতো অসাধারণ সৃষ্টির জন্যে অনতিক্রম্য হবে। এ কারণে এর মধ্যে কোন প্রাচীর নির্মাণ করা হলেও তা দ্বারা ইয়াজুজ-মাজুজের পথ রোধ করা অযৌক্তিক মনে হয়। তৃতীয়ত, দারবান্দে পাহাড় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রান্তরে যেই প্রাচীর নিমার্ণ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, বিপরীত দিকের শত্রুদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে বাদশা নওশেরওঁয়া এটি নির্মাণ করেছিলেন। এ কারণে মাঠ পর্যায়ে দেখার পর একথা প্রায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, দারবান্দের এ প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলা কোনভাবেই ঠিক নয়।

হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারবী রহ. তাঁর গবেষণাপূর্ণ 'কাসাসুল কুরআন' গ্রন্থেও দারবান্দের প্রাচীরটি যুলকারনাইনের প্রাচীর হওয়াকে যে সমস্ত প্রমাণ দ্বারা খন্ডন করেছেন, এখানে এসে দেখার পর তা পুরোপুরি সত্যায়িত হয়। তবে ককেশাশের এ পর্বতসারিটিই- যার মধ্যে দারবান্দ দুর্গ অবস্থিত- পশ্চিমে আরো সম্মুখে অগ্রসর হয়ে ক্রমান্বয়ে উচুঁ হয়ে গেছে। তার মাঝে

দারিয়াল নামে একটি উপত্যকা রয়েছে। এখানে লোহা ও গলিত তামার একটি প্রাচীরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারবী সাহেবের মত হলো, এ পথটি বন্ধ করার জন্যেই যুলকারনাইন প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। (কাসাসুল কুরআন, ৩/২১৮-২১৯)

যাইহোক, দারবান্দ দুর্গ কিছু সময় ঘুরে দেখার পর আমাদের কাফেলা পাহাড় থেকে নেমে দারবান্দ শহরে প্রবেশ করে। এখানে বড়ো একটি কবরস্ত ানের মাঝে চারদিকে দেয়ালঘেরা ছোট একটি কবরস্তান রয়েছে। যার সম্পর্কে 'তাওয়াতুরে'র সাথে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এখানে চল্লিশজন সাহাবীর কবর রয়েছে।

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. হযরত ওমর ফারুক রাযি.-এর খেলাফতকালেই এখানে পৌঁছেছিলেন। এ বিষয়ে তো সব ঐতিহাসিক একমত যে, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আরমেনিয়া ও আজরবাইজান জয় করার পর এদিকে অগ্রসর হন। এরপর কতক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, দারবান্দ হযরত সুরাকা ইবনে আমর রাযি.-এর নেতৃত্বে সন্ধির ভিত্তিতে বিজিত হয়। আর কতক বর্ণনায় হযরত সালমান বিন রাবীয়া বাহেলী রাযি.-কে দারবান্দ বিজয়ী সাব্যস্ত করা হয়েছে। দারবান্দ সহজেই বিজিত হয়েছিলো। কিন্তু এখানে 'খাযার' নামে একটি জাতি বাস করতো। তারা 'বলখবার'কে কেন্দ্র বানিয়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানদের সঙ্গে লড়তে থাকে। এ যুদ্ধেই হযরত সালমান বিন রাবীয়া রাযি. ও তাঁর অনেক সঙ্গী মুজাহিদ শহীদ হন।

ছোট এই কবরস্তানে প্রাচীন ধাঁচের চল্লিশটি কবর রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটি কবর সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি হযরত সালমান বিন রাবীয়া রাযি.-এর কবর। হযরত সালমান বিন রাবীয়া রাযি.-কে অনেক মুহাদ্দিস সাহাবীদের মধ্যে গণ্য করেছেন। আর অনেকেই তাঁকে তাবেঈ সাব্যস্ত করেছেন। হযরত ওমর রাযি. তাঁকে কুফার বিচারপতিও নিযুক্ত করেছিলেন। সহীহ মুসলীমে তাঁর একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বর্ণীত আছে যে, তিনি প্রতি বছর হজ্জ করতেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করুন। (আল ইসাবা, ২/৬১, তাহযীবুত তাহযীব, ৪/১৩৬)

আলহামদুলিল্লাহ! এসকল সাহাবীর কবরে সালাম আরয করার তাওফীক লাভ হয়। দেয়ালঘেরা এ ছোট কবরস্তানের বাইরে বিশাল বিস্তৃত কবরস্তান রয়েছে। এখানে অনেক কবরে একটি নতুন জিনিস দেখি যে, সেগুলোতে মর্মর পাথরের ফলকে কবরবাসীর ছবি বানানো রয়েছে। এমন কবর আমি ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখিনি। এখানকার লোকেরা বলে যে, এই ফলক তৈরি করতে মানুষ লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে থাকে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। কবরস্তান থেকে আমরা দারবান্দ শহরের প্রাচীনতম জামে মসজিদে

যাই। যার সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি সাহাবায়ে কেরামের যুগে নির্মিত মসজিদ। তার উপর লাগানো একটি ফলক দ্বারাও তেমনই অনুমিত হয়। এ মসজিদের নিকটেই অতি পুরাতন বিশাল-বিস্তৃত একটি বৃক্ষ রয়েছে। এলাকার লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এখানে এক সময় হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. অবস্থান করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

এখান থেকে রওয়ানা হতে হতে আছরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। যে মসজিদে আমরা যোহরের নামায আদায় করেছিলাম, সেখানে শাইখ সিরাজ উদ্দীন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সেখানে পৌঁছে আমরা আছরের নামায আদায় করি। শাইখ সিরাজউদ্দীন অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ খাবারের আয়োজন করেন। তিনি এ অঞ্চলে একজন পীর হিসেবে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব। নিজের ইলমের চেয়ে হাস্যোচ্ছল স্বভাব ও জনসেবার কারণে মানুষের মধ্যে তিনি অধিক গ্রহণযোগ্য। মসজিদের সাথে তিনি যে এবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ধরন-ধারন আমাদের সীমান্ত প্রদেশের গ্রাম্য মাদরাসাগুলোর সাথে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ।

ককেশাশে এক রাত

খানা খাওয়ার পর আমরা এখান থেকে রওয়ানা হই। আমাদের সামনে এখনও দীর্ঘ একটি সফর রয়ে গেছে। এখান থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে বুগদেল নামে একটি ছোট শহর রয়েছে। আজ রাতে সেখানে দূর-দূরান্তের আলেমগণের বড়ো একটি সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদেরকে সেখানেই রাত কাটাতে হবে। পথের একটি মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করে পুনরায় সফর আরম্ভ করি। পুরো দাগিস্তানের পশ্চিম দিক ককেশাশ পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এ পর্বতসারিকে 'কোহে কাফকায' পর্বতও বলা হয়। যাকে সংক্ষেপে 'কোহেকাফ' বলে। এ পর্বতসারিরই একটি পাহাড়ের একেবারে চূড়ায় বুগদেল নামক ছোট শহরটি অবস্থিত। কোহেকাফ সম্পর্কে পাক-ভারত উপমহাদেশে বিভিন্ন রকমের রূপকথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। বিশেষ করে শিশুরা একে জিন-পরীর দেশ বলে মনে করে। জানি না কী কারণে গল্পকাররা তাদের রূপকথার জন্যে কোহেকাফকে মনোনীত করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কোহেকাফ পর্বতসারি তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকেও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং মানব-সৌন্দর্যের দিক থেকেও অসাধারণ।

বুগদেল যে পাহাড়ে অবস্থিত, আমরা যখন তার পাদদেশে পৌঁছি, পূর্ণিমার চাঁদ তখন ভরা যৌবনে অবস্থান করছিলো। পাহাড় ও উপত্যকায় জোসনার রূপালী চাদর বিছানো ছিলো। আমাদের গাড়ি পাহাড়ে আরোহণ করতে থাকে।

অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে আলিশান একটি মসজিদের সামনে গাড়ি থেমে যায়। তখন ইশার নামাযের জন্যে সকলে তৈরি ছিলো।

সারাদিনের সফরের কারণে শরীর ছিলো ভীষণ অবসাদগ্রস্ত। তখন কোন সমাবেশে কথা বলার মতো শক্তি ছিলো না। মেযবান তা লক্ষ্য করে সিদ্ধান্তও নিয়েছিলেন যে, প্রস্তাবিত সমাবেশ রাতের পরিবর্তে সকালে করা হবে। কিন্তু নামাযের পর বিরাট এক সমাবেশ জমে বসে। মেযবানগণ কোন বয়ান না করে তাদের সাথে কিছু কথা বলার আবেদন করেন। আমি সমাবেশে গিয়ে দেখি ওলামায়ে কেরাম মিম্বরের পাশে অত্যন্ত আগ্রহ- উদ্দীপনা নিয়ে বসে আছেন। তাদের পাশে সাধারণ মুসলমানগণেরও এক বিরাট সমাগম ছিলো। ওলামায়ে কেরাম গভীর ভালোবাসা ও উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। কতক আলেম সে সব কিতাব নিয়ে এসেছিলেন, যেগুলো তাদের বাপ-দাদাগণ কমিউনিস্ট শাসনামলে জান বাজী রেখে সংরক্ষণ করেন। সেগুলোর মধ্যে কিছু হাতে লেখা কপিও ছিলো। তাঁরা বলেন যে, বুগদেলের এ শহরটি শুরু থেকেই ইলম ও আহলে ইলমদের কেন্দ্র ছিলো। কমিউনিস্ট শাসনকালেও এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে দরস-তাদরীসের ধারা অব্যাহত ছিলো। দাগিস্তানের বেশিরভাগ মুসলমান শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। সুতরাং এখানে ফিক্‌হে শাফেয়ীর কিতাবের পাঠদান করা হয়। এরা সকলে বেশ সাবলীলভাবে আরবীতে কথা বলছিলেন। তাদের সঙ্গে অল্প সময় কথা বলে অনুমিত হয় যে, মাশাআল্লাহ তাঁদের ইলমী যোগ্যতা এবং অধ্যয়ন বেশ মজবুত। প্রথম সাক্ষাতেই আমার মনে হচ্ছিলো যে, আমরা দীর্ঘদিন যাবত পরস্পরের পরিচিত। কথাবার্তা চলার মাঝেই এখানকার সবচেয়ে প্রভাবশালী আলেম শাইখ মুহিউদ্দীন আমাকে বলেন, সাধারণ মুসলমানদের বিরাট সমাবেশ দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনার অপেক্ষায় আছে। তাই অল্প হলেও তাদের উদ্দেশ্যে বয়ান করলে ভালো হয়।

তাদের মহব্বত, ইখলাস ও দ্বীনী জযবার বরকতে তখন ক্লান্তির অনুভূতিও দূর হয়ে গিয়েছিলো। প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত আমি বয়ান করি। একটি দুঃখজনক সংবাদ পেয়েছিলাম যে, রাশিয়ার কিছু তরুণ সৌদি আরব থেকে সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে এসেছে। তারা সেখান থেকে চরমপন্থী ও আবেগী সলফী হয়ে ফিরে এসেছে। দাগিস্তানের বেশিরভাগ আলেম শাফেয়ী মাযহাবের। তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে তাসাওউফের সিলসিলা চলে আসছে। শাফেয়ী মাযহাবে বিদআতের বিষয়ে কিছু ছাড় রয়েছে। এ কারণে সেই তরুণরা এখানে এসে অত্যন্ত কঠোর পন্থা অবলম্বন করে। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর তাকলীদ এবং তাসাওউফের বিরুদ্ধে চরম বিরোধিতা আরম্ভ করে। কেউ কেউ তো এখানকার পুরাতন আলেমদেরকে মুশরিক পর্যন্ত বলতে শুরু করে। যার ফলে এখানকার মুসলমানদের মধ্যে বেশ বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রেক্ষাপটে আমার আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু ছিলো, কমিউনিস্টদের জুলুম-অত্যাচার থেকে মুক্তি লাভের পর রাশিয়ার মুসলমানদের কর্মপদ্ধতি। এ প্রসঙ্গে আমি নিবেদন করি যে, বর্তমানে রাশিয়ার মুসলমানদের মধ্যে ইসলাম ও তার কোন চিহ্ন অবশিষ্ট থেকে থাকলে তা এসকল আলেমের জন্যই রয়েছে। যারা কমিউনিস্ট শাসনকালে অন্ধকার রাতে নিজেদের জান বাজী রেখে ইলমে দ্বীনের প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছেন। তারা নিজেদের জাগতিক স্বার্থ ও আরাম-আয়েশকে কুরবানী করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে দ্বীন ও ঈমান সংরক্ষণ করেছেন। তাই যুবক মুসলমানদের এ সকল আকাবিরের মূল্য অনুধাবন করা উচিৎ। তাদের একথা কখনই ভুলে যাওয়া উচিৎ নয় যে, দ্বীনের শাখা বিষয়ে মতবিরোধ সব যুগেই ছিলো। কিন্তু তার ভিত্তিতে একে অপরের বিরুদ্ধে কুফর ও শিরকের ফাতাওয়া দেয়ার ফায়দা ইসলামের শত্রুরাই কেবল লাভ করবে। বর্তমানে রাশিয়ার অবস্থা এই যে, প্রায় পঁচাত্তর বছর পর্যন্ত ইসলাম ও তার নিদর্শনসমূহকে নিশ্চিহ্ন করার যে প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো তার ফলে সাধারণ মুসলমানগণ দ্বীনের মৌলিক শিক্ষা থেকেও বঞ্চিত। তাদের এখন দ্বীনের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ পরিবেশে যদি 'ইস্‌তিওয়া আলাল আরশ' এবং 'তাকলীদ'-এর মাসআলা নিয়ে এখানে মতবিরোধের বীজ বপন করা হয়, তাহলে দ্বীনের ক্ষতি করার এর চেয়ে বড়ো আর কোন ফেতনা হতে পারে না। তাই সাধারণ মুসলমানদের জন্যে একমাত্র নিরাপদ পথ হলো, আকাবির ওলামার সঙ্গে তারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখবেন। কোন বিষয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলেও নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের পরিবর্তে সমঝোতার মাধ্যমে তা সমাধান করা উচিত।

আলহামদুলিল্লাহ। এ বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শোনা হয়। পরে লোকেরা জানায় যে, যুবকদের মধ্যেও এ বয়ানের ভালো প্রভাব পড়েছে। ওলামায়ে কেরামও তৃপ্তি প্রকাশ করেন যে, আলহামদুলিল্লাহ, বয়ানটি খুব উপযুক্ত ও উপকারী হয়েছে।

পরদিন সকালে আমার অবস্থানস্থলে বুগদেলের কিছু প্রভাবশালী আলেম তাশরীফ আনেন। শাইখ মুহাম্মাদ রমাযান সাম্মাখীও তাদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে হাসিউতে সাক্ষাত হয়েছিলো। দীর্ঘ সফর করে তিনি এখানে এসেছেন। এসকল আলেমের মধ্যে শাইখ ইয়াহইয়া ছাড়া আর কারও সম্পর্কে আমার ভালো ধারণা ছিলো না। অপরদিকে এখানকার বর্তমান পরিবেশে যে সমস্ত অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে তার ভিত্তিতে এদের অন্তরে একটি আশংকা জাগা সহজাত বিষয় ছিলো যে, এ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে কোন বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্যে আসেনি তো। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে তারা অত্যন্ত আদবের সঙ্গে আকীদা ও মতাদর্শের বিষয়ে এমন আঙ্গিকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন, যেন তারা

এসব মাসআলার সমাধান জানতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমার ধারণা হলো, এসব প্রশ্নের উদ্দেশ্য আমার আকীদা ও মতাদর্শ পরখ করা। এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে তাদের আনন্দ ও আবেগের কোন সীমা ছিলো না।

এ সময় আমি বড়ো ধরনের একটি ভুল বোঝাবুঝির নিরসন জরুরী মনে করি। রাশিয়ার মতো দেশসমূহ যে ধরনের অবস্থা অতিক্রম করছে, তার ভিত্তিতে আমার মতে সে সব দেশে তাবলীগ জামাতের কাজ অধিকতর উপকারী। কিন্তু এসব অঞ্চলের আলেমগণের মধ্যে কিছুদিন যাবৎ তাবলীগ জামাতের ব্যাপারে কিছু ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হচ্ছে। যে কারণে এখানে তাবলীগ জামাতের কাজ করতে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। কতক জায়গায় তো এ কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। সে কারণটি এই যে, আমি উপরে উল্লেখ করেছি- এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী। নকশবন্দী সিলসিলার তাসাওউফের সঙ্গে এখানকার আলেম ও জনসাধারণ শত শত বছর ধরে সম্পৃক্ত। কিছু অতি উৎসাহী সলফী যুবক এখানে তাকলীদ, তাসাওউফ ও প্রচলিত অনেক প্রথার বিরুদ্ধে মারাত্মক কঠোর পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এখানের আলেমদের সম্পর্কে গোমরাহী বরং শিরকের ফাতাওয়া পর্যন্ত লাগেছে। তাদেরই কিছু যুবক তাবলীগ জামাতের নামেও কাজ করতে আরম্ভ করে। এর ফলে ওলামায়ে কেরাম তাবলীগ জামাতকেও তাদের মতো কট্টরপন্থী মনে করে এর বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন।

এ মজলিসে আমি তাবলীগ জামাতের মূলনীতি ও তার কর্মপদ্ধতির উপর আলোকপাত করি। আমি বলি যে, কিছু মানুষ যদি এ সব ব্যাপারে কোন কঠোরতা করে থাকে তা তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। কোনভাবেই তাকে তাবলীগ জামাতের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় না। তাবলীগ জামাতের মূলনীতিই হলো দ্বীনের মৌলিক শিক্ষাকে ব্যাপক করা। সর্বসম্মত বিষয়সমূহের দাওয়াত ও তাবলীগকে নিজেদের কাজের কেন্দ্রবিন্দু বানানো। এ ধরনের কঠোর কর্মপন্থা তাবলীগ জামাতের মূলনীতির পরিপন্থী। আলহামদুলিল্লাহ, এ সব বিষয়ে আলোকপাত করার পর তাদের মন পরিষ্কার হয়ে যায়। তারা আগামীতে তাবলীগ জামাতের সাথে সহযোগিতা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

আমি আমার এ সফরে এমন কিছু বিষয় দেখেছিলাম, যেগুলো সম্পর্কে পরামর্শ দেয়ার ইচ্ছা ছিলো। যেমন, এখানের সব জায়গায় প্রচলন রয়েছে যে, জামাত খাড়া হওয়ার সময় ইমাম উচ্চ স্বরে 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' বলে। জামাত শেষে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকারের যিকিরের ইহতিমাম করা হয়। উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে কোন একজন কুরআন তেলাওয়াত করে। তারপর সম্মিলিতভাবে দোয়া হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত জামাতের সবাই বসা থাকে। সবগুলো মসজিদে পরিপূর্ণ আবশ্যকীয়ভাবে এগুলো পালন করা হয়।

সেখানকার আলেমগণ বলেন, এগুলোর কিছু কিছু বিষয়কে শাফেয়ী মাযহাবে মুস্তাহাব সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমি উপস্থিত আলেমগণের নিকট নিবেদন করি যে, আপনারা ইহতিমামের সাথে যে সমস্ত যিকির করে থাকেন, সেগুলো যথাস্থানে অত্যন্ত বরকতময়। কিন্তু প্রত্যেক নামাযের আগে-পরে গুরুত্বের সাথে ও আবশ্যকীয়ভাবে পালন করায় মানুষের মনে এ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় যে, এগুলো নামাযের জরুরী অঙ্গ। কোন মুস্তাহাব আমলকেও এমন পর্যায়ে জরুরী ও আবশ্যকীয় করে নেওয়া- যার দ্বারা তা ওয়াজিব ও আবশ্যকীয় হওয়ার ধারণা সৃষ্টি হতে থাকে- শরীয়তে জায়েয নেই। তাই আপনারা এমন আবশ্যকীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বানিয়ে নেয়াকে পরিহার করার বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করুন। আমার এ কথাগুলো উপস্থিত সমস্ত আলেম অত্যন্ত খুশিমনে গ্রহণ করেন। তারা বলেন, বাস্তবিকই এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। কমপক্ষে মাঝে মাঝে তা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মানুষের সামনে এটি পরিষ্কার করা উচিত যে, এগুলো নামাযের আবশ্যকীয় অংশ নয়।

এটি সীমিত পরিসরের একটি মজলিস ছিলো। যেখানে শুধুমাত্র সে সমস্ত ওলামা-মাশায়েখ অংশ নিয়েছিলেন, যাঁরা তরুণ আলেমগণের জন্যে মাননীয় পর্যায়ের। সে অঞ্চলের সমস্ত আলেমের সমন্বয়ে বড়ো একটি সমাবেশ তখনও বাকী ছিলো। কিন্তু সেদিন বিকেলেই যেহেতু বিমানযোগে আমাদেরকে মস্কো যেতে হবে। এজন্যে সফরের ব্যবস্থাপকগণ বিমানবন্দরের নিকটবর্তী কোন জায়গায় এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত করা মোনাসেব মনে করেন। তাই তারা 'কেসপিস্ক' নামক শহরের একটি মসজিদে এ সমাবেশের আয়োজন করেন। যা মাখাশকালা বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কিন্তু বুগদেল থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে শাইখ মুহিউদ্দীন সাহেব তাঁর এক মাদরাসায় নিয়ে যান। মাদরাসাটির নাম 'ইমাম নববী' মাদরাসা। সেখানে কমবেশি সে সকল কিতাবই পাঠ্য, যা হাসিউতে শাইখ ইয়াহইয়ার জামিয়া আল ইমাম আবুল হাসান আল আশআরীর সিলেবাস। এখানে উস্তায ও ছাত্রগণকে দরস-তাদরীসে মশগুল দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। বুগদেল শহরে চলাফেরা করতে স্পষ্টভাবেই অনুভূত হয় যে, এটি আমলদার মুসলমানদের একটি শহর। মানুষের চেহারায় ইসলামী নিদর্শনের উপস্থিতি উদ্ভাসিত। মহিলাদের মধ্যে অনেকটাই পর্দার অনুবর্তিতা চোখে পড়ে। এ সব কিছু ঐ সমস্ত আলেমের কোরবানীর ফল, যাঁরা বিভিন্ন প্রকারের ঝুঁকি নিয়ে প্রাণাধিক দ্বীন ও ইলমের সংরক্ষণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি রহম করুন এবং তাঁদেরকে বিরাট পুরষ্কারে ভূষিত করুন।

এখান থেকে প্রায় দুই ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে আমরা কেসপিস্ক (Kespisk) শহরে প্রবেশ করি। শহরের আলিশান কেন্দ্রীয় মসজিদে ওলামায়ে

কেরামের বড়ো একটি সমাবেশ আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ব্যবস্থাপকগণ এখানে বয়ানের পরিবর্তে শুধুমাত্র প্রশ্নোত্তরের আয়োজন করেছিলেন। এতদঞ্চলের ওলামায়ে কেরাম সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা দেশে সংঘটিত বিভিন্ন মাসআলা সম্পর্কে বেশিরভাগ ফিক্হ বিষয়ক প্রশ্ন করেন। প্রায় দুই ঘণ্টা এ ধারা অব্যাহত থাকে। যোহরের নামাযের সময় তা সমাপ্ত হয়। নামাযের পর মেযবানগণ আমাদেরকে নিকটবর্তী একটি বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে দুপুরের খানার আয়োজন করা হয়েছিলো। শাইখ মুহিউদ্দীন বলেন যে, কমিউনিস্ট শাসনামলে এ বাড়িতে একজন বড়ো শাইখ বাস করতেন। তিনি এখানে লুকিয়ে লুকিয়ে পাঠদানের ধারা অব্যাহত রাখেন। তিনি নিজেও এ বাড়িতে তাঁর থেকে পাঠ গ্রহণ করেছেন।

কেসপিস্ক ছোট একটি সুন্দর শহর। যা কাস্পিয়ান (Caspian) সাগরের তীরে অবস্থিত। আছরের নামাযের পর বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে মেযবানগণ আমাদেরকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যপূর্ণ একটি উপকূলে নিয়ে যান। সম্মুখে কাস্পিয়ান সাগরের নীলাভ ঢেউ উপকূলের সঙ্গে খেলা করছিলো। প্রাচীন ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থে এ সাগরটিকে কখনো 'খাযির' সাগর, কখনো 'কাযবীন' সাগর এবং বর্তমানে এটি কাস্পিয়ান উপসাগর নামে প্রসিদ্ধ। অসম্ভব নয় যে, কাস্পিয়ান 'কাজবীনে'রই বিকৃত রূপ। এটি ঐ সমস্ত সমুদ্রের অন্যতম, যেগুলোর বড়ো কোন সাগরের সঙ্গে যোগসূত্র নেই। ভৌগলিক পরিভাষায় যেগুলোকে (Inland Seas) বা অভ্যন্তরীণ সাগর বলা হয়। এ ধরনের সাগরের মধ্যে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সাগর। যার ব্যস উত্তর-দক্ষিণে ১২০০ কিলোমিটার বিস্তৃত। গড় প্রস্থ ৩২০ কিলোমিটার। এর মোট আয়তন ৩৭১০০০ বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রের প্রায় ৮০ শতাংশ রাশিয়ার মধ্যে। যা ইউরোপের পূর্ব-দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। অবশিষ্টাংশ ইরানে বিস্তৃত। 'কাজবীন' ইরানের একটি শহরের নাম। যা এ সাগরের তীরেই অবস্থিত। এ শহরটির কারণে একে কাজবিন সাগরও বলা হয়। রাশিয়ার বিখ্যাত 'বুলগা' নদীও এ সমুদ্রে এসে পতিত হয়। কেসপিস্ক শহরের নামও মূলত এ সাগরের রাশিয়ান নামের ভিত্তিতেই রাখা হয়েছে।

ভ্রমণের জন্যে সমুদ্রতীরে একটি পথ বানানো হয়েছে। সেখান থেকে সমুদ্রের দৃশ্য খুব সুন্দর দেখা যায়। আমরা সেখানে পৌঁছলে বরফ শীতল বায়ু আমাদেরকে স্বাগত জানায়। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ থেকে ঝিরঝিরে বৃষ্টিও শুরু হয়। যে কারণে আমাদের কাফেলা বেশি সময় এ দৃশ্য উপভোগ করতে পারেনি। আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। বুগদেল ও আশেপাশের অনেক আলেম বিদায় জানানোর জন্যে বিমানবন্দর পর্যন্ত আসেন। বিমানে আরোহণের জন্যে আহবান করার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন মাসআলা নিয়ে আলোচনা

চলতে থাকে। প্রত্যেকের পক্ষ থেকে ভালোবাসা প্রকাশের নিত্য নতুন আঙ্গিক সামনে আসতে থাকে। যাদের সঙ্গে মাত্র দু'-তিন বার দেখা হয়েছে, তাদের সম্পর্কে মনে হচ্ছিলো যেন কতো বছর যাবত তাদের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে। অবশেষে তাদের ভালোবাসার গভীর চিত্র হৃদয়ে ধারণ করে আমরা বিমানে আরোহণ করি।

তাতারিস্তানের সফর

সফরের যে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয়েছিলো সে মতে আমাদের পরবর্তী মঞ্জিল ছিলো রাশিয়ার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ তাতারিস্তান। কিন্তু দাগিস্তান থেকে তাতারিস্তানে সরাসরি কোন বিমান ছিলো না। এ কারণে মস্কোতে ফিরে যাওয়া জরুরী ছিলো। সুতরাং আমরা মাখাশকালা বিমানবন্দর থেকে বিমানে আরোহণ করে আড়াই ঘণ্টায় মস্কো পৌঁছি। সে রাতেই ট্রেনযোগে তাতারিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত ছিলো। সারা রাত ট্রেনে সফর করে ভোরে তাতারিস্তানের রাজধানী 'কাযান' পৌঁছা যাবে। আমরা মস্কো বিমানবন্দরে অবতরণ করার পর সোজা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছি। সেখানে অত্যাধিক লম্বা একটি ট্রেন কাযান যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ছিলো। মস্কোতে বরফপাত হচ্ছিলো। তাপমাত্রা ছিলো শূন্য থেকে তিন ডিগ্রী নিচে। আমরা প্লাটফর্মে আযান-ইকামতসহ জামাতের সাথে ইশার নামায আদায় করি। তারপর ট্রেনে আরোহণ করি। আজ চাঁদের চতুর্দশী রাত। চাঁদ পুরো জৌলুসের সাথে উদ্ভাসিত। ট্রেন মস্কোর শহরতলী থেকে বের হয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রবেশ করে। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূমি বরফের সাদা চাদরে ঢাকা। পূর্ণিমার চাঁদ তার উপর রূপালী জোসনা বিকিরণ করছে। মাঝে মাঝে রেললাইনের উভয়দিকে উচুঁ উচুঁ বৃক্ষসারি আসছে। সেগুলোও আপাদমস্তক বরফাচ্ছাদিত। পুরো পরিবেশেই যেন বরফের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। এ তুষার পরিবেশে ট্রেন সম্মুখপানে ধেয়ে চলছে।

এরফান জান সাহেব ও মস্কোর আব্দুস সালাম সাহেব ছাড়া সাইবেরিয়ার তরুণ আলেম শাইখ যাকিরও মস্কো থেকে দোভাষী হিসেবে আমার সঙ্গে রয়েছেন। চার বার্থবিশিষ্ট একটি বগির মধ্যে আমরা চারজন সফর করছি। যাকির সাহেব তার দেশ সাইবেরিয়ার বিভিন্ন ঘটনা শোনাতে থাকেন। সাইবেরিয়া মূলত বেশ কয়েকটি প্রদেশের সমন্বয়ে বিশাল-বিস্তৃত একটি অঞ্চল। রাশিয়ার উত্তরের শেষ প্রান্তে এটি অবস্থিত। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমে ইউরোপ থেকে জাপান পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। যাকির সাহেব বলেন যে, সাইবেরিয়ার প্রত্যেক প্রদেশে বিরাট সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী রয়েছেন। কিন্তু এ বিশাল-বিস্তৃত অঞ্চলে একজন আলেমও নেই। যাকির সাহেবের ইলমে দ্বীন শিক্ষা করার আগ্রহ সৃষ্টি হলে তিনি তিউনিস চলে যান। সেখানে জামিয়া যাইতুনা থেকে বিভিন্ন উস্ত

াযের কাছে ইলম অর্জন করেন। এ কারণেই তিনি মাশাআল্লাহ বেশ সাবলীলভাবে আরবী বলে থাকেন। কিন্তু তার শিক্ষা ছিলো অবিন্যস্ত ধরনের। এখন তিনি আমাদের দারুল উলূমে এসে প্রচলিত ইলমসমূহে অধিক গভীরতা ও দক্ষতা অর্জনের ইচ্ছা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ভিসা লাভের চেষ্টা করছেন। তার মুখে সাইবেরিয়ার অবস্থা শুনে অন্তরে গভীর প্রভাব সৃষ্টি হয় যে, এ বিশাল-বিস্তৃত অঞ্চলটি দ্বীনের তা'লীম-তাবলীগের কতো মুখাপেক্ষী। আর আমরা এ ব্যাপারে কতো উদাসীন!

ট্রেনে আমাদের চারজনেরই ঘুমানোর উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিলো। কিছু সময় আমরা ঘুমিয়ে নেই। ভোরে উঠে ট্রেনের মধ্যেই ফজরের নামায আদায় করি। ট্রেন তখন তাতারিস্তানের সীমানায় প্রবেশ করেছে। তাতারিস্তান রাশিয়ার একটি বড়ো প্রদেশ। মুসলমানগণ এখানকার জনসংখ্যার ৫২%। এরা সকলে হানাফী মাযহাবের অনুসারী। এখানে বসবাসকারীদেরকে 'তাতারী' বলা হয়। এ নামের কারণে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় যে, সম্ভবত এরা চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের বংশধর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এ অর্থে 'তাতারী' নয়। এরা মূলত বুলগেরিয়ার অধিবাসী। তাদের প্রধান শহর ছিলো বুলগেরিয়া। যার কিছুটা পরিচিতি আমার নরওয়ের সফরনামা 'আধী রাত কী সুরাজ' (রাতের সূর্য)-এর মধ্যে তুলে ধরেছি। তাতারীদের ধ্বংসযজ্ঞের সময় চেঙ্গিস খান ও তার সৈন্যবাহিনী যেভাবে অনেক মুসলমান দেশকে ধ্বংস করে, তেমনিভাবে বুলগেরিয়ার এ লোকগুলোও তাদের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। কিন্তু তাতারী ফেতনার সমাপ্তি এবং মঙ্গোলিয়ার শাসন বিলুপ্তির পর তাদের উপর রাশিয়ানরা আক্রমণ করে। যে কারণে তাদের মধ্যে ও রাশিয়া সরকারের মধ্যে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। তাদের ভাষায় 'তাতার' শব্দের অর্থ জংলী। রাশিয়ানরা বদনাম করার জন্যে তাদেরকে 'তাতার' বা জংলী আখ্যা দেয়। প্রথমদিকে তারা এ নাম একেবারেই অপছন্দ করতো। কিন্তু রাশিয়ানরা এতো কঠোরভাবে অবিরাম তাদেরকে 'তাতার' আখ্যা দিতে থাকে যে, ক্রমান্বয়ে তারা এ নামেই প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। এখন তারা নিজেরাও নিজেদেরকে 'তাতারী' বলে এবং নিজেদের প্রদেশকে বলে 'তাতারিস্তান'।

কাযান শহরে

সকাল আটটার দিকে আমাদের ট্রেন তাতারিস্তানের রাজধানী কাযানে পৌঁছে। যা মস্কো ও সেন্টপেট্রিস বুর্গ (সাবেক লেনিনগ্রাদ)-এর পর রাশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। কাযান থেকে অল্প দূরেই প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর বুলগেরিয়া অবস্থিত। সেখানে মুসলমানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিলো। তাতারী ফেৎনার সময় তাতারীরা তা ধ্বংস করে তার স্থলে কাজান শহর আবাদ করে।

বুলগেরিয়ার অনেক অধিবাসীও এখানে স্থানান্তরিত হয়। পরে ধীরে ধীরে তাতারীদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে এবং মূল বুলগেরিয়ান মুসলমানগণ এখানে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। রাশিয়ার জার সরকার বার বার তাদের উপর আক্রমণ করতে থাকে। অবশেষে ১৫৫২ ঈসায়ীতে জার রুশ এর উপর পরিপূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে একে রাশিয়ার অংশ বানিয়ে নেয়। জনাব জাভেদ হাজারবী কয়েকটি কারণে আমাদের সঙ্গে দাগিস্তান না গিয়ে মস্কো থেকে সোজা কাযান চলে আসেন। তিনি আমাদের আগে এসে কাযানে আমাদের দু'দিনের অবস্থানের প্রোগ্রাম তৈরি করেন। তিনি স্থানীয় অনেক মেযবানসহ রেলওয়ে স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। শহরের সুন্দর এক পরিবেশে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। মেযবানগণ বাড়িটি আমাদের জন্যে খালি করে দিয়েছিলেন। এখানে কিছু সময় বিশ্রাম করার পর দশটার সময় তাতারিস্তানের মুফতী শাইখ ওসমান সাহেবের সঙ্গে তাঁর দফতরে সাক্ষাত করার সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। সুতরাং আমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। তাঁর দফতরটি ঐতিহাসিক এ শহরের ঐতিহাসিক একটি মসজিদের সীমানায় অবস্থিত। যাকে 'মারজানী' মসজিদ বলা হয়। মসজিদটি ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর এক মহান ফকীহ্ আল্লামা শিহাব উদ্দীন হারুন আল মারজানী রহ.-এর অবস্থানস্থল হওয়ার কারণে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত করে এ নাম রাখা হয়। আল্লামা মারজানী রহ. কাযানেরই অধিবাসী ছিলেন। ফিকহ বিষয়ে তাঁর অনেকগুলো কিতাব ওলামায়ে কেরামের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তার মধ্যে উসূলে ফিকহের পাঠ্যপুস্তক 'তাওযীহ'-এর উপর তাঁর পাদটীকা রয়েছে। হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর 'তাকরীরে তিরমিযী'র মধ্যে এর উদ্ধৃতি এসেছে। তাছাড়া যে সব অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে দিগন্তলালিমা অস্ত যায় না (কাযানও তার অন্তর্ভুক্ত) সেখানে ইশার নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিতাব 'নাযুরাতুল হক' আলেমগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ। আমি 'তাকমিলায়ে ফাতহুল মুলহিমে'র শেষ খন্ড রচনাকালে এ কিতাব দ্বারা খুব উপকৃত হয়েছি। এ বুযুর্গ এ মসজিদকেই তাঁর ফয়েয বিতরণের কেন্দ্র বানিয়েছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ১২৩৩ হিজরীতে, আর ইনতিকাল হয় ১৩০৬ হিজরীতে। (আল আ'লাম, যারকালী কৃত, ৯/৩৯, মু'জামুল মুয়াল্লিফীন, ওমর রেযা কাহহালা কৃত, ১৩/১২৮)

কমিউনিস্ট শাসনামলে মসজিদটি জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। স্বাধীনতা লাভের পর এখন তা পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

মসজিদের সীমানায় তাতারিস্তানের মুফতী সাহেবের দফতর। আজকাল শাইখ ওসমান এ পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে আরবী বলেন। বিদ্যানুরাগী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত উৎফুল্ল ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। অত্যন্ত উষ্ণ ভালোবাসার সঙ্গে স্বাগত জানান। তিনি বলেন যে,

আলহামদুলিল্লাহ্! স্বাধীনতা লাভের পর তাতারিস্তানে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দ্বীন ও ইলমের দিকে মুসলমানদের প্রত্যাবর্তন আরম্ভ হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনকালে পুরো প্রদেশে মাত্র ১৬টি মসজিদ ছিলো। আর তাও ছিলো বিরান। এখন মাশাআল্লাহ মসজিদের সংখ্যা ১৩০০ অতিক্রম করেছে। কোন সপ্তাহ এমন যায় না, যখন আমাকে কোন না কোন মসজিদ উদ্বোধনে যেতে হয় না। মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এখন খোদ মুফতী ওসমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে মারজানী মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুফতী সাহেব মাদরাসা ঘুরিয়ে দেখান এবং সেখানকার উস্তায ও ছাত্রদের সঙ্গে মোলাকাত করান। দেখে অনুমান হয় যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে মাদরাসাটি তার সামর্থ্য মতো মুসলমান তরুণদের তা'লীম-তারবিয়াতের দায়িত্ব সম্পাদন করছে।

মুফতী ওসমান সাহেব বলেন যে, এখানকার মুসলমানগণ ব্যাংকের সাথে সুদী লেনদেনে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে আছে। তার একান্ত বাসনা ও চেষ্টা হলো, এমন কোন পথ বের করা, যার দ্বারা মুসলমানদেরকে সুদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা যায়। এ বিষয়ে তাঁর সহকারীগণ কতক ব্যবসায়ীর সাথে কথা বলছে। তবে এ বিষয়ে তাঁর দিকনির্দেশনা প্রয়োজন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন যে, তাদের সঙ্গে আমার একটি সাক্ষাত হলে কাজের প্রাথমিক খসড়া চূড়ান্ত করা সম্ভব হতো। জনাব জাভেদ হাজারবী সাহেব কাযান থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে একটি শহরে আমার পরের দিনের প্রোগ্রাম নির্ধারণ করেছিলেন। তবে মুফতী সাহেবের এ ইচ্ছাকে সামনে রেখে তিনি ঐ প্রোগ্রামকে রহিত করতে সম্মত হন। পরের দিন সকাল দশটায় সে দফতরেই তাদের সঙ্গে একটি পরামর্শ বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়।

কাযান শহরের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে জামিয়া ইসলামিয়া নামে সরকারী ব্যবস্থাপনায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। সেখানকার ভাইস চ্যান্সেলরের আগ্রহে জাভেদ হাজারবী সাহেব যোহরের নামাযের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের হলকক্ষে ছাত্র ও শিক্ষকগণের উদ্দেশ্যে আমার একটি বয়ানের সিদ্ধান্ত নেন। এখানে আরবী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টা বয়ান হয়। শাইখ যাকির সাহেব তার তরজমা করেন। সাধারণত সরকারী বিশ্ব বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা কেবল একটি দর্শনের রূপ নিয়েছে। বাস্তব জীবনে তার রূপায়ণ খুব কম হয়ে থাকে। বিশেষ করে ইত্তিবায়ে সুন্নাতের উপর যে গুরুত্ব দেয়া দরকার, তাতে খুব অবহেলা চোখে পড়ে। এ কারণে আমার বয়ানের বিষয়বস্তুই ছিলো- ইলমে দ্বীন কী জিনিস এবং তা অর্জনের কী কী শর্ত ও চাহিদা রয়েছে? আলহামদুলিল্লাহ্, বয়ানটি মনোযোগ সহকারে শোনা হয়। তারপর ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান। বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিপূর্বে মুফতী ওসমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে

পরিচালিত হতো। কিন্তু কিছুদিন যাবত এর ব্যবস্থাপনা বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়াও আধুনিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। এ নতুন ব্যাবস্থাপনায় অসন্তুষ্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২জন সুযোগ্য শিক্ষক ইস্তফা দেন। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি দোদুল্যমান অবস্থায় রয়েছে। বর্তমানে তাতে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান অনেকটাই স্থবির হয়ে পড়েছে। আমি ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবকে পরামর্শ দেই যে, তিনি যেন পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান বের করেন এবং শিক্ষকদের অসন্তুষ্টির কারণ দূর করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেন।

মাগরিবের নামায আমাদেরকে কাযান শহরের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক কুলশরীফ মসজিদে পড়তে হবে। সেখানেই কাযানের জেলা জজ শাইখ রুস্তম ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। তাই মাগরিবের কিছু পূর্বেই আমরা সে মসজিদের উদ্দেশ্য রওয়ানা হই।

কাযান অতি সুন্দর একটি শহর। সুপ্রশস্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সড়ক। ভবনসমূহও বেশ পরিচ্ছন্ন। শহরটিকে আল্লাহ তাআলা নৈসর্গিক সৌন্দর্যও দান করেছেন। রাশিয়ার বিখ্যাত বলগা নদীর তীরে এটি অবস্থিত। শহরের বিভিন্ন অংশে প্রাকৃতিক ঝিল ও উচুঁ উচুঁ বৃক্ষ অন্যরকম সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। এটি রাশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্প নগরী। এখানে তেল শোধনাগার থেকে শুরু করে চামড়া, সাবান ও খাদ্য সামগ্রীর বড়ো বড়ো কারখানা রয়েছে। এখানকার সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার মানের দিক থেকে পুরো রাশিয়াতে বিখ্যাত। এখানে টলষ্টয় ও লেনিনের মতো লোকেরা শিক্ষা লাভ করেছেন। (যদিও ছাত্রদের মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করার কারণে লেনিনকে এখান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিলো।)

শহরের বিভিন্ন এলাকা অতিক্রম করে আমরা ঐ দুর্গের নিকট পৌঁছি, যার সীমানার মধ্যে কুলশরীফ মসজিদ অবস্থিত। দুর্গটি একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত। এখান থেকে পুরো শহর দেখা যায়। এটি সেই দুর্গ, যার ছত্রছায়ায় মুসলমানগণ বহুবছর যুদ্ধ চালিয়ে যান। অবশেষে ১৫৫২ ঈসায়ীতে রাশিয়া পরিপূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করে। আমরা দুর্গের সীমানায় প্রবেশ করে কুলশরীফ মসজিদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় লাউড স্পিকারে অত্যন্ত হৃদয়কাড়া মাগরিবের আযান শুরু হয়। কুলশরীফ ছিলো মুসলমানদের সেই সেনাপতির নাম, যিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে রাশিয়ানদের মোকাবেলা করেন। তাঁর নামেই এখানে একটি পুরাতন মসজিদ ছিলো। স্বাধীনতা লাভের পর তা ভেঙ্গে ফেলে সে নামেই একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটি সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও নক্শার দিক থেকে বাস্তবিকই বিশ্বের ব্যতিক্রমী

মসজিদসমূহের অন্যতম। চারটি মিনারবিশিষ্ট এ মসজিদ দূর থেকে এতো সুন্দর দেখা যায় যে, প্রথম দৃষ্টিতেই তার উপর চোখ আটকে যায়। ভিতরে প্রবেশ করলে পদে পদে এর সুরুচীর জন্যে স্থপতিকে সাধুবাদ দিতে হয়। মাগরিব নামায আমরা এ মসজিদেই আদায় করি। কাযানের তরুণ মুফতী ও বিচারপতি কাজী রুস্তম সাহেব এখানকার ইমাম। তিনি জামিয়া ইসলামিয়া মদীনা থেকে লেখাপড়া করেছেন।

এ সুবাদে তিনি আগে থেকেই আমার সম্পর্কে জানতেন। তিনি অত্যন্ত মহব্বত ও শ্রদ্ধার সাথে তাঁর পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি অফিসে নিয়ে যান। যার বিশাল-বিস্তৃত কাচেঁর জানালা ভেদ করে নীচের আলোঝলমল শহর দেখা যাচ্ছিলো।

মুফতী রুস্তম সাহেব আরও কিছু আলেম একত্রিত করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ হয় এবং স্থানীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কল্যাণকর আলোচনা হয়। ইশার কিছু পূর্বে আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হই। ইশার নামায আমাদেরকে শহরের বেলুনানি মসজিদে পড়তে হবে। সেখানে সাধারণের উদ্দেশ্যে আমার বয়ানের ঘোষণা হয়েছিলো। সুতরাং ইশার নামাযের পর প্রায় এক ঘণ্টা আরবীতে বয়ান হয়। রুস্তম নামের কাযানের অপর এক তরুণ রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমার সাথে ছিলেন, তিনি স্থানীয় ভাষায় তা তরজমা করেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে মসজিদটি তাবলীগ জামাতের কেন্দ্র। আলহামদুলিল্লাহ, সেখানে ভালোভাবে কাজ হচ্ছে। আমি বয়ানের মধ্যে সাধারণ মুসলমানদেরকে তাবলীগ জামাতমুখী হওয়ার পরামর্শ দেই। পরবর্তীতে কেউ কেউ এ বিষয়ে প্রশ্নও উত্থাপন করেন। আলহামদুলিল্লাহ, তারা উত্তর পেয়ে পরিতৃপ্ত হন। এভাবে কাযানে প্রথমদিনের ব্যস্ততা সমাপ্ত হয়। শূন্য ডিগ্রীর মনোমুগ্ধকর সে রাতটি আমরা কাযানেই অতিবাহিত করি।

ফজর নামাযের পর আমার আধা ঘণ্টা দ্রুত পায়ে প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস রয়েছে। দাগিস্তানের অবস্থান ও গতরাতের রেল সফরে সে সুযোগ আমার হয়ে ওঠেনি। কাযানে আমাদের অবস্থান ছিলো অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে। সড়কের ওপারে লম্বা লম্বা চীড় বৃক্ষের নিবিড় বনের মধ্যে পায়ে হাঁটার সুন্দর পথ ছিলো। ফজরের পর আমরা যখন বাইরে বের হই, তখন তাপমাত্রা ছিলো শূন্যের চেয়েও কয়েক ডিগ্রী নিচে। বনের মাটি ছিলো রাতে পতিত সাদা তুষারে আবৃত। গরম কাপড় পরে তুষার পরিবেশের এ প্রাতঃভ্রমণ সকল সাথীই উপভোগ করেন।

পূর্ব ওয়াদা মোতাবেক আমরা দশটার সময় পুনরায় মারজানী মসজিদে উপস্থিত হই। যেখানে সুদবিহীন অর্থবিনিয়োগ বিষয়ে পরামর্শ বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। ততক্ষণে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে গিয়েছিলো। তুলার মতো সাদা

ছোট ছোট তুষার দ্বারা চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। আমরা যখন গন্তব্যে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামি, তখন তুষারের সাদা চাদর তাকে ঢেকে নিয়েছিলো।

মুফতী ওসমান সাহেবের অফিসে প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ পরামর্শ বৈঠক চলতে থাকে। দেশে সুদবিহীন অর্থায়নের সূচনার জন্যে সম্ভাব্য বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয়। রাশিয়ার আইনগত কাঠামোতে যে পদ্ধতিটি আমার নিকট তুলনামূলক সহজ ও উত্তম মনে হচ্ছিলো, আমি সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করি। বৈঠকে আলেমগণ ছাড়া অর্থনীতিবিদগণও উপস্থিত ছিলেন। তারা অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করে এনেছিলেন। আমি একটি একটি করে সেগুলোর জবাব দেই। অবশেষে একটি কর্মপন্থা চূড়ান্ত হয়। সে অনুপাতে অর্থনীতিবিদগণ কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। উপস্থিত সকলে এ বৈঠকের আলোচনায় অত্যন্ত আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত হন। যে কাজের জন্যে দীর্ঘ দিন ধরে তারা চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। তার একটি পন্থা চূড়ান্ত হয়।

যোহরের নামাযের পর মুফতী ওসমান সাহেব মারজানী মসজিদের পিছনের একটি হালাল রেষ্টুরেন্টে আমাদের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। সেখানে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও দাওয়াত করা হয়। তাতে তাতারিস্তানের বিশেষ বিশেষ খাবারের বৈচিত্রময় সমাবেশ ছিলো। বিশেষ করে দুম্বার গোস্ত তৈরী করার নিত্যনতুন পদ্ধতি সেখানে তুলে ধরা হয়। যার স্বাদ ছিলো সারা জীবন মনে রাখার মতো। খাবারের সময়ও স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হতে থাকে। বিশেষ করে সুদমুক্ত অর্থায়নের যে পদ্ধতি পরামর্শ বৈঠকে নির্ধারিত হয়েছিলো, উপস্থিত লোকদেরকে সে সম্পর্কে অবগত করা হয়। তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আরও মত বিনিময় হয়। এ মৌসুমে সেখানে আছরের নামায হচ্ছিলো আড়াইটায়। খানা খাওয়ার পর আছরের নামায আদায় করে আমরা অবস্থানস্থলে পৌঁছি। ইতিমধ্যে তুষার পুরো শহরকে ঢেকে নিয়েছে। মেযবানগণ আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় করেন যে, আজকের প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরের শহরটির প্রোগ্রাম আমরা রহিত করেছিলাম। অন্যথায় তুষারপাতের কারণে এ সফর অত্যন্ত কঠিন হতো। কিন্তু অবস্থানস্থলে পৌঁছার পর দরজায় বেল বেজে ওঠে। জানতে পারলাম যে, ঐ শহর থেকে এক ব্যক্তি সাক্ষাত করতে এসেছেন। আমার প্রোগ্রাম রহিত হওয়ার সংবাদ শুনে তিনি সেখান থেকে চলে এসেছেন। পাঁচ ঘণ্টার বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে তিনি এখানে এসেছেন। এ ব্যক্তির অন্তরে দ্বীনের যে তলব রয়েছে, তা ছিলো অত্যন্ত মূল্যায়নযোগ্য। তাঁকে কিছু সময় দেয়া ছিলো তাঁর হক। দ্বীনের সাধারণ কথাবার্তা ছাড়াও তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন ছিলো, সেগুলো তিনি জিজ্ঞাসা করেন। আলহামদুলিল্লাহ! তিনি পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হয়ে ফিরে যান। আমি চিন্তা

করতে থাকি যে, তুষারপাতের এ রাতে সম্ভবত পাঁচ ঘণ্টার অধিক সময় ব্যয় করে তিনি নিজ বাড়িতে পৌঁছতে সক্ষম হবেন।

সে রাতেই দশটার সময় ট্রেনযোগে আমাদেরকে মস্কো ফিরে যেতে হবে। অবস্থানস্থলে কয়েক ঘণ্টা সময় হাতে পাই। কুরআনে কারীমের অনুবাদ ও টীকা লেখার কাজে এ সময় ব্যয় করি। তারপর রাত দশটায় স্টেশনে পৌঁছে সেই তাতারিস্তান এক্সপ্রেসে আরোহণ করি, যাতে করে আমরা মস্কো থেকে এসেছিলাম।

পুনরায় মস্কোতে

পরদিন ফজরের নামায আমরা ট্রেনেই আদায় করি। সূর্যোদয়ের পূর্বে ট্রেন মস্কো রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশ করে। জনাব হারুন সাহেব মুযাফফর নগরের অধিবাসী। বহু বছর ধরে তিনি ব্যবসার উদ্দেশ্যে মস্কোয় বসবাস করেন। তাবলীগ জামাতের নুসরাতে অগ্রগামী থাকেন। পূর্বেও তাঁর বাড়িতেই আমার অবস্থান হয়েছিলো এবং এখনও আমরা স্টেশন থেকে তাঁর বাড়িতে পৌঁছি। তিনি দেশী আঙ্গিকের আড়ম্বরপূর্ণ নাস্তা নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে ও তাঁর পরিবারের লোকদেরকে তাওফীক দান করেছেন যে, তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহ-উদ্দীপনার সঙ্গে শুধু নিজেদের মেহমানদারীই নয়, বরং দ্বীনের নামে আগত সমস্ত মেহমানের মনে-প্রাণে খেদমত করে থাকেন। রাশিয়ার প্রধান মুফতী আইনুদ্দীন সাহেব- যাঁর মাধ্যমে আমাদের ভিসার ব্যবস্থা হয়েছিলো- এ পুরো সময় সফরে ছিলেন। এক-দু'দিন পূর্বে তিনি ফিরে এসেছেন। আজ বিকাল তিনটায় তাঁর সাথে তাঁর অফিসেই সাক্ষাতের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। এর আগের সময়টুকু আমাদের অবসর ছিলো। মেযবানগণ মস্কোর বিশেষ কিছু জায়গা দেখানোর প্রোগ্রাম করেন। সর্বপ্রথম আমরা মস্কোর প্রাচীন, ঐতিহাসিক ও জাঁকজমকপূর্ণ এলাকা ক্রীমলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

মস্কো বিশাল বিস্তৃত একটি শহর। যার অধিবাসী প্রায় দেড় কোটি। এতো বিরাট সংখ্যক অধিবাসী সত্ত্বেও শহরটিকে খোলামেলা ও সুপ্রশস্ত দেখা যায়। সড়কগুলো অত্যন্ত চওড়া। কয়েকটি সড়ক আমি দেখেছি, যার একেক দিকে ছয়-ছয়টি লেইন আছে। এভাবে পুরো সড়কটি উভয় দিক মিলিয়ে বারটি লেইন আছে। ভবনসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ ও সুন্দর। তারপরেও কমিউনিস্ট শাসনকালে তার সার্বিক পরিবেশ ছিলো সাদামাটা। বাজারগুলোতে পুঁজিবাদী দেশসমূহের ন্যায় ঔজ্জ্বল্য ছিলো না। কিন্তু কমিউনিস্ট পতনের পর তারা ইউরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী নগরের ভালোমন্দ সব আচরণই রপ্ত করেছে। যে সমস্ত মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানী একসময় মস্কোমুখী হতে পারতো না, তারা এখন সেখানে

পুরো জৌলুসের সঙ্গে নিজেদের বাণিজ্যিক আসর প্রতিষ্ঠিত করেছে। একসময় যেখানে প্রাইভেট ব্যবসা ও তার বিজ্ঞাপনের কথা চিন্তাও করা যেতো না। আজ সেখানে পদে পদে বড়ো বড়ো নিয়ন সাইন জ্বলজ্বল করছে। আমরা শহরের বিভিন্ন অংশ অতিক্রম করে অবশেষে 'ক্রীমলন' পৌঁছি।

রাশিয়ান পরিভাষায় কোন শহরের দুর্গবেষ্টিত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক অংশকে 'ক্রীমলন' বলা হয়। রাশিয়ার সবগুলো বড়ো শহরেই এধরনের এলাকাকে 'ক্রীমলন' বলা হয়। মস্কোর 'ক্রীমলন' এদিক থেকে বিশিষ্ট যে, এটি দেশের বিশাল-বিস্তৃত রাজধানীর ক্রীমলন। এখানে প্রাচীনকালে নির্মিত অত্যন্ত আড়ম্পূর্ণ দুর্গ রয়েছে। এখানে একসময় বাদশাহগণ বসবাস করতেন। দুর্গ ও তার আশেপাশের সবগুলো ভবন লাল রংয়ের। এর পাশেই বিরাট-বিস্তৃত একটি পাকা ময়দান রয়েছে। যা রেড স্কয়ার বা লাল চক নামে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। এটাই সে জায়গা, যেখানে লেনিন ও ষ্টালিন লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতেন। এ রেড স্কয়ারের একটি লাল ভবনে লেনিনের লাশ মমি করে একটি শো-কেসের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। কমিউনিস্ট শাসনকালে একে একটি ইবাদতখানার ন্যায় সম্মান করা হতো। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে একে তোপধ্বনির মাধ্যমে সালাম দেয়া হতো। এখন এর সেই সম্মান আর অবশিষ্ট নেই, শুধু একটি স্মারক হিসেবে এখনও তা সংরক্ষণ করা হচ্ছে। মানুষের মুখে ছড়িয়ে আছে যে, বর্তমান সরকার লেনিনের লাশ মূল্যের বিনিময়েকোন জাদুঘরে বিক্রি করতে চাচ্ছে। মানুষের মুখের এ কথা ঠিক হোক বা না হোক, কিন্তু এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয় অবশ্যই। যে ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচারের রাজত্ব চালিয়েছে, আজ তার লাশ পরিবর্তিত সরকারের দয়ার পাত্র হয়ে আছে। এখন তার অধিকাংশ প্রজা তাকে ভালো নামে স্মরণ করে না। যে শহরকে লেনিনগ্রাদ আখ্যা দিয়ে তার নামে নামকরণ করা হয়েছিলো। পরবর্তী লোকেরা তার নাম পর্যন্ত মুছে দিয়েছে। মৃত্যু পরবর্তী যে জীবনকে সে রূপকথা মনে করতো, সে জীবনে তার কী অবস্থা হয়েছে, তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

লেনিনের মমি রক্ষিত এ ভবনের পিছনে দুর্গ প্রাচীরের ছায়ায় ষ্টালিনসহ আরও অনেক কমিউনিস্ট নেতার কবর রয়েছে। দুর্গের একটি অংশ জাদুঘরে পরিণত করা হয়েছে। রেড স্কয়ারের বিপরীত দিকে অত্যন্ত সু-সজ্জিত অনেকগুলো দোকান রয়েছে। এ পুরো অঞ্চল পর্যটক দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে।

আমাদেরকে যোহরের নামায পড়তে হবে এখানকার প্রসিদ্ধ 'ঐতিহাসিক মসজিদে'। আব্দুস সালাম সাহেবের পথপ্রদর্শনে নিকটবর্তী ষ্টেশন থেকে আমরা ভূ-গর্ভস্থ ট্রেনে আরোহণ করি। মস্কোয় ভূ-গর্ভস্থ ট্রেনের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত। একেকটা ষ্টেশনে স্তরে স্তরে অনেকগুলো প্লাটফর্ম তৈরী করা

হয়েছে। সেগুলোর প্রশস্ততা ও পরিচ্ছন্নতাও অন্য অনেক শহরের তুলনায় উন্নত। ট্রেন আমাদেরকে দশ-পনেরো মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। আমরা মস্কোর সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদে প্রবেশ করি। ১৭৮২ ঈসায়ীতে এটি প্রথম নির্মাণ করা হয়। ১৮২৬ ঈসায়ীতে এর সংস্কার করা হয়। এ কারণে একে 'ঐতিহাসিক মসজিদ' বলা হয়। যোহরের নামায আমরা এখানে আদায় করি। জনাব জাভেদ হাজারবী ও ইরফান জান সাহেব বলেন যে, তারা কয়েক বছর পূর্বে প্রথমবার এখানে একটি জামাতের সাথে আসেন। তখন মসজিদে অবস্থান করার অনুমতি ছিলো না। এ কারণে তাঁরা প্রচন্ড শীতের মধ্যে মসজিদের বাইরে একটি কনটেইনারের মধ্যে ২৫দিন অতিবাহিত করেন। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে তাঁদের মেহনত ও কুরবানীর বদৌলতে এখন জামাতের কাজ এখানে যথেষ্ট উন্নতি করেছে। তারা মানুষের ধর্মীয় দিকনির্দেশনায় অনেক তৎপর ভূমিকা রাখছেন।

তিনটার সময় মুফতী আইনুদ্দীন সাহেবের অফিসে পৌঁছতে হবে। এ কারণে আমরা এখান থেকে গাড়িতে করে রেসপিক্ট মীরার সেই মসজিদে রওয়ানা হই, যেখানে প্রথমদিন আমার বয়ান হয়েছিলো। আমি ইতিপূর্বে বলেছি যে, এ মসজিদের সীমানাতেই দেশের কেন্দ্রীয় 'আল ইদারাতুদ দ্বীনিয়া'র সেক্রেটারিয়েট প্রতিষ্ঠিত। মুফতী আইনুদ্দীন সাহেব এর প্রধান। (তাঁকে এখানে 'গাইনুদ্দীন' বলা হয়) তিনি তাসখন্দে লেখাপড়া করেছেন। বেশ সাবলীলভাবে আরবী বলেন। তিনি সারা দেশের প্রধান মুফতী। সরকারীভাবে সারা দেশের সমস্ত ধর্মীয় তৎপরতার তত্ত্বাবধান করে থাকেন। বলা হয় যে, রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে মুসলমানদের বিভিন্ন লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জন তার জন্যে সহজ হয়ে থাকে। রাশিয়ায় ধর্মীয় তৎপরতার জন্যে এই একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাকে সরকার সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে না। এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির কিছু দুর্বল দিক থাকা সত্ত্বেও বর্তমান পরিস্থিতিতে এখানে যে কোন দ্বীনী কাজ করতে এ প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা পোষণ করতে হয়।

মুফতী আইনুদ্দীন সাহেব অত্যন্ত উষ্ণ সংবর্ধনা জানান। তার সু-সজ্জিত অফিসে- মন্ত্রীদের ন্যায় যার প্রটোকল মর্যাদা- তিনি বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। তিনি 'আল ইদারাতুদ দ্বীনিয়া'র পরিচয় তুলে ধরেন। কমিউনিজম থেকে মুক্তি লাভের পর তার তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তিনি বলেন, সেভিয়েত ইউনিয়নের শাসনকালে রাশিয়ার মতো বিশাল-বিস্তৃত দেশে মাত্র একশটি মসজিদ অবশিষ্ট ছিলো। তারও বেশিরভাগ বিরান পড়ে ছিলো। কিন্তু ১৯৯১ ঈসায়ীতে গণতন্ত্রের সূচনা হওয়ার পর এতো দ্রুত মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ হয় যে, আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন সারাদেশে ৬,০০০ মসজিদ

নির্মিত ও আবাদ হয়েছে। মস্কো শহরের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এখানে মুসলমানদের বসবাস রয়েছে। তাই এখানে মুসলমানদের ইতিহাস হাজার বছরের। এখন এখানে মুসলমানদের সংখ্যা ১০ লাখ অতিক্রম করেছে। শহরে মাত্র ৫টি মসজিদ রয়েছে। যা মুসলমানদের প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তবে এখন পুরাতন মসজিদের সম্প্রসারণ ও নতুন মসজিদ নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্ত বায়িত হচ্ছে। তিনি বলেন যে, আদমশুমারী অনুপাতে খৃষ্টবাদের পর ইসলাম রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। এখন আল 'ইদারাতুদ দ্বীনিয়া'র তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক মসজিদে শিশুদের দ্বীনী তালীমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে 'আল ইদারাতুদ দ্বীনিয়ার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সৌদি আরব, কুয়েত ও অন্যান্য মুসলিম দেশ এখানকার মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা করছে। আমি মুফতী সাহেবের নিকট প্রস্তাব করি যে, রাশিয়ার মুসলমানদের খেদমতের জন্যে আমরা কিতাব ও মুবাল্লিগ পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারি। তাছাড়া আইনানুগভাবে এখানকার ছাত্ররা আমাদের দেশে শিক্ষাগ্রহণের জন্যেও আসতে পারে। কিন্তু এজন্যে তাঁর তৎপর সহযোগিতা প্রয়োজন। তিনি যদি আগমনকারীদের জন্যে ভিসার ব্যবস্থা করেন এবং গমণকারীদের জন্যে ইদারার পক্ষ থেকে N.O.C এর ব্যবস্থা করেন তাহলে পারস্পরিক সহযোগিতা দ্রুত উন্নত হতে পারে। মুফতী সাহেব এ বিষয়ে তাঁর সকল প্রকার সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদানের নিশ্চয়তা দেন। তিনি বলেন যে, তাবলীগ জামাতের জন্যে তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ভিসার ব্যবস্থা করে থাকেন। ইনশাআল্লাহ, আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

আলহামদুলিল্লাহ, এ সাক্ষাত অর্থবহ ও কল্যাণকর হয়। এখানে বসবাসকারী আমাদের সমস্ত বন্ধু এ বিষয়ে জোর দিচ্ছিলেন যে, এখানকার মুফতী সাহেবদের কর্মপন্থা যদিও আমাদের রুচী-প্রকৃতির পরিপন্থী, কিন্তু দেশের দ্বীনী কাজের উন্নতির জন্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা একান্তই জরুরী। এটা ছাড়া এখানে ফলপ্রসূ কোন কাজ করা অত্যন্ত কঠিন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তারা এ সাক্ষাতের কারণে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত ছিলেন।

অবস্থানস্থলে ফিরে এসে আমরা মাগরিবের নামায আদায় করি। আমাদের মেযবান জনাব হারুন সাহেব ইশার নামাযের পর রাতের খানায় মস্কোর বন্ধু-বান্ধবের বেশ বড়ো সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। মস্কোর পরিবেশে দস্তরখানে ইউ.পি.-র ঐতিহ্যবাহী খাবারের উৎকৃষ্টতম আয়োজন সাজানো ছিলো। বেশিরভাগ লোকের মাথায় বেশ কিছু প্রশ্ন ছিলো। কিছু প্রশ্ন সম্মিলিতভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়, আর কয়েকজন একাকী জিজ্ঞাসা করতে চান। তাদেরকে পৃথকভাবেই জওয়াব দেয়া হয়। অনেক রাত পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে।

পরদিন ছিলো রাশিয়ায় আমাদের অবস্থানের শেষ দিন। সে দিনই মাগরিবের পর আমাদের ফেরার সিদ্ধান্ত ছিলো। দু'রাত পূর্বে আমি যখন ট্রেনে ছিলাম, তখন আমার নিকট রাশিয়ায় পাকিস্তানী দুতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি জনাব আফতাব হুসাইন খান সাহেবের ফোন আসে। তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন, মস্কোয় অবস্থানকালে আমি যেন পাকিস্তান দূতাবাসে যাই। তিনি তার বাল্যকাল দারুল উলূমের প্রতিবেশে অতিবাহিত করেন। এ কারণে আমার আসার সংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে যোগাযোগ করেন। ভবিষ্যতে রাশিয়ায় দ্বীনী কাজের জন্যেও পাকিস্তানী দূতাবাসের মধ্যস্থতার প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে এখানকার মুফতী সাহেবগণ আমাকে বলেছিলেন যে, দূতাবাসের মাধ্যমে কিতাব পাঠানো আমাদের পর্যন্ত কিতাব পৌঁছার সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা। তাই আজ আমি দূতাবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। সেখানে যাওয়ার পথে সাথীরা মস্কোর আরও কিছু জায়গা ঘুরিয়ে দেখান। রাশিয়া সরকার যে জায়গায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক নির্মাণ করেছে, তা দেখান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী প্রতিপক্ষকে এখানে পরাজিত করেছিলা। তার স্মারক হিসাবে এখানে বিরাট-বিস্তৃত একটি পার্ক বানানো হয়েছে। প্রতীকী রূপে এখানে ট্যাংক, বোমা ইত্যাদিও রাখা হয়েছে। কমিউনিস্ট পতনের পর নতুন সরকার নিজের ধর্ম নিরপেক্ষতার নিদর্শন হিসাবে স্ব-উদ্যোগে মুসলমান, খৃস্টান ও ইহুদীদের জন্যে পৃথক পৃথক ইবাদতখানা নির্মাণ করেছে। এখানে অত্যন্ত সুন্দর একটি মসজিদ বানানো হয়েছে। পার্কের সাথেই রাশিয়ার সর্ববৃহৎ ইউনির্ভাসিটির বিশাল ভবন রয়েছে। যেখানে সারা পৃথিবীর ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করছে।

অবশেষে আমরা রাশিয়ার সবচেয়ে লম্বা, চওড়া ও সুন্দর সড়কটি তুযুস্কি প্রাসপিকট হয়ে পাকিস্তানী দূতাবাসে পৌঁছি। জনাব আফতাব হুসাইন খান সাহেব আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। তার সঙ্গে অন্যান্য বিষয় ছাড়া কিতাব পাঠানো এবং এখান থেকে গমণকারী ছাত্রদের বিষয়েও কথা হয়। যোহর নামায আমরা দূতাবাসেই আদায় করি। এখান থেকেই দেশে ফেরার জন্যে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। দুবাইয়ের পথে পরের দিন ভোরে করাচী পৌঁছি।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

এটি ছিলো আমার রাশিয়ার প্রথম সফর। যে দেশের অবস্থা দূর থেকে শুনতাম তা স্বচক্ষে দেখার এই প্রথম সুযোগ হয়। সফরটি বিরামহীন ব্যস্ততার কারণে যদিও ক্লান্তিকর ছিলো, কিন্তু অত্যন্ত তথ্যবহুল, মনোমুগ্ধকর ও বহু দিক থেকে কল্যাণকর ছিলো। স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন ছিলো যে, এ

দেশে এখনো এতো অধিক সংখ্যক মুসলমান রয়েছেন। যারা নিজেদের ইসলামী স্বকীয়তা রক্ষা করার জন্যে অবিরাম সাধনা করে যাচ্ছেন।

সারা পৃথিবীতে যখন সমাজতান্ত্রিক মতবাদের চর্চা চলছিলো, তখন সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচার করা হচ্ছে এ আওয়াজ উচ্চকিত হলে আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিকরা এটাকে আমেরিকার প্রোপাগান্ডা আখ্যা দিতো। এখন যখন রাশিয়ান মুসলমানদের মুখ থেকে সরাসরি সে সময়ের অবস্থা শুনি, তখন অনুমিত হয় যে, জুলুম-অত্যাচারের যে কাহিনী তখন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা প্রকৃত অবস্থার এক দশমাংশও নয়।

আমার এ সফর এমন সময় হয়, যখন কমিউনিজম এখানে দীর্ঘ চুয়াত্তর বছর নিজের দাপট দেখানোর পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং নতুন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার পর সতেরো বছর অতিবাহিত হয়েছে। এ কারণে উভয় যুগ প্রত্যক্ষ করার এবং উভয় যুগের মধ্যে তুলনা করার উপযুক্ত লোক সেখানে বিদ্যমান ছিলো। তাদের স্বচক্ষে দেখা ঘটনা ও অভিজ্ঞতা সরাসরি তাদের থেকে জানার আমার সুযোগ হয়। আর নতুন বিপ্লবের ফলে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা তো স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি।

কমিউনিস্ট শাসনকালে প্রযুক্তিগত উন্নতি সত্ত্বেও রাশিয়া একটি সাদামাটা দেশ ছিলো। সেখানে পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতো উজ্জ্বলতা ছিলো না। কিন্তু কমিউনিস্ট পতনের পর তা ইউরোপের অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর ভালো-মন্দ সব আয়ত্ত করেছে। সে সমস্ত মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী, যারা একসময় মস্কোমুখী হতে পারতো না, তারা সবাই এখানে নিজেদের বাণিজ্যিক আসর সেই জৌলুসের সাথে সাজিয়েছে, যা পুঁজিবাদী দেশে চোখে পড়ে। যে আমেরিকান সভ্যতার নাম এক সময় এখানে গালি মনে করা হতো, আজ তা তরুণদের জন্যে আদর্শে পরিণত হয়েছে। যেখানে একসময় প্রাইভেট ব্যবসার কথা চিন্তাও করা যেতো না, আজ সেখানে পদে পদে নিয়নসাইন জ্বলজ্বল করছে। আল্লাহ প্রদত্ত অহীর দিকনির্দেশনা ছাড়া মানুষ যে প্রান্তিকতার মধ্যে দোল খেতে থাকে, রাশিয়ার বিপ্লবের পর তার অত্যন্ত শিক্ষণীয় দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা যায়। রাশিয়ার জারের শাসনকালে পুঁজিবাদী ও জায়গীরদাররা গরীবদের সাথে যে অবিচার করতো, কমিউনিজম ছিলো তার প্রতিক্রিয়া। যা অপরিণামদর্শী উত্তেজনার ফলে ব্যক্তি স্বাধীনতার সমস্ত বৈধ মূল্যবোধকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। পুরো দেশকে একটি বিস্তীর্ণ কারাগারে পরিণত করে। সত্তর বছরাধিক সময় পর্যন্ত মানুষ সাম্যের প্রতারণাপূর্ণ স্লোগানে ধোঁকা খেয়ে জুলুম-অত্যাচারের হাপরের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। কিন্তু যখন সেই প্রতারণার যাদু ছুটে যায় এবং মানুষ শৃঙ্খলিত জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন পুনরায় তারা যুক্তি-বুদ্ধির সমস্ত সীমানা অতিক্রম করে বল্গাহীন হয়ে যায়।

কমিউনিস্ট শাসনের একটি ইতিবাচক দিক এই ছিলো যে, সেখানে টাকা-পয়সার জন্যে মানুষ অন্ধভাবে দৌড়াতো না। কিন্তু এখন সবাই সমস্ত ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধকে পদদলিত করে এ প্রতিযোগিতায় বল্গাহীন হয়ে ছুটে চলেছে। ফলে ধনী ও গরীবের মাঝে ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের জীবন প্রণালীর ব্যবধান সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যার ফলে ঘুষের আধিপত্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

কমিউনিস্ট শাসনকালে তার সমস্ত মন্দ দিক সত্ত্বেও নগ্নতা ও অশ্লীলতার উপর এক পর্যায়ের নিয়ন্ত্রণ ছিলো। এখন সে নিয়ন্ত্রণ ভেঙ্গে পড়েছে। অন্যান্য পশ্চিমা দেশের ন্যায় এখানের অলি-গলিতেও অশ্লীলতার পেত্নি উলঙ্গ নৃত্য করছে। মোটকথা, যেমন দ্রুত গতিতে দেশটি সমাজতান্ত্রিকতার প্রথম অভিজ্ঞতাকেন্দ্র হয়েছিলো, তার চেয়ে অধিক দ্রুত গতিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ফেতনার যাবতীয় উপাদান সহ এখানে শিকড় গেড়ে বসেছে। আমি এখানকার বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসা করি যে, এদেশের সাধারণ জনগণ কমিউনিস্ট শাসনকালকে বেশি পছন্দ করে, না বর্তমান জীবনব্যবস্থাকে। প্রায় সবাই এই একই উত্তর দেন যে, বৃদ্ধ লোকেরা কমিউনিস্ট যুগকে এ কারণে স্মরণ করে থাকে যে, তখন তারা নির্দিষ্টহারে একটি মাসিক ভাতা পেতো। আর এখন তাদেরকে টাকা কামানোর প্রতিযোগিতায় অন্যদের সঙ্গে ময়দানে নামতে হয়। কিন্তু নতুন প্রজন্ম নতুন জীবনব্যবস্থায় যে স্বাধীনতা ও সাজসজ্জা লাভ করেছে, প্রবৃত্তির চাহিদা পুরনের দ্বার যেভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে এবং অধিক সম্পদশালী হওয়ার যেসব সুযোগ লাভ করেছে, তার কারণে এ ব্যবস্থাকেই তারা উত্তম মনে করছে। কোনভাবেই তারা কমিউনিস্ট দিকে ফিরে যেতে রাজী নয়।

আর মুসলমানগণ মোটের উপর এজন্যে খুশি যে, কমিউনিস্ট শাসনকালে ইবাদত-বন্দেগী করতে যে কঠোর বাধা ছিলো এখন তা থেকে তারা মুক্তি লাভ করেছে। এ কারণে মসজিদগুলো এখন নতুনভাবে নির্মিত ও আবাদ হচ্ছে। মাদরাসা চালু করার সম্ভাবনাও সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ তারা পেয়েছে। তবে চেচনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের কারণে এখনও সেখানে বিশেষভাবে মুসলমানের বেশভূষা ধারণকারীদের উপর সরকারী এজেন্টদের সজাগ দৃষ্টি রয়েছে। সাধারণ সাধারণ সন্দেহের ভিত্তিতে এখনও তাদেরকে জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। বর্তমানে রাশিয়ায় দ্বীনের তালীম ও তাবলীগের কাজ চালু রাখার জন্যে সরকারী পর্যায়ে মুফতী সাহেবদের উপর নির্ভর করা জরুরী। আমার এ সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা। তারপর তাদের মাধ্যমে সেখানে তালীম ও তাবলীগের কাজকে সম্মুখে অগ্রসর করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু

করা। আলহামদুলিল্লাহ! তা অনেকটা সফল হয়েছে। এ সফরের মাধ্যমে আমি তীব্রভাবে উপলব্ধি করি যে, এ ভূখন্ডের প্রতি মুসলিম বিশ্বের সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া দরকার। এদেশের অবস্থা ও প্রয়োজন সম্পর্কে মুসলিম বিশ্ব অনেকটাই অনবহিত। মানুষের এ কথাও জানা নেই যে, সরকারের আদমশুমারী মতে রাশিয়ায় মুসলমানদের সংখ্যা আড়াই কোটি। বাস্তবে এর চেয়ে বেশিও হতে পারে। ফিনল্যান্ড থেকে জাপান পর্যন্ত এ বিশাল-বিস্তৃত দেশটিতে এমন কোন ভূখন্ড নেই, যেখানে বিরাট সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী নেই। কমিউনিস্ট শাসনকালের বন্দিত্বের কারণে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা মুশকিল ছিলো। কিন্তু এখন সে অবস্থা আর নেই। সেখানকার মুসলমানগণ দ্বীনী তালীম-তারবিয়াতের মুখাপেক্ষী। এসব ময়দানে ইউরোপ-আমেরিকার অন্যান্য দেশে যে পরিমাণ চেষ্টা-মেহনত করা হয়েছে, এখন এখানে তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে কাজ করা দরকার। অধিকহারে তাবলীগের জামাত পাঠানো, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করা, রাশিয়ান ভাষায় দ্বীনী বই-পুস্তক রচনা ও প্রচার করা এবং আমাদের দেশে সেখানকার ছাত্রদের শিক্ষা লাভ করার ব্যবস্থা করা সে দেশের হক। রাশিয়ান ভাষায় দ্বীনী কিতাবের স্বল্পতা আশংকাজনক। অতি দ্রুত তা দূর করা জরুরী। পাকিস্তানের রাইবেন্ড মাদরাসা থেকে শিক্ষালাভকারী তাতারিস্তানের এক আলেম রাশিয়ান ভাষায় বিভিন্ন কিতাবের অনুবাদ করেছেন। সেগুলোর মধ্যে তালীমুল ইসলাম ও বেহেশতী জেওরও অন্তর্ভুক্ত। আমার কতক প্রবন্ধও তিনি তরজমা করেছেন। এখন তিনি আমার ইসলাহী খুতুবাতের নির্বাচিত কিছু অংশ তরজমা করার ইচ্ছা করেছেন। কিন্তু বড়ো পরিসরে এ কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। আমার এ সফরনামা লেখার পিছনে একটা উদ্দেশ্য এও রয়েছে যে, যারা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে অবগত নন, তারা সেখানকার প্রয়োজনসমূহ উপলব্ধি করে, যিনি যে ময়দানে খেদমত করতে সক্ষম তা করতে যেন কুণ্ঠিত না হন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ বিষয়ে আমাদের দায়িত্ব সম্পাদনের তাওফীক দান করুন। আমীন।

জাপানে দশদিন

(জুমাদাল উলা, ১৪২৯ হিজরী, মে, ২০০৮ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এগারো বছর আগেও আমি একবার জাপানে গিয়েছিলাম। যার আলোচনা আমার লিখিত 'দুনিয়া মেরে আগে'র মধ্যে 'দুনিয়া কে গিরদ এক সফর' শিরোনামে রয়েছে। কিন্তু তখন আমি আমেরিকা থেকে ফেরার পথে একটি 'মনযিল' হিসেবে টোকিওতে শুধুমাত্র দু'রাত অবস্থান করি। তাই সেটি ছিলো জাপানের ভাসা ভাসা ও পরিচিতিমূলক একটি সফর। কিন্তু এবার জাপানই ছিলো উদ্দিষ্ট গন্তব্য। এবার সেখানে দশদিন অতিবাহিত করার সুযোগ হয়। জাপানের নতুন কিছু জায়গা দেখা ছাড়াও সেখানকার জীবনের আরো কিছু দিক সামনে আসে, সেগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এ সফরনামা।

জাপানের কিছু ব্যবসায়ী বন্ধু প্রায় এক বছর যাবৎ আবেদন করছিলেন, যেন আমি সপ্তাহ/দশ দিন তাদের সঙ্গে কাটাই এবং তাদের ব্যবসায়িক বিষয়ে শরীয়তের আলোকে পরামর্শ দেয়ার সাথে সাথে সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে দাওয়াতী ও ইসলাহী বয়ান করি। সফরটি পিছাতে থাকে। অবশেষে দারুল উলূমের ষান্মাসিক পরীক্ষা চলাকালে আমি সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করি।

পয়লা জুমাদাল উলা, ১৪২৯ হিজরী, মোতাবেক ৭ মে ২০০৮ রাতে থাই এয়ার ওয়েজের বিমানে যাত্রা করি। ব্যাংককে বিমান পরিবর্তন করি। বিমানটি পরের দিন জাপানের স্থানীয় সময় ৪টার দিকে (যা পাকিস্তানী সময় থেকে চার ঘণ্টা এগিয়ে) টোকিওর নিরিতা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। আমার দোস্ত জনাব আসেফ সাহেব- আমার ফিজির সফরনামায় তার সম্পর্কে আমি আলোচনা

করেছি- এখন জাপানে চলে এসেছেন। এ সফরের আসল উদ্যোক্তাও ছিলেন তিনিই। তিনি বন্ধু-বান্ধবসহ স্বাগত জানানোর জন্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মাওলানা সালমান থানভী, মাওলানা আনাস সাহেব ও আতীক সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নিরিতা বিমানবন্দর শহর থেকে অনেক দূরে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা ছিলো টোকিওর উপকণ্ঠের 'আবীনা' শহরে। বিমানবন্দর থেকে হোটেলের দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা সময় লাগে। পথে যখন মাগরিব নামাযের সময় হয়, তখন আমরা জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পনগরী ইউকোহিমার বন্দরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। এখানে রশির সাথে ঝুলন্ত কয়েক কিলোমিটার লম্বা একটি সেতু রয়েছে। সেতুটি কোথাও সাগরের উপর দিয়ে, আর কোথাও জনবসতির উপর দিয়ে বাঁক নিয়ে চলে গেছে। এটিকে একটি বিস্ময়কর বস্তু মনে করা হয়। সেতুটির নিচে একটি পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে। যাকে বিনোদনকেন্দ্র মনে করা হয়। এখানে আমরা মাগরিবের নামাযের জন্যে থামি। উপরে তাকিয়ে দেখি, ঐ বড়ো সেতুর নিচে বাঁক খাওয়া অনেকগুলো সেতুর একটি জাল ছড়িয়ে আছে। যার উপর দিয়ে গাড়ি বিভিন্ন দিকে ছুটে চলেছে। এটি এমন একটি দৃশ্য, যা কয়েক মুহূর্তের জন্যে মানুষকে হতবাক করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। ঋতু ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর শীতল। তাজা বাতাসের ছোঁয়া দেহ-মনকে অল্প সময়ের জন্যে সজীব করে দেয়। ইশার নামাযের কাছাকাছি আমরা অবস্থানস্থলে পৌঁছি। এটি একটি রেস্ট হাউস। 'আবিনা' শহরের সুদৃশ্য একটি এলাকায় তা অবস্থিত। আমাদের মেযবান জনাব হামেদ আযীয সাহেব এখানে গাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের একটি কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার কোম্পানী অফিসের সুদৃশ্য ভবনের তৃতীয় তলায় তিনি প্রশস্ত এ রেস্ট হাউসটি বানিয়েছেন। রেস্ট হাউসটি আবাসিক সমস্ত সুবিধাদি দ্বারা সজ্জিত। এ ভবনের নিকটে তিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। যা 'মদীনা মসজিদ আবিনা' নামে প্রসিদ্ধ। জাপানে বাড়ি ও ভবন নির্মাণের ব্যয় অনেক বেশি। এটি দুইশ' বর্গ গজের উপর নির্মিত তিনতলাবিশিষ্ট একটি মসজিদ। এটি নির্মাণ করতে পাকিস্তানী টাকার হিসেবে প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। মসজিদ সংলগ্ন একটি জায়গা গাড়ি পার্কিংয়ের জন্যে ভাড়া নিয়েছেন। ঐ মসজিদে ইশার নামায আদায় করি এবং নামাযের পর উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বয়ানও নেই।

পরদিন ছিলো জুমাবার। ফজরের জামাত এখানে চারটা দশ মিনিটে হচ্ছিলো। সূর্য উঠছিলো সাড়ে চারটায়। তাই রাত ছিলো অত্যাধিক ছোট। মসজিদের কেবলার দিকের দেয়ালের সম্মুখে নদীর তীরে একটি লম্বা-চওড়া পার্ক রয়েছে। ফজরের নামাযের পর আমি সেখানে প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস পুরা করি। তারপর বিশ্রাম করি।

জুমার সময় মসজিদের তিনটি তলাই নামাযীদের দ্বারা ভরে গিয়েছিলো। নামাযের পূর্বে উর্দুতে আমার বয়ান হয়। সাথে সাথে জাপানিজ ও ইংরেজী ভাষায় তা অনুবাদ করা হয়। নামাযের পর দূর-দূরান্ত থেকে আগত মুসলমানদের সঙ্গে মুসাফাহা হয়। কিছু সময় জাপানে মুসলমানদের জীবন ও তাদের সমস্যাবলী সম্পর্কেও আলোচনা হয়।

সে দিনই মাগরিবের নামাযের পর টোকিওর কয়েকজন মুসলমান নেতা সাক্ষাৎ করতে আসেন। তাঁদের মধ্যে টোকিওর ইসলামিক সেন্টারের ব্যবস্থাপনা প্রধান মাওলানা সালীমুর রহমান সাহেব দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামা থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন। বহু বছর ধরে তিনি ইসলামিক সেন্টারের খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মাওলানা সালমান থানভী সাহেব আমার বন্ধু মাওলানা কারী আহমাদ মিঞা থানভী সাহেবের সাহেবযাদা। তিনি 'আবিনা'তে মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ে তাদের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকেন। আরো এসেছিলেন জনাব ইবরাহীম ওকোবু সাহেব। তিনি জাপানিজ বংশোদ্ভূত নও মুসলিম। এখানের দ্বীনি দাওয়াতে তিনি অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে থাকেন। প্রত্যেক মতাদর্শের মুসলমানগণ তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। 'তাবলীগী নেসাবে'র জাপানিজ ভাষায় তরজমা করেছেন। বর্তমানে 'ফাযায়েলে সাদাকাতে'র তরজমার কাজে নিয়োজিত আছেন। তিনি জাপানিজ মুসলমানদের সমস্যাবলীর কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমাদের দেশে নির্ভরযোগ্য আলেমের সংখ্যা অনেক কম। যে সমস্ত আলেম আছেন, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগের অভাব রয়েছে। যে কারণে কতক সময় হালাল-হারাম বিষয়ে মুসলমানদের অত্যন্ত জটিলতার মুখোমুখি হতে হয়। তিনি প্রস্তাব পেশ করেন যে, এখানকার আলেম ও মুসলমান নেতাদের সমন্বয়ে এমন একটি সংগঠন থাকা দরকার, যারা সম্মিলিত পরামর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের দিকনির্দেশনা দিবেন শুধু তাই নয়, বরং পাকিস্তানের আলেমগণের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন। নতুন নতুন বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে কর্মপন্থা ঠিক করবেন। মাওলানা সালীমুর রহমান সাহেব এবং মাওলানা সালমান থানভী সাহেবও প্রস্তাবটি পছন্দ করেন। আমার জাপানে থাকাবস্থাতেই এ বিষয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ইশার নামাযের পর আবিনার জামে মসজিদে আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। অনেক দূর থেকে মানুষ এ সমাবেশে অংশ নেয়ার জন্যে আসে। আমি 'সূরায়ে তাকাসুর'কে সামনে রেখে কিছু কথা বলি। জাপানে বেশির ভাগ মুসলমান যেহেতু ব্যবসায়ী, তাই এ সূরাতে আল্লাহ তাআলা প্রতিযোগিতামূলক অর্থ-সম্পদ উপার্জনের যে সমস্ত অপকারিতার কথা বলেছেন, বিস্তারিতভাবে সেগুলো তুলে ধরি। উপস্থিত লোকদের নিকট আবেদন করি, তারা যেন

নিজেদের এবং নিজেদের সন্তানদের ধর্মীয় অবস্থার উন্নতির পেছনে কিছু সময় ব্যয় করেন। এ জন্যে তাবলীগ জামাতে অংশ গ্রহণ করা একটি উত্তম উপায়। দ্বিতীয়ত, প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে পরিবারের লোকদেরকে সাথে নিয়ে দ্বীনী কোন কিতাব অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। এর জন্যে তাবলীগী নেসাব, হায়াতুল মুসলিমীন ও উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম কিতাব।

রবিবার সকাল থেকে যোহর পর্যন্তের সময় আমার আসল মেযবান জনাব হামেদ আযীয সাহেব তাঁর ব্যবসায়িক কোম্পানী 'কুইনটেক্স' (Quintex)-এর মাসআলা আলোচনার জন্যে নির্ধারণ করেছিলেন। এ কোম্পানী জাপান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গাড়ি রপ্তানি করে থাকে। তার ব্যবসা বেশ বিস্তৃত। হামেদ আযীয সাহেব একজন আত্মমর্যাদাশালী পাকিস্তানী মুসলমান। তিনি চান, তাঁর ব্যবসার মধ্যে শরীয়তবিরোধী কোন কিছুর মিশ্রণ যেন না ঘটে। এ কারণে তিনি তাঁর দায়িত্বশীল বন্ধুদেরসহ আমার সঙ্গে এ মিটিংয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেখানে তাঁরা ব্যবসার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন এবং এতদসংক্রান্ত তাঁদের যে সমস্ত প্রশ্ন ও জটিলতা ছিলো, সেগুলোও আমার সামনে উপস্থাপন করেন। ব্যবসার বিভিন্ন দিক এবং যাকাত সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে শরীয়তের বিধান অবগত হন। সেগুলো গুরুত্বের সাথে লিখে কোম্পানির কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। অনেকগুলো জটিল মাসআলা সংক্রান্ত এ মিটিং যোহর পর্যন্ত চলতে থাকে।

যে সব অমুসলিম দেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সেখানকার শিশুদের তালীম-তারবিয়াতের সমস্যা সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমি এসব দেশের যেখানেই যাই, সেখানেই মুসলমানদেরকে জোর দিয়ে বলি যে, নিজেদের সন্ত ানদের হেফাজতের জন্যে মুসলমানদের নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ, ইউরোপ-আমেরিকার কতক জায়গায় এখন এরূপ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে। কিন্তু জাপানে এখনও এমন কোন তৃপ্তিজনক প্রতিষ্ঠান হয়নি। যার ফলে সকল মুসলমান শিশু সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশে অবস্থান করে দ্বীনী তালীম-তারবিয়াত থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হচ্ছে। এটি অত্যন্ত আশংকাজনক অবস্থা, যার দিকে আশু মনোযোগ প্রয়োজন। আমি জাপানের যেখানেই গিয়েছি, সেখানেই মুসলমানদেরকে এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি।

আবিনার মসজিদে প্রায় এক বছর ধরে একটি মকতব চালু করা হয়েছে। সেখানে বিকালবেলা প্রায় সত্তরজন শিশু কুরআনে কারীম ও দ্বীনিয়াত ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করে। এখন সেটাকে সার্বক্ষণিক মাদরাসায় পরিণত করা হচ্ছে। রবিবার দিন যোহরের নামাযের পর সেই মকতবের শিশু এবং অভিভাবকদের সমন্বয়ে একটি সমাবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তারেক সাহেব- যিনি

আমাদের অবস্থানকালে আমাদের জন্যে অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে খাবারের আয়োজন করছিলেন- তাঁর এক ছেলের কুরআনে কারীম শেষ হয়েছিলো এবং আরেক ছেলের ছিলো 'বিসমিল্লাহ'। আরো অনেক জাপানিজ শিশু সেখানে উপস্থিত ছিলো। তাদের থেকে কুরআনে কারীমের বিভিন্ন সূরা এবং মাসনূন দু'আ শুনে আনন্দিত হই। আল্লাহর মেহেরবানীতে কোন না কোন পর্যায়ে হলেও এ কাজ আরম্ভ তো হয়েছে। আমি শিশুদের অভিভাবকদের নিকট আরয করি যে, শিশুদেরকে দ্বীনী তালীম-তারবিয়াত দেয়া মা-বাবার উপর ফরয। তাই বাড়িতেও শিশুদেরকে উপযুক্ত পরিমাণ সময় দেয়া তাদের কর্তব্য। পরোক্ষভাবেও তাদেরকে ইসলামী বিধি-বিধান ও আদব-কায়দার সাথে পরিচিত করে তোলা তাদের অন্যতম দায়িত্ব।

সে দিনই আছরের নামাযের পর মাওলানা সালীমুর রহমান সাহেব টোকিওর ইসলামিক সেন্টারে বিভিন্ন সংগঠনের লোকদের এক সমাবেশের ব্যবস্থা করেছিলেন। যার উদ্দেশ্য ছিলো, টোকিও ও তার উপকণ্ঠে যাঁরা ধর্মীয় ও সামাজিক কাজ করছেন, তাঁদের সঙ্গে একই সময়ে আমার সাক্ষাতও হবে এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু নিবেদনও করতে পারবো। সুতরাং আছরের নামায আমরা টোকিও ইসলামী সেন্টারে আদায় করি। জাপানে ইসলামের অনুপ্রবেশের ইতিহাস আমি সংক্ষেপে আমার জাপানের প্রথম সফরনামায় উল্লেখ করেছি। যার সারকথা হলো, সর্বপ্রথম ১৮৯১ ঈসায়ীতে একজন জাপানী মুসলমান হন। তারপর আরো কয়েকজন জাপানী মুসলমান হন। ১৯২১ ঈসায়ীতে রাশিয়ার তুর্কিস্তান থেকে হিজরতকারীদের বড়ো একটি দল জাপানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। যে কারণে মুসলমানদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩ ঈসায়ীতে মুসলমানদের প্রথম সংগঠন 'জামইয়্যাতুল মুসলিমীন জাপান' গঠন করা হয়। ১৯৫৬ ঈসায়ী থেকে এখানে তাবলীগ জামাতের লোকদের আগমন আরম্ভ হয়। তাঁদের ইখলাসপূর্ণ মেহনতের বদৌলতে ইসলামের প্রচার-প্রসারে অনেক অগ্রগতি হয়। আরব দেশসমূহ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্ক প্রভৃতির যে সকল ছাত্র জাপানে লেখা-পড়া করতো তারা ১৯৬১ ঈসায়ীতে একটি ছাত্রসংগঠন করে। বাদশাহ ফয়সাল মরহুম একটি প্রতিনিধি দল পাঠান। তারা ১৯৭৪ ঈসায়ীতে একটি ভাড়া বাড়িতে এ ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবর্তীতে বাদশাহ খালেদ মরহুম একটি জমি ক্রয় করে ইসলামিক সেন্টারকে প্রদান করেন। শাহযাদা আহমাদ ইবনে আব্দুল আযীয তার উপর ছয়তলা ভবন নির্মাণ করান। ১৯৮২ ঈসায়ীতে তার উদ্বোধন হয়।

ডক্টর সালেহ সামুরাই- যাঁর আলোচনা আমি আমার প্রথম সফরনামায় করেছি- এখনও সেন্টারের প্রধান। কিন্তু বর্তমানে তিনি বেশিরভাগ সময় সফরে থাকেন। সেন্টারের দাওয়াতী ও ইনতেযামী কর্ম-কান্ডের দায়িত্ব মাওলানা

সালীমুর রহমান সাহেবই সম্পাদন করে থাকেন। তিনিই আজকের এ সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। টোকিও, ইওকোহিমা ও শহরতলী অঞ্চল থেকে দ্বীনী ও সামাজিক সংগঠনসমূহের নেতৃবর্গ অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে এতে অংশ গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে মসজিদের ইমাম, বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের প্রতিনিধি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গ এবং ব্যবসায়ীক মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মাগরিব পর্যন্ত তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয় এবং তাদের খেদমতে আমি কিছু বক্তব্যও তুলে ধরি। তার মধ্যে শিশুদের শিক্ষার বিষয়টি ছিলো শীর্ষ তালিকায়।

মাগরিবের নামায টোকিও মসজিদে পড়তে হবে। মসজিদটি ইসলামিক সেন্টারের নিকটেই অবস্থিত। এটি সেই টোকিও মসজিদ, ১৯৮৩ ঈসায়ীতে যা প্রতিষ্ঠা করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আশেপাশের সমস্ত ভবন ধ্বংস হয়ে গেলেও মসজিদটি যথাপূর্ব অক্ষত থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে ভূমিকম্প ও ঢলের কারণে ভবনটি জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে ধ্বসে যায়। এগারো বছর পূর্বে আমি যখন টোকিওতে এসেছিলাম, তখন জায়গাটি খালি পড়েছিলো। এখানকার মুসলমানগণ তখন এটি পুনঃনির্মাণের চিন্তা করছিলেন। মাশাআল্লাহ! এখন মসজিদটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। তুরস্ক সরকারের ব্যবস্থাপনায় তা পরিচালিত হচ্ছে। আমরা মাগরিবের নামায সেখানেই আদায় করি। মাগরিবের নামাযের পর মসজিদেরই একটি ভূগর্ভস্থ হলকক্ষে আমার বয়ানের ঘোষণা করা হয়েছিলো। উপস্থিত লোকদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলো বিধায় তারা ইংরেজীতে বয়ান করতে বলেন। যাতে সকলেই বুঝতে সক্ষম হয়। প্রায় দেড়ঘণ্টা আমার বয়ান হয়। শ্রোতাদের মধ্যে পাকিস্তানী লোক ছাড়াও সৌদি আরব, মিসর, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও মালোয়েশিয়ার লোকজন ছিলেন। তাঁরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে এসেছিলেন। ইশার নামাযের পর সেখানেই সকলের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা ছিলো। খাওয়ার সময় তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় চলতে থাকে। অনেক রাতে অবস্থানস্থলে ফিরে আসি।

ফুজির পাহাড়ী অঞ্চলে

পরেরদিন আমাদের মেযবানগণ ফুজির পাহাড়ী অঞ্চল ভ্রমণের প্রোগ্রাম রেখেছিলেন। এটি জাপানের সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে সুন্দর পাহাড়ী অঞ্চল। যা নৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্যে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। বরং একে জাপানের প্রতীক (Symbol) মনে করা হয়। জাপানের সংক্ষিপ্ত কোন চিহ্ন দিতে হলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ পাহাড়ের ছবিই দেয়া হয়। এটি প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের সন্নিকটে অবস্থিত। পাহাড়টি ১২৩৮৮ ফুট, অর্থাৎ ৩৭৭৬ মিটার উঁচু।

এর চূড়া বছরের বেশিরভাগ সময় 'ছেলা' আকারে এমনভাবে বরফাচ্ছাদিত থাকে যে, তার নীচের অংশ সবুজ, আর উপরের অংশ বরফের কারণে সাদা দেখা যায়। আর এটাই তার ব্যতিক্রমী দৃশ্য, যা তার প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। পাহাড়ের পাদদেশের পাঁচটি ছোট ছোট ঝিল বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে আছে। যেগুলো তার সৌন্দর্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে। জাপানিজ ভাষায় পাহাড়কে 'ইয়ামা' বলা হয়। এ কারণে পাহাড়টির নাম দেয়া হয়েছে 'ফুজি ইয়ামা'। প্রাচীন জাপানিজ ভাষায় (Ainu) ফুজি শব্দের অর্থ অবিনশ্বর জীবন। সম্ভবত এর এ নামকরণ করার কারণ এই যে, জাপানের লোকেরা এটাকে পবিত্র পাহাড় মনে করে। এর চূড়ার উপর একটি ইবাদতখানাও রয়েছে। জাপানের ধার্মিক লোকেরা গ্রীষ্মকালে পদব্রজে এর চূড়ায় আরোহণ করে এবং এটাকে একটা ইবাদত মনে করে।

এ পাহাড় ভ্রমণের জন্যে আমার বন্ধু আসেফ সাহেব, তারেক সাহেব ও মাওলানা সালমান থানভী সাহেবও আমাদের সফরসঙ্গী হন। আমাদের অবস্থানস্থল থেকে গাড়িতে প্রায় দেড় ঘণ্টায় এ পথ অতিক্রান্ত হয়। পথটি অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল ও সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। ফুজির বরফাচ্ছাদিত চূড়াটি দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো। নিকটে পৌঁছার পর বিভিন্ন দিকে এতো অধিক পরিমাণে সড়ক বিছানো ছিলো যে, কোন্ সড়ক ধরে সেই পাহাড়সারিতে প্রবেশ করবে সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা আমাদের মেযবানদেরও কঠিন হয়ে যায়। জানতে পারলাম যে, পাহাড়ের বিভিন্ন দিকে দর্শনীয় স্থান (View Points) এতো অধিক যে, কয়েক দিনেও সব জায়গা দেখে শেষ করা যাবে না। প্রত্যেক জায়গায় যাওয়ার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সড়ক রয়েছে। যাইহোক, মেযবানগণ সেগুলোর মধ্যে একটি সড়ক নির্বাচন করেন, যা পাহাড়ের চূড়ার নিকট পর্যন্ত চলে গেছে। সড়কটি পাঁচটা দর্শনীয় জায়গা অতিক্রম করে উপরে উঠে গেছে। জায়গাগুলোকে প্রথম সিঁড়ি, দ্বিতীয় সিঁড়ি, তৃতীয় সিঁড়ি নাম দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সিঁড়ি থেকে পাহাড় ও তার উপত্যকার একটি নতুন দৃশ্য সামনে আসে। ষষ্ঠ সিঁড়িতে পৌঁছে সড়ক শেষ হয়ে গেছে। তখন পাহাড়ের চূড়া এতো নিকটে চলে আসে যে, মানুষ পায়ে হেঁটে সহজেই সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এখান থেকে একদিকে পাহাড় চূড়ার দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর দেখা যায়। অপরদিকে একটি গভীর উপত্যকা রয়েছে, যা বৈচিত্রময় বৃক্ষরাজি ও সবুজ-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ। উপত্যকার অপর পাড়ে পাহাড়ের আরেকটি সারি রয়েছে। যা বহু দূর পর্যন্ত বরফাচ্ছাদিত দেখা যায়। এখানে তাপমাত্রা ছিলো শূন্য ডিগ্রীর কাছাকাছি। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া মেঘখন্ড আমাদেরকে ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছিলো। কিছু সময় আমরা অপূর্ব এ নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগ করতে থাকি। এখানেই আমরা আযান দিয়ে যোহরের নামায আদায় করি।

আমি পৃথিবীর অনেক পাহাড়ী অঞ্চল দেখেছি। আমাদের দেশটিও উৎকৃষ্টতম পাহাড়ী সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। এ ছাড়া ইন্ডিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড আরো না জানি কতো দেশের সুন্দরতম পার্বত্য অঞ্চল দেখার সুযোগ হয়েছে। প্রত্যেক অঞ্চলের এক ব্যতিক্রমী নিজস্ব সৌন্দর্য রয়েছে। যে কারণে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবে সেগুলোর প্রত্যেকটির ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে একটি যৌথ বৈশিষ্ট্যও (Common Features) রয়েছে। যা সর্বত্র উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। এ সমস্ত জায়গার মধ্যে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বড়ো বড়ো সাগর বাধা হয়ে আছে। সেগুলোর আবহাওয়া ভিন্ন রকম। মানুষের জীবন প্রণালী ব্যতিক্রমধর্মী। দৃশ্যাবলীর গঠনের মধ্যেও রয়েছে ভিন্নতা। কিন্তু সেগুলোর যে যৌথ বৈশিষ্ট্য সর্বত্র অনুভূত হয়, তা ডেকে ডেকে বলে যে, এ সমস্ত দৃশ্য একই কুদরতের হাতের শিল্পকর্ম। এ সবের স্রষ্টা একজনই। এ সবের পিছনে এক সত্তাই দৃশ্যমান।

ফেরার পথে এ পাহাড়েরই তৃতীয় ধাপেও কিছু সময় অবস্থান করি। তারেক সাহেব তাঁর বাড়ি থেকে সুস্বাদু পাকিস্তানী খাবার সঙ্গে এনেছিলেন। নিকটবর্তী একটি রেষ্টুরেন্টে তিনি সেগুলো গরম করান। বরফাচ্ছাদিত এ পরিবেশে যেখানে হালাল খাদ্য এক দুস্প্রাপ্য নেয়ামত ছিলো, সেখানে এমন সুস্বাদু খাবার দ্বারা সকলে পরিতৃপ্ত হই। তারপর সেখান থেকে রওয়ানা হই।

এ পর্বতসারিরই আরেকটি চূড়ার নাম 'হাকোনে' (Hakone)। এখান থেকে তা আশি কিলোমিটারের মতো দূরে। মেযবানদের মন্তব্য ছিলো যে, 'হাকোনে' দেখা ছাড়া আমাদের আজকের এ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। তাই তাঁরা সে দিকেই রওয়ানা হন। আমি গাড়ির আসন পিছনে হেলিয়ে দিয়ে আমার 'কাইলুলা'র অভ্যাস কিছুটা পুরা করি। চোখ খুলে দেখি আমরা 'হাকোনে'র কাছাকাছি চলে এসেছি। চতুর্দিকে নৈসর্গিক দৃশ্যের আরেক জগৎ বিরাজ করছে। আমাদের বাম দিকে অত্যন্ত সবুজ আকাশচুম্বী পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকে একটি স্বচ্ছ ঝিল আছে। তার মধ্যে হাঁসের আকারের তৈরী সাদা নৌকাসমূহ ভেসে বেড়াচ্ছিলো। আর সেগুলোর পিছনে ছিলো ছোট ছোট পাহাড়।

এখান থেকে একটি চেয়ার-লিফট পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত চলে যায়। আমরা তাতে আরোহণ করলে একটু পর পর পাহাড়, বৃক্ষ, ও ঝিলের বিভিন্ন সংগমস্থল নতুন নতুন দৃশ্যের অবতারণা করে। অবশেষে লিফট তার সর্বোচ্চ অবস্থানে পৌঁছে যায়। তাপমাত্রা এখানে শূন্য ডিগ্রীরও নিচে অবস্থান করছিলো। তুষার বায়ুতে পরিবেশ শীতে কম্পমান ছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার কুদরতের এ

কারিশমা এখানে দেখা যায় যে, বরফময় এ পরিবেশে পাহাড়চূড়া থেকে অবিরত গরম বাষ্প বের হচ্ছে। মূলত এটি গন্ধকের আগ্নেয়গিরি। যা বহু বছর ধরে লাভা উদগীরণ করা ছেড়ে দিয়েছে। এ পাহাড় থেকে সর্বশেষ ১৭০৭ ঈসায়ীতে লাভা উদগীরণ হয়েছিলো। তারপর থেকে এর লাভা স্তিমিত হয়ে গেছে। এখন এখান থেকে সব সময় বাষ্প বের হতে থাকে। অল্প উপরে গন্ধকের একটি ঝর্ণা রয়েছে। তার পানি এতো বেশি গরম যে, তার মধ্যে ডিম ছেড়ে দিলে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তা শুধু সিদ্ধই হয়না, বরং তার খোসা সাথে সাথে কয়লার মতো কালো হয়ে যায়। তুষারপূর্ণ এ পরিবেশে সিদ্ধ ডিম অত্যন্ত সুস্বাদু মনে হয়। এখানকার লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এ ঝর্ণার সিদ্ধ ডিম অত্যন্ত শক্তিবর্ধক। বরং এখানে একটি অর্থহীন কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এ ডিম যে খায় তার হায়াত দশ বছর বৃদ্ধি পায়। চেয়ার-লিফট থেকে নেমে আমরা আছরের নামায আদায় করি। তারপর অবস্থানস্থলের দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

তুয়ামা শহরে

পরদিন ছিলো মঙ্গলবার। এ দিন আমাদেরকে জাপানের অপর একটি শহর 'তুয়ামা' যেতে হবে। আসেফ সাহেব ও আতীক সাহেবও সফরসঙ্গী ছিলেন। যোহরের নামাযের পূর্বে 'কুইনটেক্স' (Quintex) কোম্পানীর সঙ্গে একটি সংক্ষিপ্ত মিটিং হয়। যোহরের নামাযের পর আমরা টোকিওর 'হানিদা' বিমানবন্দরের দিকে রওয়ানা হই। বিমানবন্দরটি বেশির ভাগ অভ্যন্তরীণ বিমানের জন্যে ব্যবহৃত হয়। নিরিতার তুলনায় এটি শহরের অধিক নিকটে। জাপানের এয়ার লাইনসের মধ্যে বর্তমানে ANA (All Nippon Airlines) খুবই সমাদৃত হচ্ছে। তার বিমানেই আমরা সফর করি। প্রায় এক ঘণ্টা ওড়ার পর আমরা 'তুয়ামা'র বিমানবন্দরে অবতরণ করি।

'তুয়ামা' (Toyama) জাপানের একটি কৃষি প্রধান ও শিল্পনগরী। যা অনেকগুলো সবুজ-শ্যামল পাহাড়ের পাদদেশে জাপান সাগরের তীরে অবস্থিত। জাপানিজ ভাষায় 'ইয়ামা' বলা হয় পাহাড়কে। তাই 'তুয়ামা' অর্থ 'দশ পাহাড়'। একটি প্রিফিকচার রয়েছে, যা ১৬৪২ বর্গ মাইলব্যাপী বিস্তৃত। তার মধ্যে পাহাড় ছাড়াও প্রচুর নদী এবং ঝিলও রয়েছে। এ কারণে এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনকেন্দ্রও রয়েছে। এ ছাড়া এখানে কাপড় ও কেমিক্যাল তৈরীর শিল্প রয়েছে। এর বন্দরকেন্দ্র বানিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের জন্যে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এখানে দু'শতাধিক মুসলমান পরিবারের বসবাস রয়েছে। তাদের অধিকাংশ পাকিস্তানী। বরং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, এখানকার সমস্ত মুসলমান পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত।

পাকিস্তানীদের বাইরের মুসলমান কদাচিৎ এখানে দেখা যায়। আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এরা সকলে কাছাকাছি জায়গায় বাস করেন। হয়তো এক-দুই কিলোমিটার সীমানার মধ্যে বাস করেন। এরা সকলে একই ধরনের কারবার করে থাকেন। জাপান থেকে গাড়ি ক্রয় করে অন্য দেশে রপ্তানি করেন। তুয়ামা বন্দরকেন্দ্র যে সাগরের তীরে অবস্থিত, তার অপর তীরে রাশিয়ার একটি বন্দরকেন্দ্র রয়েছে। দেড়-দু' দিনে সহজেই জলজাহাজ উভয় বন্দরের মধ্যে যাতায়াত করতে পারে। এ কারণে এসকল ব্যবসায়ী তাদের গাড়িগুলো রাশিয়ায় অধিক পরিমাণে রপ্তানী করে থাকেন। সেখান থেকে সেগুলো ইউরোপের অন্যান্য দেশেও পৌঁছে।

এখানে তারা একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মসজিদটি শহরের মাঝখানে অবস্থিত। আজ মাগরিবের নামাযের পর এখানে বয়ান করার জন্যে এখানকার কিছু বন্ধু আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ইমতিয়ায সাহেব, হাম্মাদ সাহেব, রিযওয়ান সাহেব ও আয়ায সাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি বয়ানের মধ্যে এ বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করি যে, মাশাআল্লাহ! এখানে গাড়ির ব্যবসায় আমাদের পাকিস্তানী ভাইদের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে তারা সচ্ছলও আছেন। তাদের ব্যবসা উন্নতি করছে। এ সচ্ছলতা আল্লাহ তাআলার একটি বিরাট নেয়ামত। এর যতো শোকরই আদায় করা হোক না কেন তা কমই হবে। এ নেয়ামতের শোকর হলো, ব্যবসার ব্যস্ততা যেন আল্লাহ তাআলার দ্বীনের উপর আমল করার পথে প্রতিবন্ধক না হয়। কুরআনে কারীম এ ধরনের ব্যবসায়ীর নিম্নোক্ত ভাষায় প্রশংসা করেছে-

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

'সে সকল লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বানিজ্য আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল করে না।' (সূরা নূর- ৩৭)

কিন্তু ব্যবসা যতো উন্নতি করে, সাধারণত তার মধ্যে মানুষের নিমগ্নতা ততো বৃদ্ধি পায়। এর ব্যস্ততায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ অনেক সময় একথাও ভুলে যায় যে, টাকা-পয়সা জাগতিক উন্নতিরও আসল উদ্দেশ্য নয়, বরং আসল উদ্দেশ্য হলো, শান্তি ও পরিতৃপ্তি। যা এ নিমগ্নতার মধ্যে হারিয়ে যায়। তবে মানুষ যদি আল্লাহ তাআলার নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে থাকে এবং ব্যবসার ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা তাকে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে গাফেল না করে, তাহলে মূলত এমন ব্যবসাই মানুষকে অন্তরের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি দিতে পারে।

অন্যান্য জায়গার মতো আমি এখানেও উপস্থিত লোকদেরকে এ দিকে গুরুত্বের সাথে দৃষ্টি আকর্ষণ করি যে, তারা নিজেদের পরিবার-পরিজনের দ্বীনী

ভবিষ্যৎ উন্নত করার জন্যেও যেন কিছু সময় দেন এবং শিশুদের তালীম-তারবিয়াতের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেন। মুসলমানদের নিজস্ব পরিবেশে যেন তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

আলহামদুলিল্লাহ! উপস্থিত সুধীমন্ডলী মনোযোগের সাথে বান্দার নিবেদন শোনেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের সংকল্পও ব্যক্ত করেন। আল্লাহ করুন! তাদের এ সংকল্প যেন বাস্তবে পরিণত হয়। আমীন।

সে রাত আমরা তুয়ামাতে অতিবাহিত করি। পরের দিন অর্থাৎ বুধবার সকালে বিমানযোগেই টোকিও এবং সেখান থেকে আবিনা প্রত্যাবর্তন করি। সেখানে সে দিন অন্য কোন ব্যস্ততা ছিলো না।

হিরোশিমায়

বৃহস্পতিবারে আমাদের মেযবান জনাব আসেফ সাহেব আমাদেরকে বিমানযোগে হিরোশিমা নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন। সুতরাং আমরা সকাল সাতটায় 'হেনিদা' বিমান বন্দর থেকেই পুনরায় বিমানে আরোহণ করি। প্রায় সোয়া ঘণ্টা ওড়ার পর হিরোশিমার বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এর পুরোটিই সুদৃশ্য পাহাড়ি অঞ্চল। বিমানবন্দর শহর থেকে বেশ দূরে অবস্থিত। এখান থেকে একটি বাস প্রায় আধা ঘণ্টায় আমাদেরকে মধ্য শহরে পৌঁছে দেয়। এখন তো এটি উজ্জ্বল, উচ্ছল ও উন্নত একটি শহর। কিন্তু এটিই সে শহর, যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবার আমেরিকান এটম বোমের শিকার হয়েছিলো। এ ঘটনার পর এখন তেষট্টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখানে জীবনযাত্রা পরিপূর্ণ রূপে স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কিন্তু সেই বেদনাবিধুর ঘটনার দু'টি স্মৃতি এখনো রেখে দেয়া হয়েছে। আমরা সেই স্মৃতি দু'টি দেখার জন্যে একটি ট্যাক্সিতে আরোহণ করি। ট্যাক্সিচালক বলে যে, যে সব লোক তখন এটমের ধ্বংসযজ্ঞে প্রভাবিত হয়েও বেঁচে ছিলো, তাদের বংশধরদের মধ্যে এখনও কোন না কোন জন্মগত ত্রুটি দেখা যায়। এ কথা তো আমরা দূর থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু ট্যাক্সি চালক- যে বেশ শিক্ষিত ছিলো- এর সত্যায়ন করে। এরপর সে আমাদেরকে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের সামনে এনে দাঁড় করায়। ভবনটি একটি নদীর তীরে অবস্থিত। এটি ছিলো শহরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবন। যাকে 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন হল' বলা হতো। এটম বোম এ ভবন থেকে সত্তর গজ দূরে নদীর পুলের উপর বিস্ফোরিত হয়। এখান থেকে আড়াই কিলোমিটার দূর পর্যন্ত সমস্ত ভবন ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। তার মধ্যে একটি ভবনও খাড়া ছিলো না। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার যে, বোমা বিস্ফোরণ স্থলের ঠিক নিচের এ ভবনটি পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়নি। তার কিছু ধ্বংসাবশেষ রয়ে যায়। ভবনটির উপরে একটি গম্বুজ ছিলো। তার ছাদ ও দেয়াল তো ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু সিঁড়ির জাল যথাস্থানে

ঠিক থাকে এবং এখনো রয়েছে। ভবনের দেয়ালও ভেঙ্গে যায়, তবে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। সরকার ভবনটি ঐ অবস্থাতেই রেখে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটম বোমের ধ্বংসযজ্ঞের একটি আলামত রূপে এটি আজও অবশিষ্ট রয়েছে। তাতে লাগানো ঘড়িটিও রয়ে যায়। সোয়া আটটার সময় ঘড়িটি বন্ধ হয়ে যায়। কারণ, বোমা সকাল ঠিক সোয়া আটটায় ফেলা হয়েছিলো। তার পাশেই একটি পার্ক বানানো হয়েছে। পার্কে প্রবেশের মুখে দু'টি পাথর বসানো হয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে যে- ১৬ আগষ্ট, ১৯৪৫ ঈসায়ীতে পৃথিবীতে প্রথমবার এ ভবনের সামনের নদীর পুলের উপর এটম বোম নিক্ষেপ করা হয়। যা ভূমি থেকে তিন শ' মিটার উঁচুতে বিস্ফোরিত হয়। এর ফলে দুই লাখ মানুষ মৃত্যুবরণ করে। এটিই একমাত্র ভবন, যার ধ্বংসাবশেষ অবশিষ্ট থাকে। এটি এজন্যে রেখে দেয়া হেয়েছে, যেন আগামী প্রজন্ম এটম বোমের ধ্বংসলীলার একটি নমুনা দেখে ভবিষ্যতে এটম বোম ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

ভবন ও তৎসংলগ্ন পার্কের সম্মুখে ছোট সেই নদীটি রয়েছে, যার উপর এটম বোম নিক্ষেপ করা হয়েছিলো। তার পিছনেই একটি যাদুঘর বানানো হয়েছে। তার মধ্যে এটম বোমের এ ধ্বংসলীলার অনেকগুলি স্মৃতি সংরক্ষিত রয়েছে। 'যুদ্ধের স্মৃতি যাদুঘর' নাম না দিয়ে তার নাম দেয়া হয়েছে 'হিরোশিমার নিরাপত্তা স্মৃতি যাদুঘর' (Hiroshima Peace Memorial Museum)। এ নাম দেয়ার উদ্দেশ্য এই যে, এ সব ধ্বংসযজ্ঞ দেখে মানুষ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রেরণা লাভ করবে।

যাদুঘরের বড়ো একটি মডেল বোম পড়ার আগের শহরের দৃশ্য তুলে ধরে। অর্থাৎ, তা দেখে অনুমান করা যায় যে, বোম পড়ার আগে শহরের অবস্থা কেমন ছিলো। তাতে শহরটিকে সবুজ-শ্যামল ও বেশ ঘনবসতিপূর্ণ দেখা যায়। সুদূরবিস্তৃত ভবনসমূহ চোখে পড়ে। তার সাথেই আরেকটি মডেল রয়েছে। যা বোম পড়ার পরে শহরের ছবি তুলে ধরে। এ দ্বিতীয় মডেলে এভবনটির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অন্য কোন ভবন চোখে পড়ে না। পুরো এলাকা সমতল দেখা যায়। ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনসমূহের ছাইও মাটিতে মিশে গেছে। আড়াই কিলোমিটার এলাকার মধ্যে কোন একজন মানুষও বেঁচে ছিলো না, যে এ এলাকার ছবি উঠাবে, বা স্বচক্ষে দেখা অবস্থার বিবরণ দিবে। তবে যারা কয়েক কিলোমিটার দূরে ছিলো, তাদের মধ্যে যাদের কিছুটা চেতনা ছিলো তারা শহরের উপর আচ্ছন্ন ধোঁয়ার মেঘের ছবি উঠিয়েছে। সে ছবি এ যাদুঘরে দেখানো হয়েছে। যে বি.২৯ বিমানটি বোম নিক্ষেপ করেছিলো তার ছবিও রয়েছে। দূরে অবস্থানকারী যে সব লোক জীবিত থাকা সত্ত্বেও ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় তাদের ছবিও দেখানো হয়েছে যে, তাদের শরীর থেকে কীভাবে গোশত খুলে খুলে পড়েছে। মোটকথা, পুরো যাদুঘরটি এ ধ্বংসলীলার শিক্ষণীয় নমুনায় পরিপূর্ণ। এটম

বোমের ধ্বংসযজ্ঞের বিস্তারিত বিবরণ একটি গ্রন্থে সংরক্ষণ করা হয়েছে। গ্রন্থটি হিরোশিমা সিটি হলের পক্ষ থেকে পাঁচ ভলিউমে চার হাজার পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা হয়েছে। যার জাপানী নাম (Hiroshima Genbaku Sensai Shi) 'হিরোশিমার এটমী যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের রেকর্ড।' এ যাদু ঘরে সেই রেকর্ড গ্রন্থের নির্বাচিত অংশ সম্বলিত একটি পুস্তিকা বিক্রি হচ্ছিলো। আমরাও একটা ক্রয় করি।

এটম বোমের এ ট্রাজেডি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেখা দেয়। হিরোশিমার উপর আমেরিকা কেন এটম বোম ফেলেছিলো? এ প্রশ্নের উত্তর সেই পুস্তি কাটিতে দেয়া হয়েছে, যা 'হিরোশিমার নিরাপত্তা স্মৃতি যাদুঘর'-এ প্রত্যেক আগমনকারীর জন্যে রাখা হয়েছে। তাতে লিখেছে যে, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে যুদ্ধের সময় জাপানের শক্তি অনেক দুর্বল হয়ে গিয়েছিলো। আমেরিকা চাচ্ছিলো, যে কোনভাবে দীর্ঘ এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটুক। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তার নিকট কয়েকটি পথ ছিলো। একটি পথ এই ছিলো যে, তার সৈন্যবাহিনী জাপানে পাঠিয়ে সে নিজে একটি চূড়ান্ত আক্রমণ করবে এবং এ জন্যে সে তার মিত্রশক্তি রাশিয়ার নিকট থেকে সাহায্য নিবে। অবশেষে সে জাপান সরকারকে এ নিশ্চয়তা দিবে যে, তারা অস্ত্রসমর্পণ করলে তাদের এ শাসনব্যবস্থা ঠিক রাখা হবে। দ্বিতীয় পথ এই ছিলো যে, সে জাপানের উপর এটমের আক্রমণ করে এমন ধ্বংসলীলা চালাবে যে, জাপান অস্ত্র সমর্পণ করতে বাধ্য হবে। আমেরিকা এ দুই পন্থার মধ্যে এটম বোম ফেলার পন্থা এ জন্যে অবলম্বন করে যে, প্রথম পন্থা অবলম্বন করলে তার আশঙ্কা ছিলো যে, বিজয় লাভের পর জাপানে রাশিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি অনেক বৃদ্ধি পাবে। যা প্রতিরোধ করার কোন পথ তার কাছে থাকবে না। এ কারণে সে দ্বিতীয় পন্থাটি অবলম্বন করে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিলো তার জন্যে অধিক নিরাপদ। ঐ পুস্তিকার ভাষ্য মতে এটম বোম ফেলার জন্যে হিরোশিমা নগরীকে এ কারণে নির্বাচিত করা হয় যে, এ শহরে মিত্রবাহিনীর কোন সৈন্য বন্দী ছিলো না, বোমার আক্রমণে যার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা ছিলো।

যাইহোক, ৫ আগষ্ট ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের রাতে হিরোশিমার উপর সারা রাত একটু পর পর সাধারণ ধরনের বোমা নিক্ষেপ চলতে থাকে। যে কারণে মানুষ ঘুমাতে পারেনি। ভোরবেলা আকাশ পরিষ্কার হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়। মানুষ তখন নিজ নিজ কাজে যেতে আরম্ভ করে। কিন্তু সোয়া আটটার দিকে রেডিও থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, শত্রুপক্ষের তিনটি বিমান 'সাইজু' পর্যন্ত চলে এসেছে। এ ঘোষণা শেষ হওয়ার আগেই সমস্ত মানুষ এক সঙ্গে ভয়ঙ্কর আঘাত, ভূমিকম্প, তীব্র রশ্মি, ঝলসানো উত্তাপ, মোটকথা এটম বোমের যাবতীয় ধ্বংসলীলার শিকার হয়।

বোমটি আমেরিকান যুদ্ধজাহাজ বি. ২৯ নিক্ষেপ করেছিলো। যার নাম ছিলো- এনোলা গে (Enola Gay)। বোমটির দৈর্ঘ্য ১২০ ইঞ্চি, পুরু ২৮ ইঞ্চি ও ওজন ছিলো ৯ হাজার পাউন্ড। ভূপাতিত হওয়ার ৪৩ সেকেন্ড পর এটি বিস্ফোরিত হয়। এর থেকে পাঁচ কোটি সেন্টিগ্রেড তাপ নির্গত হয়। ভূপাতিত হওয়ার সাথে সাথে এক সেকেন্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের মধ্যে ১৮০ ফুট পুরু আগুনের একটি গোলা সৃষ্টি হয়। যার ভিতরের তাপমাত্রা ছিলো, তিন লাখ সেন্টিগ্রেড। একই সাথে পুরো শহরে প্রতি সেকেন্ডে ৮.২ মাইল গতিতে প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়। যার মধ্যে বিশ হাজার টনের সমান ধ্বংসযজ্ঞের ক্ষমতা ছিলো।

এ ভূমিকম্পের ফলে আড়াই কিলোমিটার এলাকার সমস্ত ভবন ভস্মে পরিণত হয়। সর্বত্র আগুন জ্বলে ওঠে। জানালার কাঁচ দুই মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের ধাক্কা সাঁইত্রিশ মাইল দূর পর্যন্ত অনুভূত হয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেয়া আলো কমপক্ষে আট মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। ধোঁয়ার মেঘ একটি ছাতার আকারে পুরো শহরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিছুক্ষণ পর পর আগুনের স্তম্ভ ভূমি থেকে আকাশে উঠতে থাকে। মানুষ আশ্রয় গ্রহণের জন্যে শহরের মধ্যবর্তী এলাকা অতিক্রম করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু নদীর মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিলো। ফলে তারা সবাই সেখানেই ডুবে মরে। পরে নদীর মধ্যে এতো লাশ দেখা যায় যে, চতুর্দিকে খুব কমই পানি দেখা যাচ্ছিলো। সড়কের উপর লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো। কতক গর্ভবতী মহিলার লাশ এ অবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাদের পেট ফেটে গিয়েছিলো এবং পাশেই শিশুর দেহ পড়ে ছিলো, যা জন্মের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছিলো।

বোমা ভূপাতিত হওয়ার পনেরো মিনিট পর এক অদ্ভূত ধরনের কালো বৃষ্টি আরম্ভ হয়। তার মধ্যে কালো কালো শিলা ছিলো। কয়েক মাইলব্যাপী সোয়া চার ঘণ্টা পর্যন্ত এ বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে। যাদের মাথার উপর অধিক পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, তাদের মাথার চুল উঠে যায়। যাদের পেটের মধ্যে এর পানি চলে যায়, ছয় মাস পর্যন্ত তারা পেটের পীড়ায় আক্রান্ত থাকে। বেলা এগারোটা থেকে তিনটা পর্যন্ত শহরের মধ্যে প্রচন্ড ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকে। যার ফলে আশেপাশের ছাদ উড়ে যায়। এক ইঞ্চি পুরু প্লেটও ঝড়ো হাওয়ায় উড়তে দেখা যায়। কিছু মানুষও বাতাসে উড়ে নদীর পুলের উপর আছড়ে পড়ে। নদীতে সৃষ্ট ঘূর্ণির ফলে আট ফুট উপর পর্যন্ত পানি উঠে যায়।

বোমা ভূপাতিত হওয়ার জায়গা থেকে কমপক্ষে আড়াই কিলোমিটার দূরেও যারা বেঁচে ছিলো, তারা উপরোক্ত ধ্বংসলীলার ফলে হয় আহত হয়েছে, না হয় তাদের দেহ ঝলসে গেছে। ধ্বংসযজ্ঞের প্রভাব যাদের উপর প্রচন্ড আকারে পড়েছে, তাদের শরীর থেকে গোশত খুলে খুলে পড়েছে। অনেকে তীব্র জ্বর,

দাস্ত ও বমির শিকার হয়েছে, যার কারণে অনেকের মৃত্যু ঘটেছে। বেশিরভাগ হাসপাতাল ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো এবং ডাক্তার মারা গিয়েছিলো, যে কারণে আহতদের দেখা-শোনারও কেউ ছিলো না। তাৎক্ষণিকভাবে যে সমস্ত সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিলো, তা ছিলো একেবারেই অপ্রতুল।

এটম বোমা দ্বারা হিরোশিমা আক্রমণের তিনদিন পর আমেরিকা নাগাসাকির উপর দ্বিতীয় বোমা ফেলে। এটি ছিলো তুলানামূলক ছোট এলাকা। ফলে হিরোশিমার তুলনায় এখানে কম ধ্বংসযজ্ঞ হয়। মৃতের সংখ্যা ৩৯ হাজার এবং আহতের সংখ্যা ছিলো ২৫ হাজার। শহরের চল্লিশ শতাংশ জায়গা ধ্বংস হয়ে যায়।

যে পুস্তিকার কথা আমি উপরে আলোচনা করেছি, তার মধ্যে জীবনের বিভিন্ন দিকে সংঘটিত ধ্বংসলীলার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। ধ্বংসলীলার শিকার লোকদের যে লোমহর্ষক বর্ণনা তাতে দেয়া হয়েছে, তা তুলে ধরার সুযোগ এ সফরনামায় নেই।

যে যাদুঘরে আমরা অবস্থান করছিলাম, তার মধ্যে এটম বোমের ধ্বংসলীলার বিভিন্ন দৃশ্য দেখানোর সাথে সাথে এ কথা লেখা ছিলো যে, এসব দৃশ্য ও ঘটনা দেখানোর উদ্দেশ্য এই যে, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন হিরোশিমা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, পৃথিবীর অন্য কোথাও যেন এ ট্রাজেডির পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং সমগ্র মানবতা এটমী আক্রমণের শিকার হওয়া থেকে রক্ষা পায় এ জন্যে সম্মিলিতভাবে যেন তারা চেষ্টা চালায়।

এটম বোমের ধ্বংসলীলা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তো পূর্ব থেকেই ছিলো, কিন্তু এ যাদুঘরের তুলে ধরা তথ্যাবলী থেকে তার ব্যাপকতা পূর্বের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি প্রমাণিত হয়। বাস্তবিকই যে কোন মানুষকেই এ বর্বরতার লক্ষ্য বানানো, জ্ঞান-বুদ্ধি ও নীতি-ধর্ম কোন দিকে থেকেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। মনুষ্যত্বের দাবি তো ছিলো এই যে, হিরোশিমার ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সে জাতি-ই এটমী অস্ত্রের ধ্বংস সাধনে অগ্রণী হবে, যারা লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ ও শহরের অধিবাসীকে এমন ধক্ষসংযজ্ঞের শিকার বানিয়েছে, যার কোন দৃষ্টান্ত পুরো মানব ইতিহাসে নেই। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মানবতার সাথে এতো বড়ো অবিচার করার পরেও তাদের অনুশোচনার কোন যে, অনুভূতি নেই শুধু তাই নয়, বরং তারা তাদের এ পদক্ষেপকে মানবতার উপর অনুকম্পা বলে আখ্যা দিয়ে আসছে। আমার নিকট ইন্সাইক্লোপেডিয়া বৃটানিকার যে পুরাতন সংস্করণ (১৯৫০) ছিলো, তার মধ্যে এটম বোমের পরিচয় দিতে গিয়ে তার ধ্বংসলীলার বিবরণ তো পরে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু চার্চিলের এ বাক্য দ্বারা প্রবন্ধের সূচনা করা হয়েছে যে, প্রথম এটম বোম, যা হিরোশিমায় নিক্ষেপ করা হয়, তার সম্পর্কে অনুমান করা হয় যে, তার

দ্বারা দশ লক্ষ আমেরিকানের প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। কারণ, এটম বোম যদি ফেলা না হতো, তাহলে যুদ্ধ অব্যাহত থাকতো এবং তাতে দশ লক্ষ আমেরিকান প্রাণ হারাতো। লক্ষ্য করে দেখুন! নিজেদের ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ডের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তারা কোথায় নামতে পারে!

এখন দীর্ঘ দিন ধরে আমেরিকান ও অন্যান্য পশ্চিমা শক্তি এটমী অস্ত্রের বিস্তার রোধের মৌখিক দাবি তো অনেক করেছে। এসব দাবির অধীনে দুর্বল জাতিসমূহকে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে এটমী অস্ত্র না বানানোর জন্যে বাধ্যও করা হচ্ছে। কিন্তু এ প্রহসনের কী উত্তর রয়েছে যে, তাদের এটমী অস্ত্র বানানোর অধিকারই শুধু নয়, বরং তা ব্যবহার করারও পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে, কিন্তু অন্যান্য জাতি আত্মরক্ষার জন্যেও যদি এটমী শক্তি অর্জন করতে চায়, তাহলে তাদেরকে সন্ত্রাসী ও গুন্ডা (Rogue) আখ্যা দেয়া হয়।

পৃথিবীকে এটম বোমের ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু তার প্রথম পদক্ষেপ হলো, যে সমস্ত বৃহৎ শক্তির নিকট ধ্বংসাত্মক এ সব অস্ত্র রয়েছে, তারা নিজেদের অস্ত্রসমূহকে নিজেরা প্রকাশ্যে ধ্বংস করবে। তখন এ সমস্ত চুক্তিকে অবশ্যই নিষ্ঠাপূর্ণ এবং কার্যকর মনে করা হবে। কিন্তু যে পর্যন্ত তা না করা হবে, সে পর্যন্ত এ সব চুক্তির মাধ্যমে এটম বোমের বিস্তারকে রোধ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর একটি দেশের নিকটও যদি এটম বোম থাকে, তাহলে তার প্রতিপক্ষেরও আত্মরক্ষার জন্যে এটমী শক্তির অধিকারী হওয়ার পরিপূর্ণ অধিকার থাকবে। জাপানের নিকটও যদি এটম বোম থাকতো, তাহলে আমেরিকার দুঃসাহস হতো না তার উপর এটম বোম ফেলার। বিধায় পৃথিবীকে এটমের ধ্বংসলীলা থেকে বাস্তবিকই যদি রক্ষা করতে হয়, তাহলে আমেরিকা ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তিকে তাদের এটমী অস্ত্রসমূহ নিজেরা ধ্বংস করতে হবে। অন্যথায়য় শক্তিধর দেশসমূহ নিজেদের পারমাণবিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকবে, আর অন্যদেরকে তা থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে, কৃত্রিম এ ব্যবস্থা দ্বারা ধ্বংসাত্মক এ প্রতিযোগিতাকে কখনোই রোধ করা সম্ভব হবে না।

কোবের সফর

যাইহোক, হিরোশিমার এ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আমরা সোজা রেলওয়ে ষ্টেশনে যাই। সেখানে জাপানের বিখ্যাত বুলেট ট্রেনে আরোহণ করি। বলা হয় যে, এটি পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী ট্রেন। ইউরোপের ইউরো স্টার, যাতে আরোহণ করে আমি কয়েক বার লন্ডন ও প্যারিসের মধ্যে ভ্রমণ করেছি। English Channel সমুদ্র তলের একটি সুরঙ্গের মাধ্যমে মাত্র বিশ মিনিটে অতিক্রম করে। জাপানের এ বুলেট ট্রেন তার সমকক্ষ তো অবশ্যই, বরং তার চেয়েও

দ্রুতগামী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ট্রেনটি প্রায় এক ঘণ্টায় আমাদেরকে জাপানের আরেক প্রসিদ্ধ শহর 'কোবে' নিয়ে যায়।

কোবে-র রেলওয়ে ষ্টেশনে জনাব হাসান জিয়া সাহেব আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিলেন। মুসলমানদের জন্যে এ দিক থেকে কোবের গুরুত্ব রয়েছে যে, জাপানে সর্ব প্রথম মসজিদ এখানেই নির্মাণ করা হয়। প্রথমে প্রোগ্রাম এভাবে তৈরী করা হয়েছিলো যে, আমরা জুমারদিন এখানে পৌঁছবো। জুমার সময় আমাকে এখানে বয়ান করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে আমার প্রোগ্রাম পরিবর্তিত হয়। আমাকে আবিনাতেই জুমার দিন অতিবাহিত করতে হয়। এ কারণে আমাদের মেযবানগণ এ সিদ্ধান্ত নেন যে, কোবের ঐতিহাসিক এ মসজিদটি কমপক্ষে দেখে যাওয়া হোক। সুতরাং রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে আমরা সে মসজিদেই চলে যাই। মসজিদটি শহরের মাঝখানে অবস্থিত। যোহরের নামায ঐ মসজিদে আদায় করি।

বিভিন্ন দেশ থেকে জাপানে এসে বসবাসকারী কতিপয় মুসলমান ১৯৩৫ ঈসায়ীতে সর্বপ্রথম এ মসজিদটি নির্মাণ করেন। তাদের মধ্যে বেশকিছু হিন্দুস্তানী মুসলমানও ছিলেন। তাদের মধ্যে সচ্ছল ব্যবসায়ী হাজী ফিরোজুদ্দীন সাহেব মসজিদ নির্মাণের যাবতীয় ব্যয়ের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নিজে বহন করেন। অবশিষ্টাংশ অন্যান্য মুসলমানের নিটক থেকে চাঁদার মাধ্যমে ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে অত্যন্ত সুন্দর আড়ম্বড়পূর্ণ এ মসজিদটি নির্মিত হয়।

জামেয়া আযহার থেকে পাশ করা আলেম শাইখ মুহসিন শাকের বিউমী বর্তমানে মসজিদের ইমাম ও খতীব। তিনি উষ্ণ ভালোবাসার সাথে আমাদেরকে স্বাগত জানান। সম্ভবত আমার আরবী গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে তিনি আমার সম্পর্কে পূর্ব থেকে অবগত ছিলেন। অত্যন্ত মহব্বতের সাথে তিনি মসজিদ পরিদর্শন করান। তিনি বলেন যে, মসজিদটি ১৯৩৫ ঈসায়ী থেকে এ পর্যন্ত সেভাবেই দাঁড়িয়ে আছে, যেভাবে প্রথম নির্মিত হয়েছিলো। এর ভবন, এমনকি দেয়ালের মধ্যেও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। আল্লাহ তাআলার কুদরতের এটিও একটি বিস্ময় যে, এ দীর্ঘ সময়ে আশেপাশের পুরো শহর দুই-দুই বার বিরান হয়ে গিয়েছিলো। প্রথমবার দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের বোমা বর্ষণকালে। দ্বিতীয়বার প্রচন্ড এক ভূমিকম্প হলে। এ উভয় সময় আশেপাশের সমস্ত ভবন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। শুধুমাত্র এ মসজিদটি যথাস্থানে অক্ষত ছিলো। মসজিদের প্রবেশ পথে ফ্রেমে আটকানো পুরাতন একটি ছবি রয়েছে। তাতে পরিষ্কারভাবে দেখা যায় যে, এলাকাটির সমস্ত ভবন ধ্বংস হয়ে গিয়ে একটি ময়দানে পরিণত হয়ে গেছে। কিন্তু ময়দানের মাঝে মসজিদটি অক্ষতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মসজিদটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, যারা এটি তৈরী করেছেন, তারা শহরের আরো কিছু ভবন ক্রয় করে মসজিদের জন্যে ওয়াক্ফ করেছেন। সেগুলোর আয় দ্বারা

মসজিদের সমস্ত ব্যয় সম্পন্ন হয়। এর জন্যে কোন চাঁদা উঠনোর প্রয়োজন পড়ে না। বরং মসজিদের নামে কোন চাঁদা উঠানো নিষেধ। শুধু একটি কৌটা মসজিদে রেখে দেয়া আছে। কেউ যদি মসজিদের খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করতে চায়, সে নিজ তাওফীক মতো তার মধ্যে টাকা ফেলে দিবে। মসজিদের একেবারে সাথে একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যা দাওয়াত ও তালীমের দায়িত্ব সম্পাদন করছে।

ইয়োকোহামা শহরে

কোবে-র মসজিদে আছরের নামায পড়ার পর আমরা পুনরায় বুলেট ট্রেনে আরোহণ করি। কোবের সাথেই জাপানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর ওসাকা অবস্থিত। সফরের মাঝে ট্রেন সে শহরটিও এক ঝলক দেখিয়ে দেয়। তারপর প্রায় ছয়শ' কিলোমিটারের সফর আড়াই ঘণ্টায় সম্পন্ন করে ইয়োকোহামা ষ্টেশনে নামিয়ে দেয়। এটি টোকিও সংলগ্ন বিখ্যাত বানিজ্যিক ও শিল্প শহর। সেখানে বড়ো একটি বন্দরকেন্দ্রও রয়েছে।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ শহরে নিয়মতান্ত্রিক কোন মসজিদ ছিলো না। কিছু দিন পূর্বে এখানে একটি শানদার মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এর ব্যবস্থাপকগণ বার বার আমাকে বলছিলেন যে, কয়েক বছর পূর্বে আপনার বড়ো ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী ওসমানী সাহেব (মুদ্দা যিল্লুহুম) যখন তাশরীফ এনেছিলেন, তখন এখানে কোন মসজিদ ছিলো না। তিনি তখন অস্থায়ী নামায ঘরে দুআ করেছিলেন- 'আল্লাহ তাআলা এখানে মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা করে দিন।' আলহামদুলিল্লাহ! সে দুআ কবুল হয়েছে। এখানে এখন পরিপূর্ণ একটি মসজিদ তৈরী হয়েছে। তাই আপনি এখানে আসার জন্যে অবশ্যই সময় বের করবেন। এখানে আপনার বয়ানও হতে হবে। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর সম্ভাব্য যে পন্থা দেখা যাচ্ছিলো তা হলো, কোবে থেকে ফেরার পথে ইশার নামায আমরা ঐ মসজিদে পড়বো এবং নামাযের পর বয়ান হবে। সুতরাং মসজিদের ব্যবস্থাপকগণের মধ্যে থেকে জনাব সামী' সাহেব প্রমুখ রেলওয়ে ষ্টেশনে স্বাগত জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিলেন। মসজিদে আমরা ইশার নামায পড়ি। সারা দিনের সফরের কারণে শরীর ক্লান্তিতে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাদের ইখলাসের বরকতে ইশার নামাযের পর প্রায় এক ঘণ্টা বয়ান হয়। তাতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদীসের ব্যাখ্যা তুলে ধরি, যার মধ্যে তিনি ইরশাদ করেছেন যে-

'মানুষ যখন মারা যায়, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল এমন রয়েছে, যা তার আমলনামায় অবিরত সওয়াব বৃদ্ধির কারণ হয়। **এক.** সে যদি কোন সদকায়ে জারিয়া রেখে যায়। **দুই.** সে যদি কোন ইলম

রেখে যায়, যার দ্বারা মানুষ পরবর্তীতেও উপকৃত হয়। **তিন.** সে কোন নেক সন্তান রেখে গেলো, যে তার জন্যে দুআ করতে থাকে।'

আমি নিবেদন করি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে এ মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে একটি সদকায়ে জারিয়া করে যাওয়ার তাওফীক দান করেছেন। এখন ইলমের প্রচার এবং নেক সন্তান তৈরীর উদ্দেশ্যে আপনারা আপনাদের সন্তানদের জন্যে এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করুন, যা ইসলামী পরিবেশে নতুন প্রজন্মের জন্যে উপযুক্ত তালীম-তারবিয়াতের ব্যবস্থা করবে। আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের জন্যে ঈমানের দৌলত রেখে গেছেন। আমাদের সন্তানদেরকে এ দৌলত দ্বারা সমৃদ্ধ করার ব্যবস্থা করা এখন আমাদের দায়িত্ব।

বয়ানের পর অনেক রাতে আমরা সেখান থেকে ফিরে আসি। সারাদিনের লম্বা সফরের পর অবস্থানস্থল আবিনা পর্যন্ত পৌঁছতে আরো প্রায় সোয়া ঘণ্টা সময় লাগে।

পরদিন জুমাবার। এটি ছিলো জাপানে অবস্থানের শেষ দিন। বিগত দিনগুলোতে অবিরাম সফর ও কর্মব্যস্ততায় দেহ-মন ভীষণ ক্লান্ত ছিলো। সেদিন জুমার বয়ান ছাড়া আর কোন কর্মসূচী ছিলো না। তাই অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম ও কুরআন তরজমার কাজে অতিবাহিত করি। আল্লাহর মেহেরবানীতে সূরায়ে হাশরের তরজমা ও টীকার কাজ সম্পন্ন হয়। আমাদের মেযবান হামেদ আযীয সাহেব মাগরিবের নামাযের পর তার বাড়িতে খানা খাওয়ার জন্যে দাওয়াত করেছিলেন। তিনি প্রায় বিশ বছর ধরে জাপানে রয়েছেন। তার বিবিও জাপানী নও মুসলিম। তিনি এ দাওয়াতে নিখাদ জাপানী ধাঁচের খাবারের আয়োজন করেন। বসার ব্যবস্থাও করেছিলেন জাপানী ধাঁচে। তারা বলেন যে, জাপানের লোকেরা অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। তারা মাটিতেই ঘুমায় এবং মাটিতে বসেই খাবার খায়। তবে মাটিতে বসার সময় সাধারণত সাথে একটি চৌকি থাকে। তার উপর খাবার সাজানো হয়। চৌকির নিচে একটি চতুষ্কোণ গর্ত থাকে। তার মধ্যে পা ঝুলিয়ে খেতে বসে। শীতের দিন গর্তটি গরম থাকে। ফলে পা গরম থাকে। জাপানিজরা নিজের কাজ নিজে করতে অভ্যস্ত। অর্থশালী লোকেরাও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বাড়িতে চাকর রাখে না। ঘর পরিষ্কার করা থেকে নিয়ে খাবার পাকানো পর্যন্ত যাবতীয় কাজ মহিলারা নিজেরাই করে থাকে। বাচ্চাধারী মহিলারা বাচ্চাকে কোমরের সাথে বেঁধে কাজ করতে থাকে।

১৯৪৫ ঈসায়ীতে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হওয়ার পর জাপান যে বিস্ময়কর গতিতে উন্নতি করেছে এবং দেশজ শিল্প থেকে আরম্ভ করে নাগরিক ব্যবস্থাপনাকে যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার কারণসমূহের মধ্যে তাদের সহজ-সরল জীবন প্রণালী, পরিশ্রম, কষ্টসহিষ্ণুতা, সময়ের মূল্যায়ন, সাজগোছের পিছনে সময় ও অর্থ ব্যয় না করা ও জাতীয় মর্যাদা ও

আত্মসম্মানবোধের মতো গুণাবলী সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। তারা নিজেদের পুরো জীবনব্যবস্থা নিজেদের জাতীয় চাহিদা অনুপাতে বিন্যস্ত করেছে। তাদের ভাষা পৃথিবীর জটিল ভাষাগুলোর অন্যতম। বিশেষ করে লিপিপদ্ধতি চরম জটিল। একই ভাষার তিনটি লিপিপদ্ধতি চালু রয়েছে। তার মধ্যে প্রাচীনতম লিপিপদ্ধতিকে 'খাঁজী' বলে। তার জন্যে বর্ণমালা নেই। প্রত্যেক অক্ষরের জন্যে পৃথক পৃথক নকশা শিখতে হয়। এভাবে এ ভাষাকে আয়ত্ত করতে হাজার হাজার শব্দের পৃথক পৃথক নকশা শিখতে হয়। দু'টি লিপিপদ্ধতি পরবর্তীতে সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে একটিকে 'খাতেগানা' আর অপরটিকে 'হরগানা' বলা হয়। এগুলোর বর্ণমালা রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা অনেক। জাপানিজ ভাষা এ তিন পদ্ধতিতেই লেখা হয়। জটিল এ লিপিপদ্ধতিকেই তারা এমনভাবে গ্রহণ করেছে যে, তাদের কম্পিউটার এ লিপিপদ্ধতিতেই কাজ করে থাকে। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা এ ভাষাতে এবং এ লিপিপদ্ধতিতেই দেয়া হয়ে থাকে।

জাপানের এ সমস্ত অবস্থাকে যখন আমাদের নিজেদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখি, তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। কুরআন-হাদীসের আলোকে যে সমস্ত গুণ মুসলমানদের অর্জন করার কথা ছিলো, অমুসলিমরা সেগুলো ধারণ করে পৃথিবীতে উন্নতির ধাপসমূহ অতিক্রম করে চলেছে। আর মুসলমানগণ নিজেদের ঘরের এ সমস্ত সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়া থেকে রয়েছে বঞ্চিত। জাপানিজ জীবন দেখার পর এ সব চিন্তা মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে থাকে। অবশেষে ১৭ মে বেলা এগারোটায় টোকিওর নিরিতা বিমানবন্দর থেকে ফিরতী সফর আরম্ভ হয়। প্রায় ষোল ঘণ্টা সফরের পর আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে নিরাপদে করাচী পৌঁছি।

ল্যাটিন আমেরিকার সফর

ব্রাজিল, পানামা, ত্রিনিদাদ, বারবাডোজ

(শাওয়াল, ১৪২৯ হিজরী, অক্টোবর, ২০০৮ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সাধারণত আমরা 'আমেরিকা' বলে শুধুমাত্র উত্তর আমেরিকার ঐ সব দেশ বুঝিয়ে থাকি, যেগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংরেজীতে ইউনাইটেড স্টেট বলে। যা বর্তমানে পৃথিবীর পরাশক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে আমেরিকা দুটি বড়ো মহাদেশের নাম। একটি মহাদেশের নাম, উত্তর আমেরিকা। যার সবচেয়ে বড়ো দেশ কানাডা। যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোও তার মধ্যে অবস্থিত। আর দ্বিতীয় মহাদেশকে বলা হয়, দক্ষিণ আমেরিকা। যা কলম্বিয়া থেকে আর্জেন্টাইন ও চিলি পর্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে শেষ প্রান্তে একটি দীর্ঘ স্থলভাগ রয়েছে। যার মধ্যে মেক্সিকো থেকে নিয়ে পানামা পর্যন্ত ছোট ছোট অনেকগুলি দেশ অবস্থিত। এ অঞ্চলটি যদিও উত্তর আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু পরিভাষায় একে মধ্য আমেরিকা এবং ইংরেজীতে সেন্ট্রাল আমেরিকা বলে। উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, এই তিন অঞ্চলের যে সমস্ত দেশ ইংরেজীর পরিবর্তে অন্যান্য রোমান ভাষা (Romance Language) যেমন, স্প্যানীশ, পর্তুগীজ ও ফরাসী ভাষা বলে, সেগুলোকে ল্যাটিন আমেরিকা বলা হয়। কেউ কেউ ল্যাটিন আমেরিকা আর দক্ষিণ আমেরিকাকে সমার্থক মনে করে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। যদিও দক্ষিণ আমেরিকার পুরা মহাদেশ ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু ল্যাটিন আমেরিকার মধ্যে মেক্সিকোও অন্তর্ভুক্ত। যার বিরাট অংশ উত্তর

আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত। মধ্য আমেরিকার সমস্ত দেশকেও ল্যাটিন আমেরিকা বলা হয়। তারা বেশির ভাগ স্প্যানীশ ভাষা বলে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের (Atlantic Ocean) সাথে সংযুক্ত একটি সমুদ্র রয়েছে। যাকে ক্যারীবিয়ান উপসাগর (Caribian Sea) বলা হয়। এ সমুদ্রের মধ্যে কয়েকটি বড়ো দ্বীপ রয়েছে। যেগুলোকে 'জাযায়েরে গারবুল হিন্দ' এবং ইংরেজীতে ওয়েষ্ট ইন্ডিজ বলা হয়। এর প্রত্যেকটি দ্বীপ এখন স্বাধীন রাষ্ট্র। ব্রিটানিকার তথ্য অনুযায়ী ব্যাপক অর্থে এ দ্বীপগুলোকে ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয়।

বক্ষমান ভ্রমণকাহিনীতে আমার যে সফরের আলোচনা করতে যাচ্ছি, তার মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, মধ্য আমেরিকার পানামা এবং ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ত্রিনিদাদ ও বারবাডোজ অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ব্যাপক অর্থে যেহেতু এ সবগুলো দেশ ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত, তাই এর শিরোনাম দেয়া হয়েছে 'ল্যাটিন আমেরিকার সফর'।

আমি প্রায় আড়াই বছর ধরে পানামা ও ত্রিনিদাদের কতিপয় মুসলমানের পক্ষ থেকে ঐ সব দেশ সফর করার দাওয়াত পেয়ে আসছিলাম। কিন্তু এ দেশগুলো যেহেতু অনেক দূরে অবস্থিত এবং এগুলোতে সফর করার জন্যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন, এ জন্যে আমি এড়িয়ে যেতে থাকি। অবশেষে এ বছর ১৪২৯ হিজরীতে ঈদুল ফিতরের পর এর জন্যে প্রায় তিন সপ্তাহ সময় বের করতে সক্ষম হই। প্রথমে পানামা যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো, তারপর ত্রিনিদাদ। পানামা যাওয়ার সম্ভাব্য কয়েকটি পথ ছিলো। কিন্তু বেশ কয়েকটি কারণে আমি ব্রাজিলের পথে যাওয়াকে অধিক উপযুক্ত মনে করি। ব্রাজিলেও কয়েকদিন কাটানোর ইচ্ছা ছিলো। এভাবে ব্রাজিলও এ সফরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অতঃপর বারবাডোজের কিছু বন্ধু আমার এ সফর সম্পর্কে জানতে পেরে তারাও সেখানে যাওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করেন। এভাবে শেষের দুই দিন সেখানেও যাওয়া হয়।

৭ ও ৮ই শাওয়াল দুবাইয়ের দুদিনের মিটিং থেকে অবসর হওয়ার পর ৯ই শাওয়াল মোতাবেক ১৯ শে অক্টোবর ২০০৮ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় আমিরাত এয়ারলাইনসে ব্রাজিলের সর্ববৃহৎ শহর সাওপালুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। দুবাই থেকে সাওপালুর দূরত্ব প্রায় তের হাজার কিলোমিটার। আমিরাত এয়ারলাইনস সাওপালুর উদ্দেশ্যে সরাসরি বিমান চালু করেছে। যা প্রায় সাড়ে পনেরো ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছে। এ এয়ারলাইনসে অতীতে আমি অনেক বার ভ্রমণ করেছি, যে কারণে আমার কাছে তার অনেকগুলো পয়েন্ট রয়েছে। ঐ পয়েন্টের ভিত্তিতে এয়ারলাইনস বিনামূল্যে আপগ্রেড করে আমাকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেয়। সাম্প্রতিককালেই এয়ারলাইনস বোয়িং ০০২-৭০৭ বিমানটি

কিনেছে। তার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে পৃথক ছোট একটি সুন্দর কক্ষ রয়েছে। যা দরজা দ্বারা বন্ধ করার ব্যবস্থাও রয়েছে। আসন ছড়িয়ে বিছানায় পরিণত করা যায়। তাছাড়া তার মধ্যে লেখার টেবিল, ছোট একটি আলমারী এবং আরো অনেক সুব্যবস্থা রয়েছে, যেগুলো বিমানের মধ্যে থাকার কথা পূর্বে কল্পনাও করা যেতো না। এ কারণে আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে দীর্ঘ এ সফর বেশ আরামদায়ক হয়। বিগত প্রায় দশ-বারো বছর ধরে বিমানে সম্পন্ন করার মতো কুরআনে কারীম বিষয়ে লেখালেখির কোন না কোন কাজ আমার সঙ্গে থাকতো। প্রথমে মাআরিফুল কুরআনের ইংরেজী তরজমা, তারপর আমার ইংরেজী তরজমা, যা 'নোবেল কুরআন' নামে প্রকাশিত হয়েছে। শেষে কুরআনে কারীমের নতুন উর্দূ তরজমা এবং ব্যাখ্যামূলক টীকা, এ তিনটি কাজের বিরাট অংশ বিমানেই সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ! উর্দূ তরজমার এ কাজও পবিত্র রমাযান মাসে পরিপূর্ণ হয় এবং এখন তা মুদ্রণাধীন রয়েছে। এ কারণে বহু বছর পর এটি ছিলো বিমানের প্রথম দীর্ঘ সফর, যার মধ্যে কুরআনে কারীমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত কোন কাজ আমার সঙ্গে ছিলো না। যে কারণে এ সফরটি পানসে ধরনের লাগছিলো। তবে অন্য একটি কাজ এ সফরে আমার সঙ্গে ছিলো। তা হলো রাজনৈতিক বিভিন্ন মতবাদ ও তৎসম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা বিষয়ে কয়েক বছর পূর্বে আমি দারুল উলূমে একটি কোর্স করিয়েছিলাম। তাতে সারা দেশ থেকে ওলামায়ে কেরাম অংশ নিয়েছিলেন। সেই কোর্সের বক্তব্যগুলো আমার দোস্ত মাওলানা মুযযাম্মিল কাপড়িয়া সাহেব টেপ রেকর্ডারের সাহায্যে কম্পিউটারে কম্পোজ করেছিলেন। মাওলানা মুযযাম্মিল সাহেবকে প্রতি সপ্তাহে তিনবার কিডনির ডায়ালাইসিস করাতে হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে অসাধারণ সাহস দ্বারা ভূষিত করেছেন। এ ডায়ালাইসিস চলাকালে তিনি টেপরের্কডার থেকে শুনে শুনে এ বক্তব্যগুলো কম্পোজ করতে থাকেন। এভাবে কয়েকশ' পৃষ্ঠার এ সংকলনটি তিনি সংশোধনের জন্যে আমার কম্পিউটারে দিয়ে দেন। এ সফরে আমি এর সংশোধনের কাজ আরম্ভ করি। বিমানের মধ্যে একাগ্রতার সঙ্গে দীর্ঘ সময় এ কাজে মগ্ন থাকি।

বিমান প্রথমে ইয়েমেনের দিক থেকে আরব উপদ্বীপ অতিক্রম করে লোহিত সাগরে প্রবেশ করে। অতঃপর হাবশা (ইথিওপিয়া) এর দিক থেকে আফ্রিকা মহাদেশে প্রবেশ করে। আফ্রিকাকে প্রস্থে অতিক্রম করে কঙ্গো ও এঙ্গোলার দিক থেকে বের হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর উড়তে আরম্ভ করে। সমুদ্রের উপর দিয়ে একাধারে প্রায় নয় ঘণ্টা ওড়ার পর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশ করে বিমান যখন সাওপালুর বিমানবন্দরে অবতরণ করে তখন সেখানকার হিসাবে সন্ধ্যা সাতটা বাজছিলো। সাওপালুর সময় দুবাইয়ের সময় থেকে আট ঘণ্টা এবং পাকিস্তানের সময় থেকে নয় ঘণ্টা পিছিয়ে।

ব্রাজিলের শহর সাওপালুতে

আমাদের মেজবান জনাব আলী আহমাদ সাইফী স্বাগত জানানের জন্যে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মূলত লেবাননী বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা দীর্ঘ দিন ধরে ব্রাজিলে অবস্থান করেন। দুবাইতে বসবাসরত আমার দোস্ত জনাব ইসহাক নূর ও আমানুল্লাহ সাহেবের মধ্যস্থতায় তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমার কিতাবসমূহের মাধ্যমে আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ব্রাজিলে অবস্থনকালে তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে আমার মেহমানদারী করেন। সাওপালু ব্রাজিলের সর্ববৃহৎ বাণিজ্যনগরী। যার জনসংখ্যা দেড় কোটি বলা হয়। আলী আহমাদ সাইফী সাহেব তাঁর বাড়ির সন্নিকটে হোটেল সদৃশ যে ফ্ল্যাটে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা সাওবারনারডু নামের এক মহল্লায় অবস্থিত। যানজটের কারণে সেখানে পৌঁছতে দেড়ঘণ্টা সময় লেগে যায়। ঋতু ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ঠান্ডা। সেখানেই সে রাত অতিবাহিত করি।

ব্রাজিল দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো দেশ। যা ৩২,৮৬,৪৮৭ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত। যে কারণে পুরো মহাদেশের প্রায় অর্ধেক ভূখন্ড এ দেশের। দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর মধ্যে এদেশের জনবসতি সর্বাধিক। খ্রিস্ট পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত জগদ্বাসীর নিকট এ ভূখন্ড ছিলো অনাবিষ্কৃত। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের এক নৌ-কমান্ডার (Pedro Alvares Cabral) কলম্বাস ও ভাস্কোডাগামার মতো ভারতের পথ আবিষ্কারের জন্য বের হন। পথ হারিয়ে তিনি দক্ষিণ আমেরিকায় চলে এসে ব্রাজিলের এ অঞ্চল আবিষ্কার করেন। সে সময় এখানে যে জাতি বাস করতো, তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়নি। তবে বলা হয় যে, তারা ছিলো অসভ্য জাতি। ধীরে ধীরে পর্তুগীজরা যখন জানতে পারলো যে, এখানে অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, তখন তারা এটা দখল করে নেয় এবং একে পর্তুগালের উপনিবেশ বানায়। এ কারণে এদেশে পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলা হয়। পর্তুগালের অধিপত্যের পর এ অঞ্চলের আসল অধিবাসীরা দূর-দুরান্তের গ্রামসমূহে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। এখানকার অধিবাসীদের বিরাট সংখ্যক ছিলো তাদের, যারা পর্তুগাল থেকে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। এছাড়াও পর্তুগাল সরকার ক্ষেত-খামারের কাজ করার জন্যে আফ্রিকার অনেক কৃষ্ণাঙ্গকে গোলাম বানিয়ে আনে। এভাবে এখানে আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গদের বিরাট জনবসতি গড়ে ওঠে। অপরদিকে ইউরোপের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক শেতাঙ্গ এসে বসতি স্থাপন করে। এখানকার বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে একটি মিশ্র জাতির উদ্ভব হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত ব্রাজিল পর্তুগালের অধীনে থাকে। পরবর্তীতে সেখানে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়। অবশেষে ৭ সেপ্টেম্বর ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে তারা পর্তুগাল থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন দেশে

পরিণত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ব্যবসা ও শিল্পের উপযুক্ত ক্ষেত্র হওয়ায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ড থেকে মানুষ মাতৃভূমি ছেড়ে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। তার মধ্যে আফ্রিকা ছাড়া ইউরোপ ও আরব দেশের অধিবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত। সেই আরব লোকদের মধ্যে অনেক মুসলমানও ছিলেন। তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এখন দশ লাখে পৌঁছেছে। তাদের মধ্যে ষাট শতাংশের কাছাকাছি হবে ব্রাজিলীয় নওমুসলিম। এরপর আরবী বংশোদ্ভূত মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। তাদের মধ্যেও লেবাননের অধিবাসীদের সংখ্যা বেশি। এখন কিছু সংখ্যক পাকিস্তানীও রয়েছে।

আলী সাইফীর পিতা আহমাদ সাইফী দীর্ঘদিন পূর্বে লেবানন থেকে ব্রাজিলে স্থানান্তরিত হন। তিনি এখানে মসজিদসমূহ নির্মাণ এবং ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। আমার অবস্থানের দ্বিতীয় রাতে আমার সম্মানে তিনি তাঁর বাড়িতে নৈশভোজের আয়োজন করেন। সেখানে শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করেন। সেখানে তাঁরা বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ! ব্রাজিলে একশ'র উপরে মসজিদ রয়েছে। শুধু সাওপালু প্রদেশেই পঞ্চাশটা মসজিদ রয়েছে। তারা আরো বলেন যে, ব্রাজিলের অধিবাসীদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করার আগ্রহ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পর্তুগীজ ভাষায় ইসলাম প্রচারের যদি ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে এর সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। (এ সংক্ষিপ্ত অবস্থানকালে কয়েকজন নওমুসলিমের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার কাছেও এ বাস্তবতা তীব্রভাবে অনুভূত হয়েছে। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো।) সে নৈশভোজে যাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়, তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে ধার্মিক ও ধর্মীয় আবেগ-উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত পাই। তারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা আমাকে জানান। আমার আসার সংবাদ শুনে পাকিস্তানী তরুণ ফারহান ডিসাই সাহেব তার কয়েকজন বন্ধুসহ তিন ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে এখানে এসে পৌঁছান। এরা তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে এ দেশে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। তারা বলেন যে, আলহামদুলিল্লাহ! এখানে তাবলীগ জামাতের কাজ তৎপরতার সঙ্গে অব্যাহত রয়েছে।

ব্রাজিলে মুরগীর খামার এতো অধিক যে, তারা সারা বিশ্বে তা রপ্তানী করে। সৌদী আরব ও উপসাগরীয় দেশসমূহে সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে মুরগীর মাংস রপ্তানী হয়। যদিও লেখা থাকে যে, ইসলামী পদ্ধতিতে সেগুলো জবাই করা, কিন্তু তার বাস্তবতা সম্পর্কে সবসময় সন্দেহ-সংশয় থাকে। কারণ ঐ সব দেশে সাধারণত মেশিনের মাধ্যমে মুরগী জবাই করা হয়। আর তাতে শরীয়তের শর্তসমূহ পূরণ হয়না। এ কারণে আমরা তা খাওয়ার পরামর্শ দেই না। আমার লিখিত 'আহকামুয যাবায়েহ' কিতাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনা করেছি। আমি পানামা যেতে ব্রাজিলের পথ অবলম্বন করার একটি কারণ এও ছিলো যে, এখানে অবস্থানকালে এ বিষয়ে হয়তো অধিক তথ্য জানার সুযোগ হবে। এবং আলী সাইফী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগের কারণ এই ছিলো যে, তিনি এবং তার পিতা সে কয়জন ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত, যারা সেখানে মুরগী জবাইয়ের তত্ত্বাবধান করে থাকেন এবং এর সনদপত্র দিয়ে থাকেন। আমি ব্রাজিল পৌঁছার কয়েকদিন পূর্বে তাদের নিকট আবেদন করি যে, আমার অবস্থানকালে সম্ভব হলে তারা যেন জবাই পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তারা বলেন যে, ব্রাজিলে জবাই কারখানার আইন এই যে, বহিরাগত কাউকে জৈব নিরাপত্তা পদ্ধতি সম্পন্ন (Quarantine) করার পর কারখানায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়। এ কারণে সংক্ষিপ্ত এ অবস্থানকালে জবাই পরিদর্শন সম্ভব নয়। মৌখিকভাবে তারা বলেন যে, কারখানাগুলোতে মুসলমানদের জন্যে মুরগী জবাই করার যে নির্দিষ্ট সময় রয়েছে, তখন মুরগীগুলোকে মেশিনের সাহায্যে জবাই করা হয় না। বরং চারজন কর্মচারী হাতে ছুরি নিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। মুরগী যখন তাদের সামনে দিয়ে যায় তখন তারা 'বিসমিল্লাহ' বলে সেগুলা হাত দিয়ে জবাই করে। এটা সেই পদ্ধতি, 'আহকামুয যাবায়েহ' কিতাবে আমি যার প্রস্তাব করেছি। এর মাধ্যমে এ ভুলবোঝাবুঝি তো দূর হয় যে, সেখানে মেশিনের ছুরি দ্বারা মুরগী জবাই করা হয়, কিংবা 'বিসমিল্লাহ' পড়ার জন্যে কোন টেপ চালু করে দেয়া হয়। কিন্তু আলী সাইফী ও আহমাদ সাইফী দু'টি বিষয় স্বীকার করেন। একটি এই যে, যদিও আমরা জবাইকারীদের উপর এ বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছি যে, তারা প্রত্যেক মুরগীর উপর 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করবে এবং তাদের ডিউটির সময় অন্য কোন কাজে মনোনিবেশ করবে না। কিন্তু তারপরেও তো তারা মানুষ। হাঁচি-কাশি তাদের আসতেই পারে। যে দ্রুত বেগে তাদের সম্মুখ দিয়ে মুরগী পার হয়ে যায়, সে দৃষ্টিতে কিছু মুরগী 'বিসমিল্লাহ' পড়া ছাড়াই পার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। দুই, সব জবাইখানায় জবাই করার জন্যে মুসলমান কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে যায়। কারণ জবাইয়ের এসব কারখানা শহর থেকে দূরে এমন এলাকায় রয়েছে, মুসলমানগণ যেখানে থাকা পছন্দ করে না। এ কারণে কতক জায়গায় খ্রিস্টানদেরকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তাদের উপর আল্লাহর নামে জবাই করার বাধ্যবাধকতাও আরোপ করা হয়েছে। এখন বাস্তবে তারা এর প্রতি কতোটুকু গুরুত্বারোপ করে সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

তাছাড়া তাদের বর্ণনা মতে ব্রাজিলে কমবেশি পঞ্চাশটি জবাইখানা রয়েছে। যার প্রত্যেকটিতে প্রতিদিন হাজার হাজার মুরগী জবাই হয়ে থাকে। সেগুলোতে মুসলমান কর্মীদের তত্ত্বাবধানকারী এবং তাদের সনদ প্রদানকারী ব্যক্তিও ভিন্ন ভিন্ন। তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে একথা বলা সম্ভব নয় যে, তারা সব শর্ত মেনে

চলে। এসব মুরগী যখন বাজারে আসে, তখন এটা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন যে, এগুলো কোন জবাইখানার এবং কারা এর সনদ দিয়েছে। সার কথা এই যে, বিস্তারিত এসব তথ্য জানার পরও ব্রাজিল থেকে রপ্তানী করা মুরগীর ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় দূর হয়নি। হালাল গোশ্‌ত যোগান দেয়ার জন্যে বিশ্বমানের নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে। আফসোস! মুসলিম দেশসমূহের রাষ্ট্রপ্রধানদের এদিকে মনোযোগ নেই। তবে আমি কতক প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের কাছে আবেদন করেছি যে, তারা যেন নির্ভরযোগ্য আলেমদের তত্ত্বাবধানে এর জন্যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ বিষয়ে প্রাথমিক কিছু পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। আল্লাহ করুন, এগুলো যেন সফলকাম হয়।

সাওপালুতে অবস্থানকালে আমি শহরের কয়েকটি মসজিদও দেখেছি। যেগুলো মাশাআল্লাহ বেশ আড়ম্বরপূর্ণ। সেগুলোর মিনার দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হয়। নামাযীদের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। 'আবু বকর মসজিদে' আমরা জুমার নামায আদায় করি। মসজিদটি সেই মহল্লায় অবস্থিত, যেখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে একজন মিসরী শায়েখ উচ্চাঙ্গের খুৎবা দেন। ঐ মসজিদের সাথে একটি ইসলামিক সেন্টারও রয়েছে। শিশুদের দ্বীনী তালীমেরও কিছু ব্যবস্থা আছে। একটি মুসলমান রেস্তোরা রয়েছে। মুসলমানদের প্রয়োজন পূরণের একটি দোকানও রয়েছে।

আরেকটি মসজিদেও আমার নামায পড়ার সুযোগ হয়। তার নাম 'মালিক আব্দুল আযীয মসজিদ'। সৌদী সরকারের সাহায্যে তা নির্মিত হয়েছে। মসজিদটি অত্যন্ত সুন্দর ও আড়ম্বরপূর্ণ। তার আয়তনও বেশ বড়ো। বারো বছর ধরে এখানে একটি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাতে প্রায় একশ' শিশু শিক্ষালাভ করছে। এতে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে দ্বীনী শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। তাবলীগ-জামাতের মারকায যদিও এখান থেকে দূরে 'উমর ইবনুল খাত্তাব মসজিদে' অবস্থিত, তবে 'মালিক আবদুল আযীয মসজিদে'ই বেশিরভাগ জামাতের আসা-যাওয়া হয়ে থাকে। বর্তমানেও এখানে মরক্কো থেকে একটি জামাত এসেছে।

আলী সাইফীর মামাতো ভাই সুহাইব সাহেবের সঙ্গে আমাদেরকে সাক্ষাত করানো হয়। তাবলীগ-জামাতের কাজ যেসব মানুষের মনে বিপ্লব এনেছে, তার মাধ্যমে তাদের একটি ঈর্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে উঠে আসে। এ তরুণ তাবলীগ জামাতের কাজে অত্যাধিক তৎপর। আলী সাহেব বলেন যে, তার বাবা মুস্তাফা আহমাদ উর্‌রা লেবাননের সেসব বিত্তশালী লোকদের অন্যতম ছিলেন, যারা ব্রাজিলে এসে দ্বীন-ধর্ম থেকে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েন। পশ্চিমা সভ্যতার সমস্ত খারাপ দিক তার মধ্যে জায়গা করে নেয়। এমনকি এসব মন্দ অভ্যাসের কারণে তাকে মুসলমান সমাজে ভালো চোখে দেখা হতো না। তার সংশোধনের

জন্যে তার বাবা শক্ত-নরম সব ধরনের ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন। কিন্তু তার জীবনযাপন প্রণালীতে কোনরূপ পরিবর্তনই আসেনি। অবশেষে ১৯৭১ সালের দিকে ব্রিটেন থেকে একটি তাবলীগ জামাত আসে। জামাতের আমীর সাহেব একস্থানে বয়ান করছিলেন। ঘটনাচক্রে তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বয়ানকারীর আকার-আকৃতি দেখে তিনি মনে মনে ভাবেন যে, ইনি হয়তো কোন মসজিদ বা মাদরাসার জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করবেন। এ কারণে তার অন্তরে ঐ ব্যক্তির প্রতি ভালো কোন অনুভূতি জাগেনি। কিন্তু কী এক অজানা দরদ নিয়ে তিনি বয়ানের মধ্যে বলেন যে- আপনাদের নিকট থেকে আমরা কোন টাকা-পয়সা চাই না। আমরা নিজেদের পয়সা খরচ করে আপনাদেরকে সেই দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছি, যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি নিজের চিন্তার জন্যে লজ্জিত হন। আল্লাহ তাআলা মুস্ত ফা উর্‌রা সাহেবের জীবনের পরিবর্তন চেয়েছিলেন। এরপর তিনি পুরো বয়ান শোনেন এবং তার কথামতো ১৯৭২ সালে পাকিস্তান যান। সেখান থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ। তার পূর্বের জীবন যারা দেখেছে, তারা তাকে এই নতুন রূপে চিনতেই পারেনি। পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে তিনি নিজের পুরো জীবনকে ব্রাজিলে তাবলীগ জামাতের কাজের প্রসার ঘটানোর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ কাজে ব্যাপৃত থাকেন। সারাদেশে তাবলীগ জামাতের কাজ যে পরিমাণ বিস্তার লাভ করে তাতে তার অবদান মৌলিক গুরুত্ব রাখে। তার ছেলে সুহাইব সাহেব আমাদেরকে তৃতীয় দিন দুপুর বেলা নিজ বাড়িতে বিশ্রামের দাওয়াত দেন। সেখানে তার পুরো পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের সকলকেই তাবলীগের কাজে লেগে থাকতে দেখি।

আলী সাইফী সাহেব আমাদেরকে সাওপালু শহর ঘুরিয়ে দেখান। সাওপালু আটলান্টিক মহাসাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। উপকূল ধরে সবুজ-শ্যামল পাহাড়ের দীর্ঘসারি অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। পাহাড়গুলোর একদিকে সমুদ্র আর অপরদিকে সেগুলোর কোল ঘেসে প্রাকৃতিক ঝিল, ছোট ছোট জলপ্রপাত ও প্রাকৃতিক বৃক্ষ সমূহের ঘন জঙ্গল ছড়িয়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে আম, কলা ও স্থানীয় কিছু ফলের গাছও রয়েছে। আমগাছ এখানে প্রাকৃতিকভাবে জন্মায়। আমেভরা গাছ জায়গায় জায়গায় এমনকি সড়কের উপরেও চোখে পড়ে। সবশ্রেণীর মানুষ বিনামূল্যে তা ভোগ করে। এ পুরো অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ। যার নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করতে করতে আমরা সাওপালুর বন্দর নগরী সান্তোস (Santos) অতিক্রম করি। এটি দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব বৃহৎ বন্দর নগরী। এখানে ছোট একটি শহর রয়েছে। তার মধ্যে একটি মসজিদও রয়েছে। পথে কাবাতা (Cubateo) নামক আরেকটি ছোট শহর পড়ে। সেখানে

গ্যাসের কূপ ও তেল শোধনাগার রয়েছে। যে কারণে এখানকার বাতাসে তেল ও গ্যাসের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। বলা হয় যে, পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বায়ু দূষণ (Pollution) এখানেই হয়ে থাকে। তারপর আলী সাইফী সাহেব আমাদেরকে একটি সুন্দর উপকূলীয় শহরে নিয়ে যান। যার নাম গুয়ারুজা (Guaruja)। তার মেয়র একজন মুসলমান। শহরটি আটলান্টিক মহাসাগরের এক আকর্ষণীয় তীরে অবস্থিত। যেখানে সমুদ্রকে সবুজ পাহাড়ের সঙ্গে খেলা করতে দেখা যায়। বসন্ত ঋতু এখানে আসি আসি করছিলো। সর্বত্র সুবুজ ঝাড় উদগত হচ্ছিলো। প্রশান্তি ময় এসব প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে কিছু সময়ের জন্যে সফরের ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

সাওপালু (স্থানীয় লোকেরা 'সোপালু' উচ্চারণ করে) ব্রাজিলের সবচেয়ে বড়ো বাণিজ্যিক শহর। পুরো দক্ষিণ আমেরিকার সর্ববৃহৎ শিল্পকেন্দ্রও এটি। এর জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। কথিত আছে যে, ২৫শে জানুয়ারী ১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান মিশনারীরা এর ভিত্তি স্থাপন করে। এ তারিখটি যেহেতু বর্তমানের বিকৃত খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সেন্টপল এর জন্মতারিখ, তাই এ শহরের নাম রাখা হয় 'সেন্টপল'। কিন্তু পর্তুগীজ উচ্চারণরীতি অনুসারে একে 'সাওপালু' বা 'সোপালু' বলা হয়। শহরের প্রধান সড়ক পোলিস্তা এ্যাভিনিউ (Paulista Avenue) তার আড়ম্বপূর্ণ আকাশচুম্বী ভবনের কারণে নিউইয়র্কের পার্ক এ্যাভিনিউয়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ অঞ্চলেই লস-এঞ্জেলসের বাজারের মতো অত্যাধিক অগ্নিমূল্যের একটি প্রসিদ্ধ বাজারও রয়েছে।

সাওপালুতে দুদিন অবস্থান করার পর আমাদের যাত্রার সময় ঘনিয়ে এলে আলী সাইফী সাহেব বলেন- আপনি যদি ব্রাজিলীয় ধাঁচের মাছ এবং এখানকার কতক হালাল খাবার না খেয়ে চলে যান তাহলে যেন আপনার ব্রাজিলই দেখা হলো না। সুতরাং তিনি সাওপালুর একটি সুদৃশ্য রেস্তোরায় আমাদেরকে দুপুরের খাবার খাওয়ান। যেখানে বাস্তবিকই অত্যন্ত সুস্বাদু সবজি, আচার ও বিভিন্ন ধরনের মাছের এমন সমন্বয় ছিলো, যা ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। খানায় তিনি মুস্তাফা উররা সাহেবের ছেলে সুহাইব সাহেবকেও দাওয়াত করেছিলেন- যার আলোচনা আমি পূর্বে করেছি। খানা খাওয়ার পর তার বাড়িতে বিশ্রাম করার জন্যে তিনি দাওয়াত দেন। তারপর আমরা সেখান থেকে বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

রিও ডি জানেরিও শহরে

এরপর আমারা ব্রাজিলের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর রিও ডি জানেরিওতে (যাকে সংক্ষেপে 'রিও' বলা হয়) দু'দিন অবস্থান করবো এবং সেখান থেকে পানামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। আলী সাইফী সাহেবের সাথে ব্রাজিলীয় একজন

নওমুসলিম যুবক কাজ করেন। তার ইসলামী নাম আবু বকর। আলী সাহেব আমাদের পূর্বেই তাকে রিউ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে তিনি সেখানে আমাদেরকে স্বাগত জানাতে এবং সেখানে অবস্থানকালে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। তিনি রিউ-এরই অধিবাসী। চাকুরীর সুবাদে সাওপালু অবস্থান করেন। তার মাতৃভাষা যদিও পর্তুগীজ, কিন্তু অত্যন্ত সাবলীলভাবে ইংরেজী বলেন। অন্যথায়য় রিউতে ইংরেজী জানা লোক খুবই কম। আমরা মাগরিবের নামায বিমানবন্দরে পড়ে টিম এয়ারলাইনসের একটি ব্রাজিলীয় বিমানে রিউ পৌঁছি। আবু বকর সাহেব স্বাগত জানানোর জন্যে গাড়ি নিয়ে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। গাড়িতে আরোহণ করে হোটেলে যাওয়ার পথে আমি তাকে তার ইসলাম গ্রহণের কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা সবিস্তারে বলেন। তিনি বলেন যে, আমার ইন্টারনেটের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে কিছু তথ্য জানার আগ্রহ জন্মে। আগে থেকে আমার ইংরেজী জানা ছিলো। যেসব চ্যানেল টেলিভিশনে ইসলামী তথ্য উপস্থাপন করে সেগুলো দেখতে থাকি এবং এমন কিছু ভিডিও ক্যাসেট সংগ্রহ করি, যেগুলো ইংরেজীতে ইসলাম ও মুসলমানদের পরিচিতি তুলে ধরে। যার ফলে ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমার মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত পাঠ করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এ সময় রিউ-এর একটি পুরাতন মসজিদে সুদানের একজন আলেমের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমার আগ্রহ দেখে নিজ থেকেই সীরাতের উপর পাঠদান করার ওয়াদা করেন। ঘটনাচক্রে সে সময় ইন্টারনেটের মাধ্যমে সাওপালুর এক ব্রাজিলিয়ান তরুণীর সঙ্গে আমার আলাপ (Chat) হতো। সে ছিলো কট্টর প্রোটেষ্ট্যান্ট খ্রিস্টান। নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস হওয়ার ঘটনায় তার অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে মারাত্মক বিদ্বেষ জন্মায় এবং সে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

এ উদ্দেশ্যে সে ইসলাম সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করে। কুরআনে কারীমের অনুবাদ এবং হুযুর সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত অধ্যয়ন করে। এ অধ্যয়নের ফলে তার অন্তরে বিপ্লব ঘটে যায়। তার নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মায় যে, ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। এদিকে আমি সুদানী আলেমের নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত পাঠ করছিলাম। ওদিকে ঐ তরুণী ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জীবনচরিত অধ্যয়ন করছিলো। আমরা একে অপরকে কখনো দেখিনি। শুধু ইন্টারনেটে যোগাযোগ হতো। ঘটনাচক্রে আমাকে এক কাজে সাওপালু যেতে হয়। তখন আমি তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করে নেই এবং আমরা পরস্পরকে বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেই। তারপর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে আমি আমার সুদানী উস্তাযের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করি। ঐ

তরুণীর সঙ্গে আমার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা আলোচনা করলে সে তার কাহিনী শোনায় এবং বলে যে, আমি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছি। এভাবে আমাদের বিবাহ এমন অবস্থায় হয় যে, আমরা উভয়ে পূর্ব থেকেই মুসলমান ছিলাম।

আমাদের মেযবান আমাদের জন্যে একটি ট্যাক্সির ব্যবস্থা করেছিলেন। ট্যাক্সিচালক সাঈদও ছিলেন ব্রাজিলিয়ান নওমুসলিম। পর্তুগীজ ছাড়া অন্য কোন ভাষা তিনি জানতেন না। আমি আবু বকর সাহেবের মাধ্যমে তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা জানতে চাই। তখন তিনি বলেন যে, আমার এক তরুণ ছেলে ছিলো। সে একজন মুসলমান উস্তাযের কাছে যাতায়াত করতো। তাঁর মাধ্যমে তার অন্তরে ইসলাম সম্বন্ধে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সে কিছুদিন পর ইসলাম কবুল করে এবং আমাকেও ইসলামের দাওয়াত দেয়। আমিও ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো জেনে মুসলমান হয়ে যাই। আমার ছেলে বর্তমানে দ্বীনী শিক্ষা লাভ করার জন্যে সুদান অবস্থান করছে।

এ দু'টি ঘটনা তো আমি ঐ নওমুসলিমদের থেকে সরাসরি শুনি। আবু বকর সাহেব বলেন- এখানে প্রতি সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক মুসলমান হওয়ার জন্যে ইসলামিক সেন্টারে এসে থাকে। ব্রাজিলে যদিও ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু মানুষ এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে চলেছে। যে-ই ইসলামের স্বরূপ জানতে পারে সে-ই ইসলাম গ্রহণ করে। আবু বকর সাহেব আরো বলেন যে, এখানকার লোকেরা অসাম্প্রদায়িক এবং মুক্ত মনের অধিকারী। অন্যান্য পশ্চিমা দেশের তুলনায় এরা মুসলমানদের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। এমনকি এখানের দশজন মানুষের সামনে ইসলামকে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হলে আমার অনুমান এই যে, তার মধ্যে তিনজনই ইসলাম গ্রহণ করবে। কিন্তু সমস্যা হলো এখানকার লোক পর্তুগীজ ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না। পর্তুগীজ ভাষায় তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার যোগ্য লোকের এখানে খুব অভাব। সুতরাং পর্তুগাল থেকে আমাদের এখানে তাবলীগ জামাতের লোক আসলে খুব ফায়দা হয়। কিন্তু অন্যান্য এলাকার জামাত যেহেতু এখানকার ভাষা জানে না, তাই তাদের দ্বারা উপকার হয় খুব সীমিত। আমি নিবেদন করি যে, এসব জামাত মূলত এখানকার আরব মুসলমানদের মধ্যে এজন্যে কাজ করে থাকে, যেন তারা দাওয়াত দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয় এবং পর্তুগীজ ভাষায় তারা কাজ করতে সক্ষম হয়। আমি আরো নিবেদন করি যে, বাহির থেকে পর্তুগীজ ভাষা সম্পর্কে অবগত অধিক সংখ্যক আলেম ও দা'য়ীর এখানে আসা তো বেশি মুশকিল মনে হচ্ছে, তবে এমন কিছু তরুণ যদি তৈরী হয়ে যায়, যারা আমাদের এখানে এসে দ্বীন শিক্ষা করবে। তারপর নিজেদের দেশে এসে কাজ করবে, তাহলে ইনশাআল্লাহ অনেক বেশি ফায়দা হবে।

—১৩

আবু বকর সাহেবের নিকট এসব ঘটনা ও বিবরণ শুনে অন্তরে অপরাধ বোধ জাগে যে, আমরা অমুসলিমদের সামনে ইসলামের দাওয়াত তুলে ধরার এমন কোন উপযুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারিনি, যার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখন্ডের অধিবাসীদেরকে ইসলামের আলো দেখানোর কার্যকর ব্যবস্থা করা যায়। জামাত, দল, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন তো অনেক আছে, কিন্তু বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠান নেই। যদিও আমি বলে দিলাম যে, ব্রাজিলের কিছু তরুণ আমাদের দেশে আসলে অনেক বেশি ফায়দা হতো। কিন্তু আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বহিরাগত মাদরাসা ছাত্রদের উপর এতো বেশি বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে যে, তাদের ভিসা পাওয়া বাঘের দুধ সংগ্রহের চেয়ে কম জটিল নয়।

আমরা প্রতিনিয়ত এ সমস্ত সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছি। কারণ, মুসলমান সরকারদের প্রাধান্যের তালিকায় ইসলামের দাওয়াত সর্বনিম্ন পর্যায়ের কোন গুরুত্বও রাখে না। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন! এটা তো আল্লাহ তাআলার বিশেষ দয়া এবং ইসলামের অলৌকিকতা যে, উপায়-উপকরণের অভাব সত্ত্বেও মানুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছে। অন্যথায় বাস্তবতা হলো, আমাদের পক্ষ থেকে এ জন্যে কার্যকর কোন চেষ্টা নেই।

রিও ডি জানেরিওতে মুসলমানের সংখ্যা সাওপালুর তুলনায় অনেক কম। পুরো এলাকায় মোট পঞ্চাশটি মুসলিম পরিবার বসবাস করে। এ কারণে এখানে নিয়মতান্ত্রিক কোন মসজিদ ছিলো না। তবে জামাতে নামায পড়ার জন্যে দু-একটি অস্থায়ী নামায ঘর ছিলো। এখন কুয়েতের অর্থায়নে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। তার সঙ্গে ইসলামিক সেন্টার এবং শিশুদের দ্বীন শিক্ষার একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আলজামইয়াতুল খাইরিয়্যাতুল ইসলামিয়্যা নামে একটি সংগঠন রয়েছে। তার সভাপতি লেবাননের অধিবাসী জনাব যায়নুল আবেদীন আমাদেরকে ঐ মসজিদে আসার দাওয়াত দেন। মসজিদের নির্মাণ কাজ অনেকটাই সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ইসলামিক সেন্টার ও মাদরাসা হিসেবে ব্যবহারের জন্যে তৎসংলগ্ন ভবনসমূহ এখনো নির্মাণাধীন রয়েছে। বরং অর্থাভাবে নির্মাণ কাজ থেমে আছে। সংগঠনের সভাপতি ও সেক্রেটারী জনাব সামি সাহেব বলেন যে, এখনো কুরআন-হাদীস প্রভৃতির দরস এখানে অব্যাহত রয়েছে। শিশুদের জন্যে সাপ্তাহিক তারবিয়াতী প্রোগ্রামও হয়ে থাকে। কিন্তু সবকিছু দেখে অনুমান হয় যে, এ কাজগুলো এখানে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখনো অনেক কিছু করা বাকী রয়েছে। যারা এ কাজে কোন প্রকার সহযোগিতা করতে চান তাদের জন্যে নিম্নে টেলিফোন নম্বর দেয়া হলো।

ফোন নং- ০০৫৫২১২২৪১০৭৯ ও ০০৫৫২ ১৯৩৭ ৪৮৬৪৬।

ঐ মসজিদেই আমি যোহরের নামায পড়াই। দেখলাম, অতি কষ্টে এক কাতার লোক হয়েছে।

রিও ডি জানেরিও অত্যন্ত উন্নত শহরগুলোর মধ্যে পরিগণিত হয়। আবু বকর সাহেব বললেন, পর্তুগীজ ভাষায় 'রিউ' শব্দের অর্থ নদী, আর 'জানেরিও' বলে জানুয়ারী মাসকে। এ অঞ্চলে এসে সমুদ্র একটি নদীর রূপ ধারণ করছে। পর্তুগীজরা এটি জানুয়ারী মাসে আবিষ্কার করে। এ কারণে এর নাম 'রিও ডি জানেরিও' রাখা হয়। প্রায় দুই শতাব্দীকাল এটি ব্রাজিলের রাজধানী ছিলো। পরবর্তীতে রাজধানীর জন্যে নতুন শহর ব্রাজিলিয়া নির্মাণ করা হলে রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত হয়। সাওপালুর তুলনায় রিউ-তে অনেক বেশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিদ্যমান। একটি সুন্দর উপকূলীয় অঞ্চলে অবস্থিত ওয়ান্ডসার হোটেলে আমরা অবস্থান করি। যার বাইশতম তলার কক্ষ থেকে মোড় নেয়া উপকূলীয় সড়ক, তার উচুঁ উচুঁ ভবন এবং তীরে আছড়ে পড়া আটলান্টিক মহাসাগরের ঢেউসমূহ সবসময় দৃষ্টিগোচর হয়। রিউ-তে আরো কয়েকটি উপকূলীয় অঞ্চল রয়েছে। যেগুলোর প্রত্যেকটিই ব্যতিক্রমী সৌন্দর্যের অধিকারী। আবু বকর সাহেব আমাদেরকে পেড্রাদা গাভা (Pedrada Gava) নামক উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়ে যান। এখানে পাহাড়ের চূড়া গম্বুজের আকার ধারণ করেছে। কোথাও মনে হয়, যেন পাহাড়কে মুকুট পরিয়ে দেয়া হয়েছে। এ সমস্ত পাহাড়ের চূড়া থেকে সমুদ্রকে অর্ধ চন্দ্রাকৃতির মনে হয়। তার পাদদেশের সবুজ-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ পাহাড় ও উপত্যকাসমূহ নৈসর্গিক শিল্পকর্মের বিস্ময়কর দৃশ্য তুলে ধরে।

فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ

'সুন্দরতম স্রষ্টা আল্লাহ, বরকতময়।'

আবু বকর সাহেব গাড়িতে করেই শহরের মধ্যে একটি চক্কর দেন এবং তার বিশেষ বিশেষ ভবনসমূহ ঘুরে দেখান। তার মধ্যে একটি ভবন সম্পর্কে- যা দূর থেকে অদ্ভুত আকৃতির দেখা যাচ্ছিলো- বলেন যে, এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফুটবল স্টেডিয়াম। এখানের ভবনসমূহের গঠনও কিছুটা ভিন্ন আঙ্গিকের এবং তার সার্বিক ধরন একটি উন্নয়নশীল কিন্তু বিরল ধরনের শহরের দৃশ্য উপস্থাপন করে।

ব্রাজিল ছিলো আমার পানামা যাওয়ার পথের একটি মনযিল। যেখানে কিছুটা অবসর মনে চারদিন অতিবাহিত করার সুযোগ লাভ হয়। এ চারদিন এখানকার অবস্থা জানা এবং বিশ্বের ষষ্ঠ মহাদেশের সর্ববৃহৎ দেশ ভ্রমণে অতিবাহিত হয়। যেখানে ইতিপূর্বে কখনো আসা হয়নি।

পানামাতে

৩০শে যিলকদ, ঘটনাক্রমে সে দিন অক্টোবরেরও ৩০ তারিখ ছিলো। আমি দুপুর সাড়ে বারোটায় রিও ডি জানেরিওর বিমানবন্দরে যোহরের নামায আদায় করে কোপা এয়ারলাইনসের বিমানে পানামার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এটি ছিলো সাড়ে ছয় ঘণ্টার একটি সফর। কোপা পানামার জাতীয় এয়ারলাইনস। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে এর নেটওয়ার্ক বেশ বিস্তৃত। তবে বিমান ছোট ও সেবা নিম্ন মানের। সফর হচ্ছিলো উত্তর-পশ্চিম দিকে। সাড়ে ছয় ঘণ্টাব্যাপী সফরের বড়ো অংশ ব্রাজিলের ভূখন্ডের উপর দিয়ে উড়তেই অতিবাহিত হয়। অবশেষে কলম্বিয়া অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বেই বিমানটি পানামা সিটির বিমানবন্দরে অবতরণ করে। তখন স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে পাঁচটা বাজছিলো। (এখানকার সময় ব্রাজিলের সময় থেকে এক ঘণ্টা এবং পাকিস্তানের সময় থেকে দশ ঘণ্টা পিছিয়ে।)

আমার মেযবানগণ বিমানবন্দরে ভি.আই.পি লাউঞ্জের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই বিমানবন্দরে কোন জটিলতা দেখা দেয়নি। আছরের নামাযও সহজে পেয়ে যাই। বিমানবন্দরের ভিতরে ও বাইরে মহব্বতকারীদের বিরাট একটি দল অপেক্ষমান ছিলেন। জানতে পারলাম যে, নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিমান পৌঁছে যাওয়ায় এখনও অনেক লোক পথে রয়ে গেছে। তাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোক ছিলো এমন, যারা ইতিপূর্বে কখনও আমাকে দেখেনি এবং আমিও তাদেরকে দেখিনি। শুধুমাত্র কিতাব ও ইন্টারনেটে পড়া-শোনা ও প্রবন্ধ ও বয়ানসমূহের কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে প্রায় পনেরো হাজার কিলোমিটার দূরের এক ব্যক্তির ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন। যা ছিলো কেবলই 'হুব্ব ফিল্লাহ' বা 'আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা'। যা উভয় পক্ষের জন্যে বড়ো সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এমন সব ক্ষেত্রে লজ্জিতও হই এবং মনে মনে দু'আও করি যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে এ ভালোবাসা ও সুধারণার যোগ্য হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

পানামাতে আমাকে দাওয়াত দিয়েছিলেন জনাব সালীম উদ্দীন ও ইকবাল সাহেব। তারা মূলত পাকিস্তানের অধিবাসী। দীর্ঘদিন ধরে পানামায় ব্যবসা করছেন। এখানকার দ্বীনী কর্মকান্ডে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সালীম উদ্দীন সাহেব কয়েক বছর ধরে আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। তার বাড়িতেই অবস্থান করি। অনেক রাত পর্যন্ত সেখানে মহব্বতকারীদের আবেগঘন সমাবেশ চলতে থাকে। আমি এক সপ্তাহ পানামায় অবস্থান করি। পুরো সপ্তাহ মহব্বতের এ লোকদের মাঝে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটে।

পানামা মধ্য আমেরিকার শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি দেশ। এরপর থেকে দক্ষিণ আমেরিকা আরম্ভ হয়। দেশটির আয়তন প্রায় ত্রিশ হাজার বর্গমাইল। এর

চিত্র আঁকলে ইংরেজী 'S' অক্ষরের রূপ ধারণ করে। এর পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। রাজধানী 'পানামা সিটি' প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল এ অঞ্চলটি পাহাড়, সমুদ্র ও নদী বেষ্টিত। প্রশান্ত মহাসাগরের তীরের সুদৃশ্য ও আকাশচুম্বী ভবনসমূহ এর সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করেছে। পানামা বিষুবরেখার অনেক নিকটে। ফলে এখানে বৃষ্টি হয়ে থাকে অনেক বেশি । বারো মাস এক রকমের ঋতু, অর্থাৎ হালকা গরম (প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ ডিগ্রী) বিরাজ করে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ের মধ্যে খুব কম ব্যবধান হয়ে থাকে। সবসময় বারো ঘণ্টা দিন ও বারো ঘণ্টা রাত থাকে। নামাযের সময়ের পরিবর্তনও হয় খুব কম। একসময় পানামা বিভিন্ন অসভ্য জাতির কেন্দ্র ছিলো। যাদেরকে পরবর্তীতে 'আমেরিকান ইন্ডিয়ান' নাম দেয়া হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মধ্য আমেরিকার অন্যান্য ভূখন্ডের ন্যায় একেও স্পেন তার অধীনে নিয়ে নেয়। ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে এটি স্পেন থেকে মুক্ত হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর কলম্বিয়া থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যেও অনেকগুলো আন্দোলন চলতে থাকে। অবশেষে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলম্বিয়া থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে। এ সময়ে স্পেনের লোকেরা আফ্রিকান লোকদেরকে দাস বানিয়ে এখানে নিয়ে আসে। তাদের দ্বারা কৃষি ও অন্যান্য পরিশ্রমের কাজ নেয়। একারণে এখানে স্থানীয় অধিবাসীদের তুলনায় আফ্রিকান বংশোদ্ভূত লোক অধিক। স্পেন, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের লোক এসেও বসবাস আরম্ভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পানামা খাল নির্মাণকালে (যার আলোচনা ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে করা হবে) বাংলাদেশ ও আরবেরও বহু সংখ্যক লোক এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমানও ছিলেন।

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের গুজরাট অঞ্চলের আসওয়াত পরিবারের কিছু লোক ব্যবসার উদ্দেশ্যে এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করে। তার দুই বছর পর গুজরাটেরই এক ব্যবসায়ী সুলাইমান বেকু সাহেব পানামায় বসবাস আরম্ভ করেন। পানামাতে তিনিই সর্বপ্রথম নিয়মতান্ত্রিক মসজিদ নির্মাণ করেন, যা এখন 'জামে মসজিদ' নামে প্রসিদ্ধ। পরবর্তীতে আরব ও গুজরাটের অনেক পরিবার এখানে এসে বাস করতে থাকে। সুলাইমান বেকু সাহেব পানামাতে মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তার ইনতিকাল হয়। আল্লাহ তাঁর উপর রহমত নাযিল করুন। বর্তমানে পানামার ত্রিশ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় সাড়ে চার হাজার মুসলমান। তার মধ্যে পানামা সিটিতে গুজরাটী মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। আরবদের সংখ্যা পানামার আরেকটি শহর 'কোলনে' অধিক। পাকিস্তানী মুসলমানদের সংখ্যা এখন বৃদ্ধি

পাচ্ছে। সারা দেশে মোট নয়টি মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি বড়ো মসজিদ রয়েছে পানামা সিটিতে । একটি জামে মসজিদ, আরেকটি মদীনা মসজিদ। উভয় মসজিদই খুব শানদার। সেগুলোর মিনার দূর থেকে চোখে পড়ে। আমার অবস্থানস্থল থেকে মদীনা মসজিদ অধিক নিকটে ছিলো। বেশিরভাগ নামায সেখানে পড়ার সুযোগ হয়। আমার অবস্থানকালে প্রতিদিন ইশার নামাযের পর এ দুই মসজিদের কোন একটিতে আমার বয়ান হতো। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে যে, মাশাআল্লাহ এখানকার মুসলমানগণ নিজেদের দ্বীনী স্বকীয়তা বজায় রাখার প্রশংসনীয় চেষ্টা করছেন। মসজিদে উপস্থিতির সংখ্যাও বেশ ভালো। প্রত্যেকটি বয়ানে মানুষ অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সাথে অনেক দূর থেকে সফর করে এসে অংশগ্রহণ করে।

মাশাআল্লাহ এখানকার মুসলমানদেরকে দিকনির্দেশনা দানের জন্যে বেশ কয়েকজন আলেম রয়েছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ও মর্যাদাসম্পন্ন আলেম মুফতী আবদুল কাদের সাহেব। তিনি ডাভেলের মাদরাসায় পড়াশোনা করেছেন। এখানকার মুসলমানদের দিকনির্দেশনা দানে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মাশাআল্লাহ, তাঁর কথা সকলে মনে-প্রাণে মেনে থাকে। এখানকার মুসলমানদের মধ্যে দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং তা স্থিতিশীল রাখার মধ্যে তাঁর অবদান প্রসংশনীয়। কয়েকজন তরুণ আলেম ব্রিটেনের দারুল উলূম বিরিয়ালেস্টরে হযরত মাওলানা সালীম ধোরাত সাহেবের মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। এখানকার মুসলমানগণ এসকল আলেমের সহযোগিতায় শহর থেকে দূরে এক জায়গায় একটি দারুল উলূমও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তা পরিদর্শনেরও সুযোগ হয়। মাদরাসাটিতে বর্তমানে উর্দু, দ্বীনিয়াত, আরবী ভাষা, ইসলামের ইতিহাস, ফিকহের প্রাথমিক বিষয় ও তাজবীদ শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং মাদরাসাটিকে পর্যায়ক্রমে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে এখানে ৪২জন আবাসিক ছাত্র রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন তালিবে ইলম দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলির এবং আরেকজন ভেনিজুয়েলারও রয়েছে। উস্তাযগণের মধ্যে মাশাআল্লাহ একাগ্রতার সাথে কাজ করার আগ্রহ অনভূত হয়। মাওলানা আফজাল প্যাটেল সাহেব অধ্যয়ন ও গবেষণা-রুচীর অধিকারী তরুণ আলেম। তিনি আমার সঙ্গে বেশিরভাগ সময় কাটান। তার পুরো আলাপ-আলোচনা কোন না কোন মাসআলা বিষয়ক ছিলো। তাতে অনুমিত হয় যে, তার মধ্যে ইলমের সেই মগ্নতা রয়েছে, যা উন্নতির চাবিকাঠি। আরো কতক উস্তাযের মধ্যেও এধরনের উদ্দীপনা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হই। তারা তাদের সামজিক সমস্যা নিয়েও চিন্তিত। আল্লাহ তাআলা তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে বরকত দান করুন। আমীন।

মধ্য শহরে মেয়েদের জন্যেও একটি মাদরাসা রয়েছে। সেখানেও যাই। তাদের পাঠ্যসূচী ও ব্যবস্থাপনা দেখে আনন্দিত হই। মাশাআল্লাহ! সেখানে মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা রয়েছে। কতিপয় মহিলা আলেম হিন্দুস্তানের মহিলা মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভ করে এসে এখানে শিক্ষা দান করছেন। কয়েকজন পুরুষ উস্তায পর্দার সাথে মেয়েদেরকে পড়িয়ে থাকেন।

যেসব দেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু, সে সব দেশের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা শিশুদের তালীম-তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা। এরা দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা লাভ করলে তাদের দ্বীনী প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেখানকার পাঠ্যসূচী, ব্যবস্থাপনা এবং তারচেয়ে মারাত্মক হয় সেখানকার পরিবেশ। এগুলো তাদের জন্যে প্রাণনাশক বিষতুল্য। এজন্যে এসব দেশে যখনই যাওয়ার সুযোগ হয়, আমি তাদের কাছে এ আবেদন অবশ্যই করে থাকি যে, আপনারা আপনাদের নতুন প্রজন্মের সংরক্ষণের জন্যে নিজেরা এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করুন, যেখানে তাদেরকে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে সাথে অবশ্যই দ্বীনী শিক্ষা দান করা হবে।

একইসাথে স্কুলের সার্বিক পরিবেশেও ইসলামী রঙ বিরাজমান থাকবে। যা পশ্চিমা বিশ্বের অসহনীয় বৈশিষ্ট্য থেকে শিশুদেরকে রক্ষা করতে পারবে। আমি পানামাতেও অনেক বয়ানে মুসলমান ভাই-বোনদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, এ চিন্তা নিয়েই এখানকার কিছু মুসলমান একটি মুসলিম স্কুলের ভিত্তিস্থাপন করেছেন। তার দায়িত্বশীলগণ সে স্কুলে যাওয়ার জন্যেও দাওয়াত দেন। সেখানেও যাই। সেখানকার ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ দেখে এবং দায়িত্বশীলদের সঙ্গে কথা বলে অনুমান হয় যে, তাদের মধ্যে এবিষয়ের গুরুত্বের উপলব্ধি রয়েছে। সাথে এ উপলব্ধিও হয় যে, স্কুলটিকে কাঙ্খিত মানে ওঠানোর জন্যে এবং তা থেকে কাঙ্খিত ফল লাভের জন্যে এখনও অনেক কিছু করা বাকি রয়েছে। পরবর্তীতে এখানকার প্রভাবশালী লোকদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের বিষয়েও ঐক্যমত হয়, যারা স্কুলের দায়িত্বশীলদের সাথে যৌথভাবে এর পাঠ্যসূচী ও ব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার চেষ্টা করবে।

পানামার বড়ো শহর মাত্র দু'টি। একটি পানামা সিটি, যা প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। আর দ্বিতীয়টি কোলন, যা অবস্থিত আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে। কোলন মুক্ত বন্দর হওয়ার কারণে নিখাদ বাণিজ্যিক শহর। ওখানে বহু সংখ্যক মুসলমানও ব্যবসার কাজে নিয়োজিত আছেন। তার মধ্যে বেশির ভাগই আরব। তারা এখানে একটি শানদার মসজিদ নির্মাণ করেছেন। মসজিদের ইমাম ও খতীব একজন মিসরী আলেম। আমার মেযবান সালীম উদ্দীন সাহেব প্রমুখের বাসনা ছিলো আমি যেন এ মসজিদেও বয়ান করি।

অধিকাংশ শ্রোতা যেহেতু আরব তাই বয়ান যেন আরবীতে হয়। তাদের মাধ্যমে ইমাম সাহেব আমার আগমনবার্তা জানতে পেরে টেলিফোনে আমাকে জুমার বয়ান করার জন্যে দাওয়াত দেন। পানামা সিটি থেকে বন্ধুদের বড়ো একটি দল গাড়ির বহর নিয়ে কোলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। প্রায় দুই ঘণ্টা সফর করার পর আমরা যখন কোলন পৌঁছি, তখন জুমার সময় ঘনিয়ে এসেছিলো। এ অঞ্চলে উঁচু মিনারবিশিষ্ট সুন্দর মসজিদ দেখে অন্তর আনন্দে ভরে যায়। ইমাম সাহেব আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। এখানে জুমার নামাযের পূর্বে আরবীতে আমার বয়ান হয়। আরবদের মসজিদে এ আরবী বয়ানই জুমার খুৎবা রূপে পরিগণিত হয়। এটি যেহেতু একটি বাণিজ্যিক শহর এবং এখানের প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী, এজন্যে আমার বয়ানের মূল বিষয় ছিলো, একজন মুসলমান ব্যবসায়ীর কী কী দায়িত্ব রয়েছে। একজন মুসলমানের কাজ এটা নয় যে, সে ব্যবসায়িক লাভের পেছনে দৌড়িয়ে তার দুনিয়ায় আগমনের উদ্দেশ্য ভুলে যাবে। কুরআনে কারীম মুসলমানদেরকে বার বার সতর্ক করেছে যে, তাদের ধনসম্পদ যেন আল্লাহর স্বরণ থেকে গাফেল করে না দেয়। একইভাবে একজন মুসলমানের দায়িত্ব শুধু এতোটুকুও নয় যে, সে নিজেকে নিজে মুসলমানরূপে গড়ে তুলবে; বরং তার দায়িত্বে এটাও জরুরী যে, সে নিজের পরিবারের লোকদেরও তারবিয়তের ব্যবস্থা করে তাদেরকে দোযখে যাওয়া থেকে বাচাঁনোর জন্যে সম্ভাব্য সব চেষ্টাই করবে। একারণে আমি আবেদন করি যে, প্রত্যেক মুসলমান নিজেদের প্রতিদিনের ব্যস্ততার মধ্য থেকে কিছু সময় এ কাজের জন্যে বের করবে, যেন পরিবারের সব সদস্য দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকে এবং তাদের অন্তরে আখেরাতের ফিকির পয়দা হয়। এ মসজিদে উপমহাদেশের কোন ব্যক্তির এটি ছিলো প্রথম বয়ান। আলহামদুলিল্লাহ! মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শোনা হয়। ইমাম সাহেবের ফরমায়েশ রক্ষার্থে আমি জুমার নামাযও পড়াই। নামাযের পর মসজিদ সংলগ্ন ইসলামিক সেন্টার-এর তৎপরতা সম্পর্কেও আমাকে অবহিত করা হয়। স্থানীয় কিছু ফিকহী মাসআলা সম্পর্কেও আলোচনা হয়। তারা অত্যন্ত ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আচরণ করেন। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

পানামা খাল

পানামার জগৎবিখ্যাত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 'পানামা খাল'। একে পৃথিবীর বিস্ময়কর বস্তুসমূহের অন্যতম গণ্য করা হয়। এদেশে এসে বিস্ময়কর এ জিনিসটি না দেখে চলে যাওয়া রুচিহীনতার পরিচয় হতো। এ কারণে আমার মেযবানগণ প্রোগ্রামের মধ্যে খাল দেখানোকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। জনাব আসলাম প্যাটেল সাহেব আমার অবস্থানকালের বেশিরভাগ সময় অত্যন্ত

মহব্বত নিয়ে আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিই আমাকে এ খাল দেখানোর জন্যে নিয়ে যান।

আপনি পৃথিবীর মানচিত্রে চোখ বুলালে পৃথিবীর দুই মহাসাগর আটলান্টিক ও প্রশান্তের মাঝে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা এই দুই মহাদেশকে আড়াল রূপে দেখতে পাবেন। এভাবে দুই সাগরের মাঝে বেশিরভাগ জায়গায় শত শত এবং কতক জায়গায় হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব রয়েছে। কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যখানে বাঁক নেয়া চিকন একটি স্থলভাগ রয়েছে। যা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে যেতে যেতে ক্রমান্বয়ে সরু হয়ে গেছে। এটি মেক্সিকো থেকে আরম্ভ হয়ে পানামাতে শেষ হয়ে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। স্থলভাগের এ অংশে এসে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে দূরত্ব কমে গেছে। পানামার এক জায়গায় এসে এর দূরত্ব রয়েছে মাত্র পঞ্চাশ মাইল। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কোন সামুদ্রিক জাহাজ আমেরিকার পূর্বদিক থেকে পশ্চিমের কোন দেশে যেতে চাইলে তাকে ছোট এই জলভাগের কারণে পুরো দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে উঠে হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব অতিক্রম করে তবে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যেতে হতো। যেসব দেশকে বাণিজ্যিক কারণে আমেরিকার পশ্চিমে সফর করতে হয় তাদের মনে চিন্তা জাগে যে, যদি কোন উপায়ে পঞ্চাশ মাইলের এ স্থলভাগে জাহাজ চালোনার উপযুক্ত পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করা যেতো তাহলে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে সরাসরি প্রশান্ত মহাসাগরে বের হওয়ার সহজ একটি উপায় হতো। তখন পানামা অঞ্চলটি ছিলো কলম্বিয়ার অধীনে। ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যান্ড লোহিত সাগর ও ভূমধ্য সাগরকে সংযুক্ত করার জন্যে সুয়েজ খাল নির্মাণ করেন। বর্তমানে যা মিসরের অধীনে রয়েছে। এ সফলতাকে সামনে রেখে কলম্বিয়া সরকার ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে একটি ফরাসী কোম্পানীকে দুই মহাসাগরের মাঝে খাল খননের উপযুক্ত জায়গাটি ৯৯ বছরের চুক্তিতে দিয়ে তাকে খাল খননের অধিকার (Concession) দেয়। এ কোম্পানী ফার্ডিন্যান্ডের সাহায্যে ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এখানে খাল খননের কাজ আরম্ভ করে। সতেরো হাজার শ্রমিককে খনন কাজে নিয়োগ করা হয়। বেশিরভাগ শ্রমিক ছিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজের। এ বিরাট পরিকল্পনা- যা বাস্তবায়নের জন্যে এতো বড়ো জনসংখ্যাকে কাজে লাগানো হয়েছিলো এবং সুয়েজ খালের সফলতা দেখে ফ্রান্সের বড়ো বড়ো পুঁজিপতি কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে এলোপাথাড়ি পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলো- অবশেষে তা ব্যর্থ হয়। কারণ, যে অঞ্চলে এ কাজটি হচ্ছিলো তা সুয়েজ খালের অঞ্চলের ন্যায় শুষ্ক ছিলো না। এখানে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়ে থাকে। কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টি কয়েক মাসের কাজকে তছনছ করে দেয়। তাছাড়া এ অঞ্চলে হলুদ জ্বরের (Yellow Fever) প্রকোপ রয়েছে। বার বার মহিমারী দেখা

দিতো। যাতে আক্রান্ত হয়ে অনেক শ্রমিক মৃত্যুবরণ করে। এমন কি এখানে ছয় হাজারের অধিক মানুষকে মাটি দেয়া হয়। অবশেষে সেই ফরাসী কোম্পানী আত্মসর্ম্পন করে কাজ বন্ধ করে দেয়।

১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে পানামা কলম্বিয়া থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে ফ্রান্সের ব্যর্থতার কারণে দুই মহাসাগর সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। বরং যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পানামা সরকারের সাথে একটি চুক্তির ভিত্তিতে খাল খননের জন্যে ঐ অঞ্চল ভাড়া নেয়। তারা ফরাসীদের ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন এক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ফরাসী কোম্পানীর পরিকল্পনা ছিলো এখানে একটি পরিখা খনন করে দুই সাগরের পানিকে এক করে দেয়া। কিন্তু এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় আমেরিকা অন্য একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। তা হলো, দুই সাগরকে এক করার পরিবর্তে এখানে মিষ্টি পানির একটি কৃত্রিম খাল খনন করে। পূর্ব থেকেই এখানে একটি প্রাকৃতিক নদী (Chagres River) ছিলো। আমেরিকানরা এই নদীর মুখ বন্ধ করে একটি কৃত্রিম খাল তৈরী করে। কিন্তু সমস্যা এই হয় যে, যে অঞ্চলে খাল খনন করা হয় তা ছিলো উভয় সাগর-পৃষ্ঠ থেকে ছাব্বিশ মিটার উচুঁ। তাই জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থান করলে তা ঐ খালে নেওয়ার জন্যে ছাব্বিশ মিটার উচুঁ করা এবং খাল অতিক্রম করে যখন প্রশান্ত মহাসগরের নিকটে আসবে, তখন সেটাকে নিচু করে সমুদ্রপৃষ্ঠে আনা কীভাবে সম্ভব হবে? এ সমস্যার যে সমাধান বের করা হয় তাই হলো বিস্ময়কর 'পানামা খাল'।

সমাধান এভাবে বের করা হয় যে, জাহাজ যখন আটলান্টিক মহাসাগরের ঐ জায়গায় পৌঁছে, যেখান থেকে খাল আরম্ভ হয়েছে, সেখানে জাহাজটিকে এমন একটি বিশাল হাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়, যার দুইদিকে অত্যন্ত মজবুত গেইট লাগানো রয়েছে। যখন সমুদ্র থেকে জাহাজ ঐ হাউজের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন দুইদিকের গেইট বন্ধ করে দিয়ে হাউজের মধ্যে এ পরিমাণ পানি ভরা হয় যে, তা খালের উপরিভাগের সমান হয়ে যায়। নতুন এ পানির সাহায্যে জাহাজ নিজে নিজেই খালের উপরিভাগে উঠে যায়। তখন খালের দিকের গেইটটি খুলে দেয়া হয়। ফলে জাহাজ খাল অতিক্রম করার উপযুক্ত হয়ে যায়। এর পর যখন তা প্রশান্ত মহাসাগরের নিকট পৌঁছে তখন আরেকটি হাউসের মধ্যে ঢোকে। ঢোকার সময় জাহাজ খালের উপরিভাগের সমান এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অনেক উচুঁ থাকে। এখানে দুইদিকের গেইট বন্ধ করে হাউজ থেকে পানি বের করে দেয়া হয়। ফলে জাহাজটি নিচে নামতে থাকে। যখন তা সমুদ্রপৃষ্ঠের সমান হয়ে যায়, তখন সমুদ্রের দিকের দরজা খুলে দেয়া হয় ফলে জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করে। জাহাজের ওঠা-নামার এ কাজটি তিনটি পৃথক পৃথক স্থানে তিন ধাপে সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক ধাপে জাহাজ বড়ো একটি

হাউজে প্রবেশ করে পানি ভরার বা বের করার অপেক্ষা করতে থাকে। যার ফলে তার পৃষ্ঠদেশ উঁচু বা নিচু হয়ে থাকে। যে কোন জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে কিংবা প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে এ ধাপগুলো অতিক্রম করতে হয়। এভাবে পঞ্চাশ মাইলের এ দূরত্ব কৃত্রিম ঐ খালের মাধ্যমে গড়ে চব্বিশ থেকে ত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে অতিক্রম করে। যদি এ খাল না থাকতো তাহলে অপর সাগরে পৌঁছতে পুরো দক্ষিণ আমেরিকা ঘুরে যেতে প্রায় এক মাস সময় লেগে যেতো। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উদ্বোধনকৃত এ খালটি যেহেতু বিশেষ এক চুক্তির অধীনে আমেরিকা তৈরী করেছিলো, তাই ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এর উপর তারই আধিপত্য ছিলো। আমেরিকা অতিক্রমকারী প্রত্যেকটি জাহাজ থেকে খাল ব্যবহার করার বিরাট অংকের ফি আদায় করতো। আর পানামাকে নামমাত্র রয়্যালিটি দিতো। পানামা সরকার ও আমেরিকার মধ্যে এ খালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে উভয় দেশ কুটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন করে। অবশেষে আপোষমূলক প্রচেষ্টার ফলে আধিপত্য তুলে নেয়ার জন্যে ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৯৯ চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হয়। তারপর থেকে এ খালটি পানামার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বলা হয় যে, প্রত্যেকটি জাহাজ থেকে খাল অতিক্রম করার জন্যে দুই লক্ষ ডলার ভাড়া আদায় করা হয়। এভাবে বিস্ময়কর এ খাল পানামার আয়ের বিরাট একটি উৎস হয়ে যায়।

জাহাজ ওঠানামা করার এ দৃশ্য পর্যটকদেরকে দেখানের জন্যে খালের মধ্যবর্তী হাউজের উপর একটি প্লাটফর্ম তৈরী করা হয়েছে। সেখান থেকে অনেক দূর পর্যন্ত খালের দৃশ্য চোখে পড়ে। সেই হাউজটি পর্যটকদের একেবারে সম্মুখে থাকে, উভয়দিক বন্ধ করে উপরে ওঠানো এবং নিচে নামানো হয়। আমাদের সামনে একটি জাহাজ ঐ হাউজের মধ্যে প্রবেশ করে, যার উপরিভাগ ছিলো খালের সম্মুখভাগ থেকে নিচে। জাহাজ হাউজের মধ্যে প্রবেশ করার পর উভয়দিকের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর অনেকগুলো নালার মাধ্যমে হাউজের মধ্যে পানি ভরতে আরম্ভ করা হয়। প্রায় আধা ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দেখতে দেখতে হাউজের পৃষ্ঠদেশ উপরে উঠে আসে এবং তার সাথে জাহাজও উপরে উঠে যায়। অবশেষে তা খালের সম্মুখভাগের সমান হয়ে যায়। এ সময় অপরদিকের মুখ খুলে দেয়া হয় এবং জাহাজ আবার চলতে আরম্ভ করে। এখানে একটি যাদুঘরও বানানো হয়েছে। যার মধ্যে ঐ খালের পুরো ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এক জায়গায় পর্যটকদেরকে একটি জাহাজের মডেলের মধ্যে আরোহণ করিয়ে তাদেরকে কৃত্রিমভাবে খাল অতিক্রম করা এবং জাহাজকে উপরে ওঠানো ও নিচে নামানোর দৃশ্য দেখানো হয়। দর্শকরা এমন অনুভব করে যে, জাহাজের সাথে সাথে সে নিজেও এ কাজে অংশ নিয়েছে।

পানামা অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল দেশ। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন গাছের বনে ভরা। ব্রাজিলের মতো এখানেও আম ও অন্যান্য ফলের গাছ বিভিন্ন জায়গায় নিজেই নিজেই উৎপন্ন হয়। ছোট ছোট অনেক পাহাড় রয়েছে। এক অঞ্চলে অনেক উঁচু ও ঠান্ডা পাহাড়ও রয়েছে। একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর, আর অপরদিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে বের হয়ে আসা ছোট ছোট উপসাগরকে সবুজ পাহড়ের মধ্য দিয়ে উঁকি দিতে দেখা যায়। উপকূলীয় অঞ্চলও অনেক। সেগুলোরই একটি অঞ্চল সান্তা কালারা। আমাদের মেযবানগণ এখানের সুন্দর একটি বাংলোতে একটি রাত কাটানোরও প্রোগ্রাম করেন। বাংলোটি পূর্বোল্লেখিত মরহুম সুলাইমান বেকু সাহেবের স্ত্রীর। যিনি পানামায় সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সাথে আমাদেরকে এখানে একদিন থাকার জন্যে দাওয়াত দিয়েছিলেন। একদল বন্ধুসহ আমরা সেখানে পৌঁছি। সুপ্রসস্ত ও সুদৃশ্য বাংলোটি সমুদ্রোপকূলের সম্মুখে একটি উচুঁ জায়গায় অবস্থিত। এখান থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের নীলাভ তরঙ্গের দৃশ্য অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগর পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ও সবচেয়ে গভীর সাগর। যা পূর্ব-পশ্চিমে অনেকগুলো দেশে বিস্তৃত। আমি সর্বপ্রথম ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় এ মহাসাগর দেখি। পরবর্তীতে সান-ফ্রান্সিসকো ও লস-এঞ্জেলসে, তারপর জাপানে, আরও পরে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে আর এখন পানামাতে এ সাগর আমার সামনে বিরাজ করছিলো। হাজার হাজার মাইলব্যাপী বিস্তৃত এ মহাসাগর শত শত বছর ধরে কুরআনে কারীমের এ আয়াতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়-

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

'আর তিনিই সমুদ্রকে সেবায় নিয়োজিত করেছেন, যেন তোমরা তা থেকে তাজা গোশত খাও এবং তা থেকে ঐ সমস্ত অলংকার বের করো, যেগুলো তোমরা পরে থাকো। তোমরা দেখো যে, তার মধ্যে পানি ভেদ করে নৌকা চলে, যাতে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান করো আর যাতে তোমরা শোকরগুজার হতে পারো।' (সূরা নাহ্‌লঃ ৪)

উপভোগ্য একটি রাত সাগরতীরে অতিবাহিত করার পর আমরা সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করি। প্রত্যাবর্তনের পথে আমরা কয়েকটি প্রোগ্রাম শেষ করে পানামা সিটিতে পৌঁছি। পরেরদিন ২০শে শাওয়াল ১৪২৯ হিজরী (২০শে অক্টোবর ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ) সোমবার সকালে আমাদেরকে ত্রিনিদাদ যেতে হবে। মহব্বতকারীদের মাঝে এই এক সপ্তাহ চোখের পলক ফেলতেই পার হয়ে যায়। কিন্তু তাদের মহব্বত ও ইখলাসের ভিত্তিতে মনে হচ্ছিলো যে, তাদের সঙ্গে বহু

বছরের সাহচর্য রয়েছে। বিদায়-মুহূর্ত পর্যন্ত বিমানবন্দরেও বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। তারা ভালোবাসার আবেগ নিয়ে আমাদেরকে বিদায় জানান। আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও সফলতা দ্বারা ভূষিত করুন এবং এ মহব্বতকে খাঁটিভাবে একান্তই তাঁর সাব্যস্ত করে উভয়পক্ষকে এর বরকত দ্বারা ভূষিত করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

ত্রিনিদাদ শহরে

ত্রিনিদাদের উদ্দেশ্যে পানামার সেই কোপা এয়ারলাইনসেই রওয়ানা হই। কিন্তু ব্রাজিল থেকে আমরা পানামায় যে বিমানে এসেছিলাম, এটা ছিলো তার থেকেও ছোট। তবে এবার পথ ছিলো মাত্র চার ঘণ্টার। আমরা যখন ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অফ স্পেনের বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখন আছরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিলা। মেযবানগণ ইমিগ্রেশন ও কাষ্টমসের ধাপসমূহ দ্রুত সমাধান করার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। ত্রিনিদাদ হাতেগোণা সেসব দেশের একটি, যেগুলোতে পাকিস্তানীরা বিমানবন্দরেই ভিসা পেয়ে থাকে। বাইরে স্থানীয় কিছু আলেম এবং আমার দাওয়াতকারী জনাব সিরাজ সাহেব স্বাগত জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে গাড়িতে আরোহণ করে নিকটবর্তী একটি মসজিদে আছরের নামায আদায় করি। অবস্থানস্থলে পৌঁছার পূর্বেই অপর একটি মসজিদে মাগরিবের নামায আদায় করি। আজ রাতে বিশ্রাম করা ছাড়া অন্য কোন কর্মসূচী ছিলো না। তাই সিরাজ সাহেবের নিকট থেকে এখানকার বিভিন্ন অবস্থা জানতেই সময় কেটে যায়।

ত্রিনিদাদ ওয়েষ্ট ইন্ডিজের দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। দু'টি দ্বীপের সমন্বয়ে এ দেশটি। একটির নাম ত্রিনিদাদ, আর অপরটির নাম টোবেগো। এ কারণে পুরো দেশটির নাম ত্রিনিদাদ এন্ড টোবেগো। কথিত আছে যে, ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে যখন কলম্বাস (যার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন) তার তৃতীয় সমুদ্র অভিযানে এখানে আসেন। তখন এখানে এরাভাক নামের একটি জাতি বাস করতো। কলম্বাসের মাধ্যমে স্পেন সরকার তা অধিগ্রহণ করে সে জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দেয় এবং তিনশ বছর পর্যন্ত সেদিকে বিশেষ কোন মনোযোগ আরোপ করে না। ১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ এর উপর আক্রমণ করলে স্পেন সরকার আত্মসমর্পন করে দ্বীপটি তাদের হাতে তুলে দেয়। এখানকার মূল অধিবাসীরা পূর্বেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। তাই এখানে তামাক প্রভৃতি চাষ করার জন্যে আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে দাসদেরকে নিয়ে আসা হয়। তাদের দ্বারা এখানে চাষাবাদের কাজ নেওয়া হয়। ব্রিটিশ একইভাবে টোবেগোতেও নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্স টোবেগোকে হস্তগত করে সেখানে নিজেদের

উপনিবেশ তৈরী করে। কিন্তু ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ফরাসীদেরকে মেরে তাড়িয়ে দেয় এবং ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে একে ত্রিনিদাদের একটি অংশে পরিণত করে। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রচলিত পরাধীনতার বিলুপ্তি ঘটে তখন ব্রিটিশ সরকার এখানে ভারত থেকে অনেক লোক নিয়ে আসে। যারা এখানে পরিশ্রম করবে। এভাবে এখানে হিন্দুস্তানী হিন্দু ও মুসলমানদের বসবাস আরম্ভ হয়। সুতরাং এখানে মোট জনবসতির ৪১ শতাংশ লোক ভারতীয় বংশোদ্ভুত। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের আধিপত্য থেকে মুক্তি লাভের জন্যে এখানে আন্দোলন শুরু হয়। অবশেষে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে মুক্তি লাভ করে একটি স্বাধীন দেশের মর্যাদা লাভ করে। ঐ সময়ে এখানে পৃথিবীর অন্যান্য ভূখন্ড থেকেও মানুষ এসে বসবাস আরম্ভ করে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা এগারো লাখ। তার মধ্যে একলাখ পঁয়ত্রিশ হাজার মুসলমান রয়েছে। মাশাআল্লাহ ছোট এই দেশটিতে ১৩২টি মসজিদ রয়েছে। মসজিদগুলো আবাদ রয়েছে।

নওমুসলিমগণ

ত্রিনিদাদে ইসলাম গ্রহণ করার গড়ও উল্লেখযোগ্য। আমার মেযবান জনাব সিরাজ সাহেব নিজেও একজন নওমুসলিম। তার বাবা ছিলেন একজন হিন্দু। তার মাকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম কবুল করার তাওফীক দিয়েছিলেন। মায়ের প্রভাবে তিনিও মুসলমান হন। দেশের ধর্মীয় তৎপরতায় তার বড়ো ভূমিকা রয়েছে। এ দেশের একজন মন্ত্রী মাদাম ফাতিমাও নওমুসলিম ছিলেন। এক সাক্ষাতকারে তিনি তার ইসলাম গ্রহণের বিস্ময়কর ঘটনা বলেছেন। সাক্ষাতকারটি কায়রোর 'মিম্বারুল ইসলাম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিলো। তার আসল নাম ছিলো মিক ড্যাভিডসন (Mik Davidson)। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ফাতিমা নাম ধারণ করেন। তিনি বলেন- 'আমি একটি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। ৯ই মার্চ ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে গীর্জার সেবিকা হিসেবে দেওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত নেয়। সেদিন ভোরে আমি যখন ঘুম থেকে জাগি, তখন আমার কানের মধ্যে 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি গুঞ্জরিত হতে শুনি। এ শব্দ আমার পুরো অস্তিত্বকে প্রকম্পিত করে। তখন আমি এর অর্থ জানতাম না। কিন্তু আমি এ ঘটনার পর গীর্জায় যেতে অস্বীকার করি। এরপর আল্লাহ তাআলার তরফ থেকে আমি কয়েক বছর পর্যন্ত হেদায়েতের খোঁজে অতিবাহিত করি। অবশেষে আমি কুরআনে কারীমের অনুবাদের একটি কপি পেয়ে যাই। আমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় যে, এটিই সত্য। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের একজন আলেম মাওলানা সিদ্দীক সাহেব এবং ভারতের আলেম শায়েখ আনসারীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত ঘটে। তাদের সঙ্গে আমি আমার বর্তমান আক্বীদার কথা আলোচনা করি। তারা বলেন যে, এসব আকীদার

কারণে আল্লাহর মেহেরবানীতে তুমি একজন মুসলমান। আমি ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ইসলাম কবুল করার ঘোষণা দিই। কিন্তু বাস্তবে আমি আন্ত রিকভাবে তখনই মুসলমান হয়ে গিয়েছিলাম, যখন 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি আমার কানে গুঞ্জরিত হয়েছিলো। কুরআনে কারীমের অনুবাদ পড়ার পর আমার অন্তর ঈমানের নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা ও ভালোবাসা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। পূর্বে মানুষ মনে করতো যে, ত্রিনিদাদে ইসলাম শুধুমাত্র ভারতীয়দের ধর্ম। কিন্তু আমার ইসলাম গ্রহণের পর ত্রিনিদাদের অন্যান্য জাতি বিশেষ করে আফ্রিকান বংশোদ্ভূত লোকেরাও ইসলাম কবুল করেন। এমনকি এখন এখানকার জনবসতির ১৩ শতাংশ মুসলমান, ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের ১৩ শতাংশ, প্রোটেষ্ট্যান্টদের ৩৬ শতাংশ, হিন্দুদের ৬ শতাংশ ও অবশিষ্ট ৩২ শতাংশ অন্যান্য ধর্মের। সিরাজ সাহেব বলেন যে, এখনও মানুষের ইসলাম গ্রহণের ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রতিটি ইসলামিক সেন্টার ও মসজিদে কিছুদিন পরপর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছেন। মুফতী ওয়াসিম সাহেব যে টিভি চ্যানেল চালু করেছেন তা দেখেও মানুষ মুসলমান হওয়ার জন্যে এসে থাকে।

দারুল উলূম ত্রিনিদাদ

ত্রিনিদাদে মাশাআল্লাহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আলেমও রয়েছেন। আমাদের দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপনকারী কয়েকজন আলেমও বিগত বছরগুলাতে এখানে এসছেন। তবে এখানকার আলেমগণের মধ্যে বেশি খ্যাতি রয়েছে মুফতী ওয়াসিম সাহেবের। তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন ভারতের। তিনি জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিননূরী টাউন থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। আমার ত্রিনিদাদ সফরের পিছনে তাঁর উদ্যোগের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। বরং আমি তাঁর কথাতেই এখানে আসার দাওয়াত গ্রহণ করি। তিনি এখানে বড়ো একটি 'দারুল উলূম' পরিচালনা করেন। সুতরাং ত্রিনিদাদে পৌঁছার পরেরদিনই সেখানে প্রথম প্রোগ্রাম ছিলো। যা পোর্ট অফ স্পেন শহর থেকে কিছু দূরে একটি সুন্দর শহরতলীতে অবস্থিত। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে মুফতী সাবিল আলী সাহেব এ দারুল উলূম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে তার ইনতিকালের পর থেকে মুফতী ওয়াসিম সাহেব এর মুহতামিম। তাতে দাওরায়ে হাদীস পর্যন্ত দ্বীনী ইলমের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত প্রচলিত সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দানের মানসম্মত ব্যবস্থা রয়েছে। দারুল উলূম সাবীলুর রাশাদ ব্যাঙ্গালোরের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনায় এর পুরো ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। এর সঙ্গে একটি দারুল ইফতাও রয়েছে। সেখানে ফাতাওয়ার প্রশিক্ষণও দেওয়া

হয়। মাশাআল্লাহ দারুল উলূমের ভবনসমূহও অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। যার দ্বারা তাদের সুব্যবস্থাপনাও প্রতিভাত হয়। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি শুধু ওয়েষ্ট ইন্ডিজেই নয়, বরং পুরো ল্যাটিন আমেরিকার সবচেয়ে বড়ো প্রতিষ্ঠান। এতে বর্তমানে প্রায় পাঁচশ' ছাত্র ও দেড়শ' ছাত্রী শিক্ষা লাভ করছে। তাদের মধ্যে পুরো ওয়েষ্ট ইন্ডিজ ছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্ররাও রয়েছে। মুফতী ওয়াসিম সাহেব ছাড়া মাওলানা সিরাজ আলী সাহেব ও মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেবও এখানকার তৎপর উস্তায ও ব্যবস্থাপকগণের অন্তর্ভুক্ত। দারুল উলূমের ব্যবস্থাধীনে বিবাহ পড়ানো, হালাল গোশতের তত্ত্বাবধান, চাঁদ দেখা ইত্যাদি বিষয়গুলোতেও মুসলমানদের দিকনির্দেশনার দায়িত্ব পালন করা হয়ে থাকে। মুফতী ওয়াসিম সাহেব তাঁর নিজস্ব একটি টিভি চ্যানেল চালু করেছেন। যা মানুষদেরকে কেবল ধর্মীয় তথ্য যোগান দিয়ে থাকে। লোকেরা বললো, এ চ্যানেল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সমাদৃত নয়, বরং- পূর্বে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, অমুসলিম ব্যক্তিরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে মুসলমান হওয়ার জন্যে আসে এবং আল্লাহর মেহেরবানীতে তারা মুসলমান হন।

দারুল উলূমের মসজিদটি অত্যন্ত শানদার। যখন আমরা সেখানে পৌঁছি, তখন তা শ্রোতাদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। যদিও এখানকার মুসলমানদের বেশিরভাগ তারা, যাদের পূর্বপুরুষ হিন্দুস্তান থেকে এসেছিলেন, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তারা নিজেদের ভাষা বিস্মৃত হয়ে গেছেন। এ কারণে এখানে উর্দূ বোঝার লোক না থাকার তূল্য। দারুল উলূমের ছাত্র ও উস্তাযগণ দ্বীনী তালিমের মাধ্যমে উর্দূ ভাষার সাথে কিছুটা পরিচিত। কিন্তু তারাও উর্দূতে কথা বলতে খুব কমই পারদর্শী। সমাবেশে যেহেতু দূর-দূরান্ত থেকে আগত সাধারণ মুসলমানও ছিলেন তাই আমার মেযবানগণ বলেন যে, এখানে ইংরেজীতেই বয়ান হওয়া উচিত। সুতরাং এ দারুল উলূমসহ ত্রিনিদাদের সব জায়গায় আমার সমস্ত বয়ান ইংরেজীতেই হয়। বয়ানের পর মুফতী ওয়াসিম সাহেব দারুল উলূমের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরিয়ে দেখান। তাদের সুব্যবস্থাপনা দেখে খুব আনন্দিত হই এবং অনুভূত হয় যে, এ প্রতিষ্ঠানটি এ ভূখন্ডের জন্যে বড়ো একটি নেয়ামত।

ত্রিনিদাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাক্ষাত

আমার মেযবান সিরাজ সাহেব আমার আগমনের সময় বিমানবন্দরে ভি.আই.পি ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে আমার পরিচিতিমূলক বিবরণ পাঠিয়েছিলেন। এ পরিচিতিমূলক বিবরণটি কীভাবে যেন ত্রিনিদাদের প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল রিচার্ড এর হাতে পৌঁছে। তিনি বিবরণটি দেখে সিরাজ সাহেবকে বলেন যে, আপনার এ মেহমানের সঙ্গে আমার ও প্রধান মন্ত্রীর

সাক্ষাত করিয়ে দিবেন। আমি শুনে অবাক হই যে, তিনি এ তালিবে ইলমের সাথে কেন সাক্ষাত করবেন? তবে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করারও কোন কারণ ছিলো না। সুতরাং ২২ শে শাওয়াল, বুধবার, সকাল দশটায় আমরা প্রেসিডেন্ট ভবনে পৌঁছি। প্রেসিডেন্ট ভবনটি সাদামাটা একটি দোতলা ভবন। তার মধ্যে শান-শওকতের কোন আলামতই ছিলো না। তবে তার পাশের বাগানটি ছিলো অত্যন্ত সুন্দর ও আকর্ষণীয়। প্রেসিডেন্ট আমাদেরকে অবিলম্বে ডেকে নেন এবং অত্যন্ত সম্মান ও সদাচরণ করেন। তিনি আমাকে ত্রিনিদাদে আসার কারণে মোবারকবাদ জানান। প্রাথমিক কথাবার্তার পর তিনি আমাকে বলেন যে, আমি আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনি অনেক কাজ করেছেন এবং এ বিষয়ে অনেক কিতাবও লিখেছেন। তাই আপনার থেকে ইসলামের অর্থনৈতিক বিষয়ের শিক্ষা সম্পর্কে কিছু জানার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং একারণেও এর প্রয়োজন অনুভব করি যে, বর্তমানে সারাবিশ্বে যে অর্থনৈতিক ধস নেমেছে সে সম্পর্কে কেউ কেউ লিখেছে যে, ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো এর দ্বারা কম প্রভাবিত হয়েছে এবং ইসলামী শিক্ষায় এ ধস প্রতিরোধের ব্যবস্থা রয়েছে। আমি তার আসল বিষয় জানতে চাই।

আমি এর উত্তরে কিছুটা বিস্তারিত আকারে নিবেদন করি যে, বর্তমানের ধস ঐ সুদী অর্থব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল, যা সারা পৃথিবীকে তার বিষাক্ত নখ দিয়ে চেপে ধরেছে। এ অর্থ ব্যবস্থার তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেগুলো এই ধসের মূল কারণ। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মাঝে-মধ্যেই পৃথিবী এসব জটিলতার স্বীকার হবে। আমি বলি যে, তার মধ্যে প্রথম বিষয় তো হলো, সুদী কারবারের উপর নির্ভরশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Financial System), যার মধ্যে অর্থ বিনিয়োগের পিছনে প্রকৃত সম্পদ থাকে না। তাছাড়া প্রকৃত অর্থ (তা নোটের আকারে হলেও) এর পরিমাণকে দৃষ্টির আড়াল করে দিয়ে শুধুমাত্র কাল্পনিক ও গাণিতিক অর্থ সৃষ্টি করা হয়। যার পিছনে নোট পর্যন্ত থাকে না। যা কেবলই সংখ্যা হয়ে থাকে। যাকে মুদ্রা কল্পনা করে সুদের কারবারকে চমকানো হয়। Derivatives (কৃত্রিম প্রবৃদ্ধি)-এর ব্যবসা এ পরিস্থিতিকে অনেক দূরে নিয়ে যায়। যে কারণে অর্থের মোট সরবরাহ প্রকৃত অর্থের অনুপাতে একেবারেই সামান্য রয়ে যায় এবং তার পরিবর্তে কেবলই কাল্পনিক ও গাণিতিক অর্থের বিস্তার সীমা অতিক্রম করে যায়। (এ বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা সফরনামার উপযোগী নয়, তবে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমার লিখিত 'সূদ পার তারীখি ফায়সালা' নামক গ্রন্থে রয়েছে।)

দ্বিতীয় মৌলিক কারণ ঋণের বেচাকেনা। যা বর্তমান ধসের মধ্যে আগুনে ঘি ঢেলে দেয়ার কাজ করেছে। তৃতীয় কারণ, স্টক এক্সচেঞ্জে Short Sale (হস্তগত হওয়ার পূর্বেই ক্রয়-বিক্রয়) এবং মালিকানাবিহীন ক্রয়-বিক্রয় (Blank

—১৪

Sales) ব্যবস্থা, যা জুয়াকে বৈধতার সনদ দিয়েছে। আর এ জুয়াবাজিই স্টক মার্কেটে বার বার ধাক্কা দিয়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে থাকে।

এসব বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়ার পর আমি বলি যে, ইসলামে এ তিনটি বিষয়ই নিষিদ্ধ। কুরআন শরীফে সুদকে আল্লাহ তাআলা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুদ্ধের সমার্থক ঘোষণা দেয়া হয়েছে। ইসলামে এমন কোন বিনিয়োগ ব্যবস্থা নেই, যার পিছনে প্রকৃত সম্পদ নেই। ইসলামে ঋণ এমন কোন বাণিজ্যিক লেনদেন নয়, যার দ্বারা মুনাফা কামানো উদ্দেশ্য হতে পারে। শুধুমাত্র বস্তু ও সেবার প্রকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমেই লাভ কামানো সম্ভব। কাল্পনিক, ধারণাপ্রসূত ও অনিশ্চিত জিনিস দ্বারা লাভ কামানো যাবে না। এ কারণে ঋণ বেচাকেনাও নাজায়েয। Derivatives-এর ক্রয়-বিক্রয় এবং এমন সব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়- যা বিক্রেতার মালিকানায় ও দখলে আসেনি- নিষিদ্ধ। বর্তমান অর্থনৈতিক ধসের মূল কারণ এ খারাপ দিকগুলোই। প্রবাদ আছে যে, গমের সঙ্গে ঘুণও যাঁতায় পিষ্ট হয়। সে মতে ধসের যাঁতা যখন ঘুরতে আরম্ভ করে, তখন সবকিছুকেই নিষ্পেষিত করে। তবে যে সমস্ত ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাদের লেনদেনকে এ সমস্ত খারাপ দিক থেকে পবিত্র রেখেছে তারা এ ধস দ্বারা অতো প্রভাবিত হয়নি, যতো প্রভাবিত হয়েছে সাধারণ প্রতিষ্ঠানগুলো।

এরপর আমি নিবেদন করি যে, বর্তমান বিশ্ব এ পর্যন্ত দু'টি অর্থব্যবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা। আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে মানবতাকে তৃতীয় একটি ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা দান করেছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, তৃতীয় এ পন্থাটির কথা যখনই আলোচনা করা হয়, তখনই পশ্চিমা বিশ্বের পক্ষ থেকে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়া হয় যে, যারা ইসলামের কথা বলে তারা ঘড়ির কাঁটাকে পিছনে নিয়ে যেতে চায়। আর এখনতো এ প্রপাগান্ডাও শুরু হয়েছে যে, এটি সন্ত্রাসের ধর্ম। ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, কারও শান্তভাবে ইসলামের শিক্ষা বোঝারও তাওফীক হচ্ছে না।

প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ম্যাক্সওয়েল রিচার্ড- যিনি নিজেও আইন ও অর্থনীতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করেছেন- এ কথাগুলো অত্যন্ত মনোযোগ ও আগ্রহের সাথে শ্রবণ করেন। মাঝে বিভিন্ন প্রশ্নও করতে থাকেন। অবশেষে তিনি বর্তমান অর্থব্যবস্থার এসব খারাপ দিকের কথা স্বীকার করেন। তবে তিনি বলেন যে, এসব খারাপ দিক দূর করা কোন ব্যক্তি বিশেষের কাজ নয়। তবে আমি চাই যে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আপনার সাক্ষাত হোক এবং আমাদের দ্বারা যতোটুকু করা সম্ভব কমপক্ষে তা করতে যেন আমরা ত্রুটি না

করি। (প্রধানমন্ত্রী তখন দেশের বাইরে ছিলেন, ফলে আমার অবস্থানকালে প্রেসিডেন্টের এ ইচ্ছা পূরণ হয়নি।)

প্রায় একঘণ্টা এ সাক্ষাত চলতে থাকে। এর দ্বারা অবশ্যই অনুমিত হয় যে, বর্তমানের অর্থনৈতিক ধস পশ্চিমা বিশ্বের চিন্তাশীল লোকদেরকেও তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দুর্বলতার ব্যাপারে চিন্তা করতে বাধ্য করছে। আমার মরহুম ভাই জনাব যাকী কাইফী রহ. রচিত কবিতার এ পংক্তি আমার স্মরণ হলো-

تنگ آجائے گی خود اپنے چلن سے دنیا
تجھ سے سیکھے گا زمانہ ترے انداز کبھی

'পৃথিবী নিজের চলনেই সংকীর্ণ হয়ে যাবে।
যুগ একসময় তোমার থেকে তোমার ভঙ্গি শিক্ষা করবে।'

আমার মেযবান জনাব সিরাজ সাহেব ত্রিনিদাদের মুসলমানদের জন্যে সুদমুক্ত স্কীম চালু করতে চান। এ বিষয়ের প্রাথমিক কাজ তিনি মাওলানা মুফতী ওয়াসিম সাহেবের দিকনির্দেশনায় সম্পন্ন করেছেন। তবে এর নিয়মতান্ত্রিক কাজ আরম্ভ করার পূর্বে প্রথমত তিনি পেশাদার ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের এক ধারা আরম্ভ করেছেন। যার কয়েকটি প্রোগ্রাম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তার এবং মুফতী ওয়াসিম সাহেবের আকাঙ্খা ছিলো, আমি তাদের ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করে সে বিষয়ে যেন কিছু পরামর্শ দেই। এ উদ্দেশ্যে তারা আমাকে তাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যান এবং এ পর্যন্ত যে সমস্ত কাজ হয়েছে তার সার-সংক্ষেপ পেশ করেন। সংক্ষিপ্ত সময়ে পুরো বিষয়ের উপর দায়িত্বশীলতার সঙ্গে মন্তব্য করা ছিলো জটিল ব্যাপার। তবুও আমি আমার সামর্থ্য মতো মৌলিক কিছু পরামর্শ দেই। সেগুলোর উপর তারা কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাদের বাসনা তো ছিলো, আমি যেন তাদের এ প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ বোর্ডের দায়িত্ব গ্রহণ করি। কিন্তু আমার বিভিন্ন ব্যস্ততা ও দূরত্বের কারণে পূর্বেই অক্ষমতা জানিয়েছিলাম। তবে মুফতী ওয়াসিম সাহেব তাদেরকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন।

ত্রিনিদাদের অবস্থানকাল এ দিক থেকে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে কাটে যে, প্রতিদিন সকাল বেলা কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে অতিবাহিত হয়, আর মাগরিবের নামাযের পর কোন না কোন মসজিদে বয়ানের ধারা চলতে থাকে। এখানকার বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অবগতি লাভ হয়। তাদেরকে পরামর্শ দেওয়ারও সুযোগ হয়। এটা দেখে সার্বিকভাবে আনন্দিত হই যে, আলহামদুলিল্লাহ, এখানকার মুসলমানগণ সচ্ছল হওয়ার সাথে সাথে নিজেদের

দ্বীনের হেফাজতের চিন্তা করে থাকেন। তাবলীগ জামাতের তৎপরতাও এখানে চালু রয়েছে।

ত্রিনিদাদকে ওয়েষ্ট ইন্ডিজের সুন্দরতম দ্বীপসমূহের অন্যতম মনে করা হয়। যেখানে সমুদ্র, পাহাড় ও জলপ্রপাতের এক জগত বিরাজমান। এ কারণে এখানে পর্যটকদেরও খুব আনাগোনা রয়েছে। ওয়েষ্ট ইন্ডিজের অন্যান্য দ্বীপের ন্যায় এখানেও বিষুবরেখার ঋতু অর্থাৎ হালকা গরম ও অধিক বর্ষণ পশ্চিমা পর্যটকদের জন্যে বিশেষ আকর্ষণের কারণ। ব্যস্ততার কারণে দ্বীপটির পর্যটন কেন্দ্রসমূহে তো যাওয়ার সুযোগ আমার হয়নি, তবে স্থানীয় এক বন্ধুর পীড়াপীড়িতে হায়াত রিজেন্সী হোটেলের বাইশতলায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয়। যা অত্যন্ত সুন্দর একটি জায়গায় অবস্থিত। এর একদিকে ক্যারীবিয়ান উপসাগরের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য সর্বদা সামনে বিরাজ করছিলো। অপরদিকে সবুজ-শ্যামল একটি পাহাড়ের পাদদেশে বিস্তীর্ণ শহরের দৃশ্যও ছিলো বড়ো হৃদয়কাড়া। সোমবার থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত পাঁচদিন আমি এখানে অবস্থান করি। জুমার দিনটি দ্বীপের উত্তরের একটি শহরে অতিবাহিত হয়। সেখানে বিশাল এক মসজিদে জুমার বয়ান হয়। মসজিদ মুসল্লীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। মাগরিবের পর সেখানকার আরেকটি মসজিদ সংলগ্ন হলকক্ষে বয়ান হয়। সেখানে শহরের উচ্চশিক্ষিত মুসলমানগণকে বিশেষভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিলো। এটি ছিলো আমার ত্রিনিদাদে অবস্থানের শেষদিন। পরেরদিন সকালবেলা সেখান থেকে বারবাডোজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

বারবাডোজে

বারবাডোজও ওয়েষ্ট ইন্ডিজের ছোট একটি দ্বীপ। আমি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৪ বছর পূর্বে এখানে পাঁচদিন কাটিয়েছিলাম। যার সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমার লিখিত 'দুনিয়া মেরে আগে'র ১০৭ থেকে ১১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে। এখানকার কিছু বন্ধু অনেকবার আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু এবার সেখানে যাওয়া আমার মূল প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। কারণ, ব্রাজিল ও পানামার ভিসা পেতে এতো বেশি সময় লেগে যায় যে, রওয়ানা হওয়ার পূর্বে বারবাডোজের ভিসা সংগ্রহ করতে পারিনি। কিন্তু এখানকার বন্ধু-বান্ধব বিশেষ করে মুফতী মাহমুদ দানা সাহেব আমার ত্রিনিদাদে আসার খবর শুনে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন যে, একদিনের জন্যে হলেও যেন আমি অবশ্যই বারবাডোজ হয়ে যাই। সুতরাং তিনি বিশেষভাবে অত্যন্ত পরিশ্রম করে আমার জন্যে ভিসা সংগ্রহ করেন এবং তার কপি ত্রিনিদাদে পাঠিয়ে দেন। এভাবে ত্রিনিদাদের প্রোগ্রাম থেকে দু'দিন কমিয়ে শনিবার সকালে আমরা বারবাডোজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এটি ছিলো পঁয়তাল্লিশ মিনিটের একটি সফর। বিমানবন্দরে নেমে

দেখি, স্বাগত জানানোর জন্যে অনেক লোকের সমাবেশ ঘটেছে। রবিবার দিন বিকালে আমার ফেরার বিষয়টি চূড়ান্ত ছিলো। তাই সংক্ষিপ্ত এ সময়ে ইসলামিক একাডেমি অফ বারবাডোজের পক্ষ থেকে তারা শুধুমাত্র দু'টি প্রোগ্রাম রেখেছিলেন। একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন, শনিবার সন্ধ্যায় বারবাডোজের সবচেয়ে বড়ো সম্মেলনকক্ষে ইশার নামাযের পর। যার জন্যে তারা আগে থেকে 'ইসলামের অর্থনৈতিক শিক্ষা' শিরোনাম নির্ধারণ করেছিলেন। এ সেমিনারের মূল বক্তব্য আমাকেই রাখতে হয়েছিলো। তাতে স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম ছাড়াও শহরের মুসলিম ও অমুসলিম প্রফেসর, উকিল ও অন্যান্য শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় প্রোগ্রাম ছিলো, রবিবার সকালে একাডেমীর পক্ষ থেকে বারবাডোজের ওলামায়ে কেরামের সঙ্গে একটি পরামর্শ বৈঠক। সেখানে স্থানীয় ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রায় দেড় ঘণ্টা আলোচনা চলতে থাকে। আমি যখন প্রথমবার এখানে এসেছিলাম, তখন এখানে দু'টি বড়ো মসজিদ ছিলো। এখন মাশাআল্লাহ আরেকটি বড়ো মসজিদ হয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যাও বেড়ে তিন হাজারের মতো হয়েছে। একথা আমি পূর্বেই লিখেছি যে, এখানকার মুসলমানগণ শিশুদের শিক্ষার অত্যন্ত সুসংহত ব্যবস্থা করেছেন। এবার আল-ফালাহ প্রাইমারী স্কুল নামে একটি নিয়মতান্ত্রিক স্কুলও দেখতে পাই, যা আলেমগণের তত্ত্বাবধানে কাজ করছে।

রবিবার দিন বারবাডোজে কাটিয়ে আমি মাগরিবের পর বৃটিশ এয়ারওয়েজের বিমানে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ২৭শে শাওয়াল সোমবার ফজরের সময় লন্ডন গেটওয়েক বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এখানে দুপুর একটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। লেষ্টারের জনাব মাওলানা সলিম ধোরাত সাহেব বারবাডোজে থাকতেই আমাকে ফোনে বলেছিলেন যে, তিনি বর্তমানে লন্ডনেই রয়েছেন। এ কয় ঘণ্টা যেন আমি তাঁর সঙ্গে কাটাই। তিনি বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর এক ডক্টর বন্ধুর বাড়ি গেটওয়েকের কাছেই ছিলো। সেখানে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম এবং মাওলানার সঙ্গে উপভোগ্য সাক্ষাতের পর দুপুর দেড়টায় আমিরাত এয়ারলাইনসে দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করি। রাত সাড়ে বারোটায় দুবাই অবতরণ করি। সে রাত দুবাইতে কাটিয়ে প্রত্যুষে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সব মিলিয়ে ৩২ ঘণ্টা সফরের পর করাচীর স্থানীয় সময় বারোটার দিকে বাড়ি পৌঁছি। এভাবে পুরো ২৩ দিন পর দীর্ঘ এ ভ্রমণ আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে নিরাপদে সম্পন্ন হয়। পূর্বাপরের যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহরই।

তাজিকিস্তান সফর

(শাওয়াল, ১৪৩০ হিজরী, অক্টোবর, ২০০৯ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমি শাওয়াল ১৪৩০ হিজরীর শুরুর দিকে পাকিস্তানে বসে তাজিকিস্তানের দূতাবাসের পক্ষ থেকে এ সংবাদ পাই যে, তাজিকিস্তান সরকার এ মাসে হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। সেখানে আমাকেও দাওয়াত করা হয়েছে। আমি সাধারণত এ ধরনের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করে থাকি। ঘটনাক্রমে এ সময় আমি বাংলাদেশে যাওয়ার ওয়াদা করেছিলাম। এ কারণে আমার নিকট সুস্পষ্ট ওযরও ছিলো। তবে আমাদের মাদরাসায় তাজিকিস্তানের যে সব ছাত্র শিক্ষা লাভ করছে, তারা পীড়াপীড়ি করে বলে যে, আমার এ ক্ষেত্রে দাওয়াতটি অবশ্যই কবুল করা উচিত। তারা বলছিলো যে, প্রথমত, এটি প্রথম উদ্যোগ, যখন তাজিকিস্তান সরকার দ্বীনী কোন বিষয়ে এমন একটি সম্মেলনের আয়োজন করছে। দ্বিতীয়ত, সাধারণ অবস্থায় পাকিস্তানের আলেমদের জন্যে বিবিধ কারণে তাজিকিস্তানের সফর করা দুষ্কর হয়ে থাকে। তাই এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সেখানে একটি সফর করা হলে সেখানকার দ্বীনদার লোকদের জন্যে শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে। তাজিকিস্তানের অনেক ছাত্র আমাদের দারুল উলূম থেকে শিক্ষা লাভ করে সেখানে ফিরে গেছে। তাদের টেলিফোনও আসে। তারাও একই মত ব্যক্ত করেন। তাই আল্লাহর নামে ভরসা করে আমি এ সফরের সংকল্প করি। বাংলাদেশের মেযবানও সেখানকার সফর বিলম্বিত করতে সম্মত হন।

মধ্য এশিয়ার যে সমস্ত মুসলিম দেশ সেভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্ত হয়েছে, তার মধ্যে উজবেকিস্তান ও কিরগিজিস্তানের সফর আমি ইতিপূর্বে

করেছি। (কিরগিজিস্তানের সফরনামা প্রকাশিতও হয়েছে।) কিন্তু তাজিকিস্তান সফরের এটি ছিলো প্রথম সুযোগ। কিরগিজিস্তান ও রাশিয়া সফরে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু জনাব জাভেদ হাজারবী সাহেব আমার সাথে ছিলেন। তিনি এসব দেশে বার বার সফর করেছেন। সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত। তাই আমি তাকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করি। তিনিও আনন্দচিত্তে প্রস্তুত হয়ে যান।

তাজিকিস্তান পরিচিতি

সফরের বিবরণের আগে তাজিকিস্তানের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা মুনাসিব মনে করছি। তাজিকিস্তান বর্তমানে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। যার নাগরিকদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান। ৫৫,২৫০ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তৃত এ দেশটির বেশিরভাগ পাহাড়ী অঞ্চল। পামির পর্বতসারির বরফাচ্ছাদিত চূড়াসমূহও এর অন্তর্ভুক্ত। এর সীমানা পূর্বে চীন, পশ্চিম ও উত্তরে উজবেকিস্তান ও কিরগিজিস্তান এবং দক্ষিণে আফগানিস্তানের সাথে মিলিত হয়েছে। দেশটির রাজধানীর নাম 'দুসানবে' (Dushanbe) এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর 'খাজান্দ'। সেখানে অনেক আলেম ও আল্লাহর ওলী জন্ম গ্রহণ করেছেন। মাওলানা রূমী রহ.-এর শাইখ হযরত খাজা শামসে তিবরিজের মুরশিদ বাবা কামাল উদ্দীন রহ.- যাঁকে কতক জীবনীতে 'জুন্দী' এবং অন্য কতকে 'খাজান্দী' লেখা হয়ে থাকে- তিনিও সম্ভবত এখানেরই লোক। তাজিকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাষা ফার্সী। কিন্তু রুশদের দখলের পর রাশিয়ান লিপিতে তা লেখা হয়ে থাকে।

এ দেশ ছিলো সেই বিস্তৃত অঞ্চলের একটি অংশ, যাকে আরবী উৎস গ্রন্থসমূহে 'মা ওয়ারাউন নাহার' বলা হয়। এ পরিভাষায় 'নাহার' দ্বারা 'জাইহুন' নদী উদ্দেশ্য। বর্তমানে যাকে 'আমু দরিয়া' বলা হয়। নদীর ওপারের পুরো এলাকাটিকে 'মাওয়ারাউন নাহার' বলা হতো। তার মধ্যে উজবেকিস্তান, কিরগিজিস্তান ও তাজিকিস্তানের পুরো এলাকা অন্তর্ভুক্ত। মুসলমানগণ এসব অঞ্চল দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দীতেই জয় করেছিলেন। এ পুরো ভূখন্ডকে- যা বর্তমানে কয়েকটি দেশে বিভক্ত- ইসলামী দেশের একটি প্রদেশ মনে করা হতো। শেষ যুগে উজবেকিস্তানসহ পুরো তাজিকিস্তান বুখারার অধীনে ছিলো। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 'জাইহুন' নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল- যার মধ্যে 'বলখ' অঞ্চলটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য- আফগানিস্তানের অংশে পরিণত হয়। 'তাজিক' বংশের বড়ো একটি জনসংখ্যা সেখানে বিদ্যমান। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার জার মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহকে দখল করতে আরম্ভ করে। বুখারা রাজ্য দীর্ঘদিন পর্যন্ত রাশিয়ার হামলার মোকাবেলা করতে থাকে। কিন্তু অবশেষে ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এ সম্পূর্ণ অঞ্চল রাশিয়া দখল করে নেয়। ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে

কমিউনিস্ট সেভিয়েত বিপ্লব ঘটে। তখন তারা এ সম্পূর্ণ অঞ্চল দখল করার চেষ্টা করে এবং ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে দুসানবে দখল করে। বুখারার ইবরাহীম বেগের নের্তৃত্বে মুসলমানদের প্রতিরোধ আন্দোলন ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে। কিন্তু অবশেষে সেভিয়েত রাশিয়া এ পুরো অঞ্চলটির উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়। তাজিকিস্তানকে সে তার পনেরোটি রাজ্যের অন্যতম সাব্যস্ত করে 'সেভিয়েত রিপাবলিক' নির্ধারণ করে। মুসলমানদের উপর জুলুম-অত্যাচারের ধারা তো রাশিয়ার জারের সময় থেকেই অব্যাহত ছিলো। কিন্তু সেভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যকালে এ অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। মসজিদসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হয়। নামায পড়া নিষিদ্ধ করা হয়। দ্বীনী শিক্ষার তো প্রশ্নই আসে না। কুরআনে কারীমের কোন কপি রাখাও অপরাধ ছিলো। যে সমস্ত আলেম প্রতিরোধের চেষ্টা করেন, তাদেরকে চরম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়। মুসলমানদের প্রায় চুয়াত্তরটি বছর এ কঠিন পরীক্ষার মধ্যে অতিবাহিত হয়। তবে এখানকার মুসলমানগণ বিশেষ করে আলেমগণকে সাধুবাদ জানাই যে, তারা ধৈর্য পরীক্ষার এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে দ্বীনের হেফাজতের জন্যে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেন। তারা লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তেন এবং অন্যকে দ্বীন শিক্ষা দিতেন। অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর দায়িত্বশীল রুশরা যখন আরামের ঘুমের স্বাদ উপভোগ করতো, তখন তাদের ভূগর্ভস্থ কক্ষে দ্বীনের তালীমের ধারা আরম্ভ হতো এবং ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগে তা সমাপ্ত হতো। এর ফলে চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত জুলুম-অত্যাচারের যাঁতায় নিষ্পেষিত হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের দ্বীন ও ঈমান সংরক্ষিত রেখেছেন। যখন সেভিয়েত ইউনিয়নের শাসনব্যবস্থা বিলুপ্তি ঘটে, তখন তাদের বেশিরভাগ লোক আন্তরিকভাবে খাঁটি ও পোক্ত মুসলমান রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সেভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মুক্তি লাভের পর তাজিকিস্তান যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে, তখন এখানকার কতক উৎসাহী মুসলমান এটিকে নিখাদ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তারা সশস্ত্র প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন। যে কারণে এ দেশটি স্বাধীনতা লাভের পর কয়েক বছর পর্যন্ত গৃহযুদ্ধের শিকার হয়। অবশেষে তাজিকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমাম আলী আব্দুর রহমান ক্ষমতায় আসেন। তখন তিনি সন্ধি চুক্তির নীতি অবলম্বন করেন। আব্দুল্লাহ নূরী ছিলেন সশস্ত্র আন্দোলনের নেতা। তিনিও উপলব্ধি করেন যে, এ গৃহযুদ্ধের ক্ষতি অনেক বেশি। তাই নিজেদের পদ্ধতির পরিবর্তন করা উচিত। ফলে তিনিও সন্ধিতে সম্মত হন। এভাবে উভয় দলের মধ্যে এ বিষয়ে সন্ধি হয় যে, আব্দুল্লাহ নুরীর দল 'হিযবে ইসলামী' নামে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করবে। সুতরাং যারা সশস্ত্র প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করতে আরম্ভ

করেন। এখন তারা পার্লামেন্টের সদস্য পদের মাধ্যমে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। শুরুর দিকে সংসদে তাদের প্রভাবশালী প্রতিনিধিত্ব লাভ হয়েছিলো। কিন্তু অজানা কোন কারণে তাদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পেতে থাকে। বর্তমানে সংসদে তাদের আসন সংখ্যা মাত্র অল্প কয়েকটি। তবে এর ফলে সরকারের নীতির সমালোচনা করার মোটের ওপর তাদের স্বাধীনতা রয়েছে এবং কিছু হলেও এর প্রভাব দেখা যায়। অপরদিকে সরকার সব সময় এ আশংকা বোধ করে যে, ধর্মীয় শক্তিসমূহ পুনরায় তাদের জন্যে কোন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে এখনো পর্যন্ত সেখানে প্রাইভেট মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনুমতি নেই। মসজিদগুলো যদিও উন্মুক্ত হয়েছে, কিন্তু সেগুলোতে দ্বীনী কাজ খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরেই করা সম্ভব। এভাবে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি রুশদের আধিপত্যের তুলনায় কিছুটা ভালো হয়েছে ঠিক, তবে এসব নিষেধাজ্ঞার কারণে দ্বীনী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত লোকদের জন্যে অনেক সমস্যাও রয়েছে। এমতো পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষ থেকে ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী একটি সম্মেলনের আয়োজন করাকে এখানকার ধার্মিক শ্রেণী সরকারের সঙ্গে মতবিরোধ থাকা সত্ত্বেও সৌভাগ্যের বিষয় মনে করছে। আর এ কারণেই তারা আমাকে এতে অংশগ্রহণের জন্যে জোরদারভাবে ফরমাইশ করে।

দুসানবের সফর

১২ অক্টোবর ২০০৯ ঈসায়ী জুমাবার বিকালে আমি করাচী থেকে ইসলামাবাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সেখান থেকে রাত একটায় কিরগিজিস্তান এয়ারলাইনসের বিমানে আরোহণ করি। বিমানের মধ্যেই জানতে পারি যে, পাকিস্তান থেকে ইসলামাবাদের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ভাষা বিভাগের কয়েকজন শিক্ষকও সম্মেলনের দাওয়াত পেয়েছেন এবং মিডিয়ার কিছু প্রতিনিধিকেও দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। এভাবে এ বিমানেই ১৯ জন সফর করছিলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ওড়ার পর রাতের শেষ প্রহরে আমরা কিরগিজিস্তানের রাজধানী বিশকেক বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এখানে অন্য একটি বিমানের জন্যে আমাদেরকে পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সে বিমান আমাদেরকে তাজিকিস্তানের রাজধানী দুসানবে নিয়ে যাবে। রাতের শেষ প্রহর হলেও বন্ধুদের একটি দল আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্যে বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। তারা আমাদের জন্য ভি. আই. পি. লাউঞ্জেরও ব্যবস্থা রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে জনাব আলহাজ্জ মুহাম্মাদ মুখতার সাহেব, আমাদের দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ আলী কিরগীজী ও কিরগিজিস্তানের নায়েবে মুফতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশকেকের এ বন্ধুদের সঙ্গে তিন বছর পর সাক্ষাত

হয়। এ কারণে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে কথাবার্তা চলতে থাকে। তারপর কিছুক্ষণের জন্যে তারা আমার বিশ্রামেরও ব্যবস্থা করেন। ফজরের সময় হওয়ার পর বিমানবন্দরের মসজিদে নামায আদায় করি। নামাযের পর তারা আড়ম্বরপূর্ণ নাশতার আয়োজন করেন। তা উপভোগ করার পর বিমান যাত্রার সময় ঘনিয়ে আসে। সকাল আটটায় আমরা তাজিকিস্তান এয়ারলাইনসের বিমানে আরোহণ করি। এটি ছিলো ছোট একটি বিমান, যা তাজিকিস্তানের রাজধানী দুসানবে পৌঁছতে প্রায় তিন ঘণ্টা সময় নেয়।

এ আকাশপথের বেশিরভাগ অংশ পামিরের সুবিস্তৃত পর্বতসারির উপর দিয়ে অতিক্রম করে। বিমানের উচ্চতা অধিক না থাকায় পামিরের বরফাচ্ছাদিত চূড়া ও উপত্যকাসমূহের বাঁক নেয়া দৃশ্য অত্যাধিক মনোমুগ্ধকর লাগছিলো। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এসব পাহাড়সমূহকে প্রাকৃতিক ফ্রিজার বানিয়ে সেগুলোর চূড়ায় পানির বিশাল ভান্ডার জমা করে রেখেছেন। যেখান থেকে তা প্রয়োজন মতো গলে গলে নদীর আকার ধারণ করে মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের ব্যবস্থা করে। কুরআনে কারীম এ হাকীকতের দিকে নিম্মোক্ত ভাষায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে-

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. (المؤمنون:٢٣)

'আমি আকাশ থেকে পরিমাণ মতো পানি অবতরণ করি এবং তা যমীনের মধ্যে আটকিয়ে দেই।'

এ আয়াতের অধীনে আমি 'তাওযীহুল কুরআনে' লিখেছি-

'অর্থাৎ, আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদেরকে যদি দায়িত্ব দেয়া হতো যে, তোমরা তা সঞ্চিত করে রাখো, তবে তা তোমাদের ক্ষমতাধীন ছিলো না। আমি পাহাড়ের উপর পানি বর্ষণ করে বরফের আকারে জমাট করে দিয়েছি। যা ক্রমান্বয়ে গলে গলে নদীর আকার ধারণ করে এবং তার স্রোত মাটির নিচে ছড়িয়ে থাকে। যেগুলো থেকে কূপ তৈরী হয়। এভাবে মাটির নিচে সে পানি সংরক্ষিত থাকে।'

পামিরের পার্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে কিছু সমতল ভূমিও আসে। অবশেষে বিমানটি দুসানবের বিমানবন্দরে অবতরণ করে। সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ বিমানের সিঁড়িতেই আমাদেরকে স্বাগত জানান এবং ভি.আই.পি. লাউঞ্জে নিয়ে যান। সেখানে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। তাজিকিস্তানের পাকিস্তানী দূত জনাব খালেদ ওসমান কায়সার সাহেবও তার বন্ধুবান্ধবসহ আমাদেরকে স্বাগত জানান এবং তাজিকিস্তান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য অবহিত করেন। আমাদের দারুল উলূম থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলেম মাওলানা হিকমত উল্লাহ সাহেবও কিছু সময়ের জন্য লাউঞ্জে আসেন। তিনি বলেন যে, বাইরে আলেম ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বড়ো একটি সমাবেশ

প্রতীক্ষারত আছে। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর বাস্তবিকই স্বাগতিকদের একটি বড়ো সমাবেশকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো দেখতে পাই। তাদের মধ্যে আমাদের দারুল উলূম ও পাকিস্তানের অন্যান্য মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপনকারী আলেম ও অন্যান্য মহব্বতকারীগণও ছিলেন। প্রায় এক শতাব্দী পর সম্ভবত এটি ছিলো প্রথম সুযোগ, যখন উপমহাদেশ থেকে ইলমে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি তাজিকিস্তানে এসেছে। এ কারণে তাদের কারো কারো চোখে আনন্দাশ্রু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। তাদের সঙ্গে লম্বা সময় নিয়ে সাক্ষাত করার সুযোগ ছিলো না এবং মেযবানগণের ব্যবস্থাপনা তার অনুমতিও দিচ্ছিলো না। তাই তাদের সঙ্গে সংক্ষেপে সালাম, দোয়া ও মোসাফাহা করেই ক্ষান্ত হতে হয় এবং ইচ্ছা ছিলো সেখানে অবস্থানকালে এমন কোন সময় রাখা হবে, যখন তাদের সাথে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ হবে।

থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো আবিস্তা হোটেলে। অবস্থানস্থলে পৌঁছার পর ব্যবস্থাপকগণ বলেন যে, যোহরের নামাযের পর মেহমানদেরকে এখানে একটি ঐতিহাসিক দূর্গে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু সফরের ক্লান্তি এতো বেশি ছিলো যে, তাদের কাছে অক্ষমতা জানিয়ে আমি কিছু সময় বিশ্রাম করি। আছরের নামাযের পর জানতে পারি যে, হোটেলের বাইরে সাক্ষাতপ্রার্থীদের একটি দল প্রতীক্ষারত আছেন। যারা হেটেলের নিরাপত্তাজনিত ব্যবস্থার কারণে ভিতরে আসতে পারছেন না। আমি জানতে পারলাম যে, হোটেলের নিকটেই একটি গলিতে শহরের সবচেয়ে বড়ো জামে মসজিদ রয়েছে। আমি তাদের সঙ্গে ঐ মসজিদে সাক্ষাত করার ইচ্ছা করি। তাদেরকে মসজিদে চলে যাওয়ার জন্যে সংবাদ পাঠাই। কিছুক্ষণ পর আমি হোটেল থেকে বের হই। হোটেলটি যে সড়কে অবস্থিত তা শহরের সবচেয়ে বড়ো এবং জাঁকজমকপূর্ণ সড়ক। যার উভয়দিকের উঁচু উঁচু চানার বৃক্ষ তার সৌন্দর্যকে দ্বিগুণ করেছে। ঋতু ছিলো মনোমুগ্ধকর ঠান্ডা। আমরা তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলার স্বাদ উপভোগ করতে করতে মসজিদের দিকে যাই। মসজিদের মোড়ে গিয়ে মানুষের ভিড় দেখতে পাই। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথকভাবে মোসাফাহা করি। তাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন আমাদের মাদরাসা থেকে শিক্ষা সমাপনকারী, আর কয়েকজন ছিলেন কিতাব ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমার সম্পর্কে অবগত। আর কয়েকজন শুধুমাত্র পাকিস্তান থেকে আগত একজন তালিবে ইলমের সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।

মসজিদের বাইরে একটি ভবনে তাজিকিস্তানের একমাত্র মাদরাসা রয়েছে। যা সরকারী ব্যবস্থাপনায় চালু আছে। যেসব রাষ্ট্র রাশিয়ানদের ব্যবস্থাধীনে ছিলো, সেভিয়েত ইউনিয়নের শাসনকালে সেখানকার অধিকাংশ মসজিদ ও

মাদরাসা তো ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যে তারা 'মুফতিয়াত' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রেখেছিলো, যা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তার প্রধানকে 'মুফতী' বলা হয়। ফাতাওয়া দেওয়ার চেয়ে ধর্মীয় বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করাই ছিলো তার প্রধান কাজ। এর তত্ত্বাবধানে কিছু দ্বীনী শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে। এসব রাষ্ট্র স্বাধীন হওয়ার পরেও সে ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এটিও সেরকমই একটি মাদরাসা। যার মধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা তো রয়েছে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ের, কিন্তু মসজিদের ব্যবস্থাপনার কাজ তাদের হাতে ন্যস্ত রয়েছে। যেসব শিক্ষক এখানে নিয়োগপ্রাপ্ত হন, তারা দ্বীনী কাজ করার তুলনামূলকভাবে অধিক স্বাধীনতা লাভ করে থাকে।

উপস্থিত লোকদের সঙ্গে দেখা করতে করতে যখন মসজিদের নিকটে পৌঁছি, তখন সেখান থেকে মনকাড়া মাগরিবের আযান ঘোষিত হচ্ছিলো। এটি ছিলো দুর্গ সদৃশ অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ একটি মসজিদ। যার সুউচ্চ মিনার ও কারুকার্যপূর্ণ নির্মাণশৈলী থেকে তার শান-শওকত প্রকাশ পাচ্ছিলো। দুসানবের বিখ্যাত বুযুর্গ সুফী হযরত শাইখ ইয়াকুব চারখী রহ.-এর নামে একে 'ইয়াকুব চারখী জামে মসজিদ' বলা হয়। তাঁর মাযার অন্যত্র। মসজিদের ইমাম সেই 'মুফতিয়াত' অধিদপ্তরেরই এক ব্যক্তি। তিনি মোটামুটি আরবী বলতে পারেন। অত্যন্ত মহব্বতের সাথে তিনি মিলিত হন। মসজিদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেন। মাগরিবের নামাযের পর মানুষ অপেক্ষায় ছিলো, যেন আমি তাদের নিয়ে সেখানে একটি মজলিস করি। কিন্তু কনফারেন্সের আয়োজকগণ বলেন- মেহমানদেরকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাওয়ার প্রোগ্রাম নির্ধারিত রয়েছে। তাই এবারেও তাদের কাছে ছুটি চাই। সম্মেলনের মেহমানদের সম্মানে একটি রেষ্টুরেন্টে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিলো। এখানে তাকে 'চায়খানা' বলা হয়। সেখানেই রাতের খানা খাই।

পরদিন ছিলো রবিবার। সোমবার দিন থেকে সম্মেলন আরম্ভ হবে। তাই আমি ধারণা করেছিলাম যে, এ দিনটি অবসর পাওয়া যাবে। তখন তাজিকিস্তানের বন্ধুদের সঙ্গে সবিস্তারে দেখা-সাক্ষাত ও কথাবার্তার সুযোগ হবে। তাদের সমস্যাবলী জেনে-বুঝে যতটুকু সম্ভব সাহায্যের চেষ্টা করা যাবে। এখানকার বিশেষ বিশেষ জায়গা দেখারও সুযোগ হবে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিলো অন্যরকম। সেদিন রাত তিনটার সময় আমার কিডনিতে ব্যথা আরম্ভ হয়। ভোর নাগাদ তা প্রচন্ড আকার ধারণ করে। ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকে ডাক্তার ইনজেকশন দেয়। কিন্তু ব্যথা বন্ধ হয় না। তারা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। রবিবার সারাদিন এবং সোমবারেরও বড়ো একটি সময় আমাকে হাসপাতালে থাকতে হয়। এ সময় সম্মেলনের আয়োজকগণ যে মহব্বত, আন্তরিকতা ও সুব্যবস্থাপনা দেখান, তা ভোলার মতো নয়। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজে

আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের ডাইরেক্টর রবিবার ছুটির দিন হওয়া সত্ত্বেও যে সকল সিনিয়র ডাক্তারের প্রয়োজন ছিলো তাদেরকে ডাকিয়ে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। আমার জন্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি কক্ষের ব্যবস্থা করেন। আমার সঙ্গী মাওলানা হিকমতুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা ফররুখ সাহেবের রাত কাটানোর জন্যে সেখানেই পৃথক কামরার ব্যবস্থা করেন। আলহামদুলিল্লাহ! কয়েক ঘণ্টা পর ব্যথা বন্ধ হয়ে যায়। তবে সবসময় চিকিৎসকগণের তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা রাখা হয়। পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত জনাব খালেদ উসমান সাহেব আমাকে দেখতে আসেন। তিনদিন পর্যন্ত তার বাসা থেকে আমার স্বাস্থ্যসম্মত খাবার আসতে থাকে। রবিবার দিন আমার সফরসঙ্গী জনাব জাভেদ হাজারবী ছাড়া তাজিকিস্তানের মাওলানা সরওয়ার সাহেবকেও ডাক্তার আমার সাথে থাকার অনুমতি দেন। মাওলানা সরওয়ার সাহেব কিছুদিন আমাদের দারুল উলূমেও পড়েছেন। তবে জামেয়া ফারুকিয়া থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি দুসানবে থেকে বেশ দূরের একটি শহরে অবস্থান করেন। তিনি বলেন যে, শহরটি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বুখারী ও ইমাম তিরমিযী রহ. প্রমুখের উস্তায হযরত মুহাম্মাদ বিন বাশ্‌শার রহ.-এর শহর। সেখানেই তাঁর মাযার রয়েছে। আমাকে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, তখন তিনি হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। হাসপাতালেও তিনি সাথে থাকেন। অত্যন্ত হৃদ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সেবা-শুশ্রূষা করতে থাকেন। হাসপাতালের বাইরে সারাদিন সাক্ষাতপ্রার্থীদের ভীড় ছিলো। আমি ও আমার সঙ্গীরা বিস্মিত ছিলাম যে, এতো অধিক পরিমাণ মানুষ আমাদের এখানে আসার বিষয় কী করে জানতে পারলো? তাদের কেউ কেউ শত শত কিলো মিটার দূর থেকে সফর করে এখানে এসেছেন।

ভীনদেশে সফরকালে- বিশেষত যেখানে আমার এই প্রথমবার আসা হয়েছে- এমন অসুস্থতা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ কষ্ট দূর করার এতো বেশি উপকরণ দান করেন যে, দেশ থেকে দূরে থাকার অনুভূতিও আমার হয়নি। পরেরদিন সম্মেলন আরম্ভ হবে। তার উদ্বোধনী অধিবেশনে আমার বয়ানও নির্ধারিত ছিলো। কিন্তু একজন উচ্চপদস্থ অফিসার প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে আমাকে দেখতে আসেন। তিন প্রেসিডেন্টের এ পয়গাম পৌঁছান যে, আপনার সুস্থতা অগ্রগণ্য। তাই আপনি কোন চাপ নিবেন না। কাল আপনার সাস্থ্য ভালো থাকলে এবং ডাক্তারগণ আপনার অবস্থা দেখে অনুমতি দিলে আপনার যখন ইচ্ছা সম্মেলনে আসবেন এবং আগ্রহ হলে কিছু কথা বলবেন, অন্যথায় বিশ্রাম করবেন। সুতরাং পরেরদিন দুপুর পর্যন্ত ডাক্তারগণ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আমাকে হাসপাতাল থেকে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু হোটেলে যাওয়ার পরও শরীর দুর্বল থাকে। আমি উদ্বোধনী

অধিবেশনে অংশ নিতে পারিনি। তবে আমার জন্যে পৃথক গাড়ি ও পথপ্রদর্শকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো। তাই সন্ধ্যাবেলা অল্প সময়ের জন্যে সেখানে নামমাত্র উপস্থিত হই।

ইমাম আযম রহ. সম্মেলন

সম্মেলন হচ্ছিলো আড়ম্বরপূর্ণ একটি ভবনে। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারি, কী বিশাল পরিসরে সারা পৃথিবী থেকে এখানে লোক জমা করা হয়েছে। একেকটি দেশ থেকে যদিও অনেক লোককে দাওয়াত করা হয়েছে, কিন্তু সম্ভবত তাজিকিস্তানে এ ধরনের সম্মেলন ছিলো এই প্রথম। এখানে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং এমন লোকদের সংখ্যা কম ছিলো, যাদের ইমাম আযম আবু হানীফা রহ.-এর সঙ্গে কোন দিক থেকে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বিখ্যাত ব্যক্তিগণের মধ্যে শাইখুল আযহার, মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক ড. আব্দুস সালাম ওব্বাদী এবং ইরানের মাওলানা আঃ হামীদ সাহেব ও মাওলানা ইসহাক সাহেব উল্লেখযোগ্য।

পরেরদিনও সম্মেলন চলছিলো। ব্যবস্থাপকগণ বলেন যে, অল্প সময়ের জন্যে আপনি সম্মেলন ক্ষেত্রে আসুন। আপনি যাওয়ার সাথে সাথে আপনার বয়ানের ঘোষণা করে দেওয়া হবে, যাতে আপনাকে অপেক্ষা করতে না হয়। সুতরাং তাই করা হয়। আমি আরবীতে ইমাম আযম রহ.-এর ফিকহের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেই। যার সারকথা ছিল এই-

ফিকহে হানাফীর প্রথম বৈশিষ্ট্য এই যে, তা ফুকাহায়ে কেরামের বড়ো একটি দলের পরামর্শে প্রস্তুত হয়েছে। সম্ভবত ইমাম আবু হানীফা রহ. প্রথম ব্যক্তি, যিনি ফিকহী বিষয়ে পারস্পরিক পরামর্শের প্রতি নিয়মতান্ত্রিক গুরুত্বারোপ করেছেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ফিকহের চারটি মাযহাবের মধ্যে ফিকহে হানাফীই একমাত্র মাযহাব, যা দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আলমে ইসলামের অধিকাংশ ভূখন্ডে সরকারী ও আদালতের মাযহাব হিসেবে বাস্তবায়িত ছিল। এ কারণে যে পরিমাণ বাস্তব অভিজ্ঞতা এ মাযহাবের ক্ষেত্রে হয়েছে, তা অন্য কোন মাযহাবের ক্ষেত্রে হয়নি।

তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক বিষয়াদি সম্পর্কে এ মাযহাবে যে পরিমাণ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে, তা ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর 'আসসিয়ারুল কাবীর' ও ইমাম সারখসী রহ.-এর 'শরহুস সিয়ারিল কাবীর' দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে। গতকালের সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী কেউ কেউ হানাফী ফকীহগণের 'আসহাবুর রায়' হওয়ার এ ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, তারা যুগের চাহিদা অনুপাতে কুরআন-হাদীসের বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যাখ্যা দিতেন। আমার বক্তব্যে বিস্তারিতভাবে এ

কথা খন্ডন করে বলি যে, 'রায়' শব্দটি সে যুগে বিশেষ একটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যারা হাদীস মুখস্থ করার পরিবর্তে ফিকহী মাসআলা উদ্ভাবন করাকে নিজেদের মিশন রূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে 'আসহাবুর রায়' বলা হতো। শব্দটি প্রথমদিকে মালেকী ফকীহগণের জন্যে ব্যবহৃত হয়। যেমনটি ইমাম ইবনে আবদুল বার রহ.-এর 'আল ইসতিযকার লিমা তাযাম্মানাহুল মুয়াত্তায়ু মিম মায়ানির রা'য়ি ওয়াল আ-সার' নাম থেকে স্পষ্ট হয়। তবে পরবর্তী কালে ফিকহকে বিশেষ মিশনরূপে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কুফার ফকীহগণ বিশেষত হানাফী ফকীহগণের বিশিষ্ট অবস্থান ছিলো। এ কারণে উপাধিটি তাদের জন্যে অধিক ব্যবহৃত হয়। এর উদ্দেশ্য এটা মোটেই নয় যে, তারা নিজেদের ব্যক্তিমতকে কুরআন-হাদীসের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। কিংবা স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির পরিবর্তে যুগচাহিদা ভিত্তিক নিজেদের মতানুসারে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। পরিশেষে আমি এ দিকটির প্রতি অধিক জোর দেই যে, ইমাম আযম রহ. সম্পর্কে এ সম্মেলন অনুষ্ঠান করায় তাজিকিস্তান অবশ্যই মোবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু তার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার আসল দাবি হলো, তিনি ইসলামী আইন সংকলনের যে বিরাট কীর্তি সম্পাদন করেছেন তা দ্বারা মুসলিম বিশ্ব নিজেদের আইন প্রণয়নে উপকৃত হবে এবং তাকে নিজেদের আইনের ভিত্তি বানাবে।

বাস্তবে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মহান জীবনচরিত এবং তাঁর ফিকহী উচ্চমার্গের বিষয়ে বক্তব্য দিয়ে ইলমী ও মতাদর্শিক স্বাদ উপভোগ করা তো সম্ভব, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যে এ ধরনের সম্মেলন নয়, বরং প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্পের। আমাদের অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বে যার বড়ো অভাব দেখা যায়। তাজিকিস্তানের বেসরকারী লোকেরা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করছিলেন এবং তাদের পক্ষ থেকে সম্মেলনের লক্ষ-উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নানা রকম কথাবার্তা হচ্ছিলো। তবে এখানকার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে তারা এতোটুকুকেই গণীমত মনে করছিলেন যে, সরকার যেহেতু মহান এক দ্বীনী ব্যক্তিত্বের দিকে মনোযোগী হয়েছেন, তাই আগামীতে এটি হয়তো দেশের নীতিমালায় দ্বীনের ভিত্তিতে উত্তম কিছু সাধনের ভূমিকা হবে। সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রেসিডেন্ট যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা দ্বারাও মোটের উপর এ চিন্তার সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ, তিনি তার বক্তব্যে বলেছেন- আমাদের দেশের উপাদান তাওহীদের খামীরার উপর তৈরী হয়েছে। আমরা যেমন দেশের জাগতিক উন্নতি চাই, তেমনি আমাদের রূহানী ও ঈমানী মূল্যবোধ পরিপূর্ণরূপে অক্ষত থাকুক তাও আমরা চাই। আল্লাহ করুন, তাদের এ সুধারণা যেন সঠিক প্রমাণিত হয়।

দুসানবে শহর

আমি আমার বক্তব্য শেষ করে সম্মেলনকেন্দ্র থেকে চলে আসি। গত রাতে পুনরায় ব্যাথা অনুভব হয়েছিলো। তাই বয়ান শেষে চেক-আপের জন্যে আবার হাসপাতালে যাই। যার ফলাফল ছিলো মোটের উপর তৃপ্তিজনক। আলহামদুলিল্লাহ, ফেরার পথে সাথীরা বললেন- দুসানবে শহরটি এক চক্কর ঘুরে দেখা হোক। গাড়িতে থেকেই তারা শহরের বিশেষ বিশেষ জায়গা দেখান। অতঃপর মধ্য শহরের এমন একটি পাহাড়-চূড়ায় নিয়ে যান, যেখান থেকে পুরো শহর দেখা যায়।

দুসানবে শহরের আলোচনা প্রাচীন কিতাবগুলোতে পাওয়া যায়না। সেভিয়েত ইউনিয়নের শাসনামলে একে 'স্টালিনাবাদ' বলা হতো। রাশিয়ানরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন জনবসতিকে সংযুক্ত করে এ শহর গড়ে তোলে। তার মধ্যে একটি জনবসতিতে সোমবার দিন বাজার বসতো বলে তাকে 'দুসানবে' বলা হতো। রুশদের থেকে দেশ স্বাধীন হলে এর নাম পুনরায় 'দুসানবে' রাখা হয়। কিন্তু আমার ধারণা হয় যে, শহরটি ঐ অঞ্চলে অবস্থিত, প্রাচীন কিতাবগুলোতে যাকে 'চাগানিয়া' বা 'সগানিয়া' বলা হতো। যেখানকার আনেক আলেম 'সগানি' সম্মন্ধ দ্বারা প্রসিদ্ধ। এরূপ ধারণা করার কারণ এই যে, দুসানবে-তেই শাইখ ইয়াকুব চারখী রহ.-এর মাযার রয়েছে। তাঁর জীবনীতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি 'চাগানিয়া'য় অবস্থান করতেন। আমি তাজিকিস্তানের বিভিন্ন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে দেখলাম যে, চাগানিয়া নামে কোন শহর বা জনবসতির কথা তাদের জানা নেই। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে চাগানিয়ার যে পরিচয় দেয়া হয়েছে তার দ্বারাও এ কথাই ধারণা হয় যে, এটি সেই তিন জনবসতির একটি হবে, যেগুলোকে সংযুক্ত করে দুসানবে শহর আবাদ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ। এ কথা যদি সঠিক হয়ে থাকে তাহলে এ অঞ্চলটি এক সময় বড়ো বড়ো আলেমের কেন্দ্র ছিলো।

'ভারযুব' নদী

দুসানবে শহরটি এখানকার প্রসিদ্ধ ভারযুব (Varzob) নদীর দু'দিকে অবস্থিত। শহরের বাইরে দ্বিমুখী পাহাড়ের ধারা চলে গেছে। যার মধ্য দিয়ে নদীটি তেমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে, যেমন প্রবাহিত হয়েছে আমাদের দেশের সোয়াত বা কোনহার নদী। শহর থেকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে সেই পাহাড়সারি ও নদীর মাঝখানে একটি বিনোদন কেন্দ্র রয়েছে। যেখানে নদীর ঠিক উপরে প্রেসিডেন্ট নিজের জন্যে একটি ভবন বানিয়েছেন। সেই ভবনে আজকে সম্মেলনের অতিথিদের জন্যে মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। শারীরিক দুর্বলতার কারণে আমার প্রথমে যদিও সেখানে যাওয়ার সাহস হচ্ছিলো না। কিন্তু সাথীরা বললেন- সেখানে গেলে মন প্রফুল্ল হওয়ার আশা রয়েছে।

তাই আমি তাতে অংশগ্রহণ করার জন্যে রওয়ানা হই। শহর থেকে বের হওয়ার পর সারা পথে উভয়দিকের পাহাড় ও তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর অত্যন্ত সুন্দর দৃশ্য বিরাজ করছিলো। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বসতিও দেখা যাচ্ছিলো। গন্তব্যে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই তা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর জায়গা। অনেকটা আমাদের সোয়াত এলাকার বাহরাইনের মতো। প্রেসিডেন্টভবনটি বিনোদন অঞ্চলের মধ্যভাগে নদীর উপর নির্মিত হয়েছে। চতুর্পাশ্বে রয়েছে সুন্দর সুন্দর বাগান। তার মধ্যে আকর্ষণীয় বৃক্ষ ও ফুলের চারা নিপুণভাবে লাগানো হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় নৈসর্গিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ এসব জায়গা বাস্তবিকই মন-মগজকে সজীব করে তোলে। কিন্তু অসুস্থার কারণে আমার খুব বেশি দুর্বল লাগছিলো। কড়া ঔষধপত্রের কারণে মনে হচ্ছিলো যেন মন-মগজ অবসাদগ্রস্থ হয়ে আছে। ফলে মন এসব দৃশ্য উপভোগ করার পরিবর্তে দ্রুত ফিরে গিয়ে বিশ্রাম করার চিন্তায় ছিলো অস্থির।

বাস্তবে আল্লাহ তাআলা প্রতিমুহূর্তে আমাদের উপর যেই অসংখ্য নেয়ামতের বারি বর্ষণ করছেন, তার মধ্যে মনের প্রফুল্লতা এমন একটি নেয়ামত, যা কেবলই আল্লাহ তাআলার দান। বিরাট অঙ্কের সম্পদ ব্যয় করেও তা ক্রয় করা সম্ভব নয়। বেশিরভাগ সময় এ নেয়ামত আমরা মুফতেই পেয়ে যাই। দিনরাত এর দ্বারা সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও শোকর আদায় করা তো দূরের কথা তার উপলব্ধি ও স্বীকারোক্তি থেকেও আমরা উদাসীন থাকি। কিন্তু কখনো তা হাতছাড়া হলে তখন আমরা তার কদর বুঝতে পারি। আর তখনও শোকরের পরিবর্তে নাশোকারীমূলক কথাই আমাদের মুখ থেকে বের হয়। মানুষ যদি আল্লাহর দেয়া নেয়ামতসমূহের শোকর আদায় করার অভ্যাস গড়ে তোলে তাহলে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে। তার দুনিয়া ও আখেরাত সাফল্যমন্ডিত হবে।

মধ্যাহ্ন ভোজ থেকে ফিরে আসার পর আছরের নামায পড়ে কিছু সময় বিশ্রাম করি। এ সময় প্রায় একঘণ্টার মতো গাঢ় ঘুম হয়। যা দেহ-মনকে পরিতৃপ্ত করে। বুঝতে পারলাম ঘুমও কতো বড়ো নিয়ামত! তখন কুরআনে কারীমের আয়াত স্মরণ হলো-

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. (النباء:٩)

'এবং আমি ঘুমকে তোমাদের জন্যে অবসাদ দূরকারী বানিয়েছি।'

মাগরিবের নামাযের পর শরীর অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। চিন্তা করলাম যে, দুসানবে অবস্থানের আর একটিমাত্র দিন বাকি রয়েছে। যার প্রোগ্রাম আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে। তাই মাগরিবের পরের এ সময়টিকে হযরত শাইখ ইয়াকুব চারখী রহ.-এর মাযারে সালাম পেশ করার কাজে লাগনো যেতে পারে।

মাওলানা হিকমত উল্লাহ ও মাওলানা ফররুখ সাহেব দু'দিন ধরে সবসময় আমার সঙ্গে ছিলেন। হোটেলেও আমার সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। তাদের পথপ্রদর্শনে হোটেল থেকে রওয়ানা হই। অল্প সময়েই গন্তব্যে পৌঁছে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি যে, আমাদের আসার সংবাদ শুনে আরো কিছু সাথী এখানে এসেছেন।

শাইখ ইয়াকুব চারখী রহ.-এর মসজিদে

হযরত শাইখ ইয়াকুব চারখী রহ. মূলত গজনীর নিকটবর্তী জনবসতি 'চরখে'র লোক। তিনি নকশবন্দী সিলসিলার প্রবর্তক হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ রহ.-এর মুরীদ ছিলেন। কিন্তু হযরত তাঁকে নিজ খলীফা হযরত আলাউদ্দীন আত্তার রহ.-এর হাতে ন্যস্ত করেন। তিনি চাগানিয়ায় অবস্থান করতেন। এ কারণে তিনিও এখানে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি তাঁরই মুরীদদের মধ্যে পরিগণিত হন। তিন উঁচু মাপের সুফী ছিলেন। হযরত খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার রহ. তাঁর খলীফা ছিলেন। তাঁর থেকে নকশবন্দী সিলসিলার স্বতন্ত্র এক শাখা চালু হয়। হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান জামী রহ. তাঁর 'নাফাহাতুল উনস' কিতাবে এবং হযরত শাইখ হাশেম কাশমী রহ. 'নাসামাতুল কুদ্স' কিতাবে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

এখানে তাঁর মাযারের পাশে একটি মসজিদ রয়েছে। মসজিদের আঙ্গিনার চর্তুদিকে এমন ধরনের কিছু ভবন রয়েছে, যেগুলো দেখে মনে হয় যে, একসময় সেগুলো মাদরাসা ছিলো। মসজিদের পূর্বদিকে তাঁর মাযার অবস্থিত। তাঁকে সালাম দেওয়ার এবং ঈসালে সওয়াব করার তাওফীক লাভ হয়।

ইরানের দারুল উলূম যাহেদানের মুহতামিম মাওলানা আব্দুল হামীদ সাহেবও সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্যে এসেছেন। রাতের বেলা তিনি সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনেন। সাক্ষাতকালে আমরা এ বিষয়েও আলোচনা করি যে, তাজিকিস্তানের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাত্র, যারা দ্বীনী ইলম শিক্ষা করার জন্যে পাকিস্তান বা ইরানের বেলুচিস্তানে যায়, অতঃপর এখানে এসে দ্বীনের খেদমত করতে চায়। আমরা এখানে অবস্থানকালে তাদের জটিলতাসমূহ দূর করার জন্যে কী করতে পারি? এ বিষয়ে কতগুলো পন্থা চিন্তা করা হয়। সেগুলো নিয়ে তাজিকিস্তান সরকারের দ্বায়িত্বশীল এবং পাকিস্তান দূতাবাসের সঙ্গে আলোচনা করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রথমোক্ত দায়িত্বটি মাওলানা আবদুল হামীদ সাহেব গ্রহণ করেন। কারণ, তিনি আরও কয়েকদিন এখানে অবস্থান করবেন। আর দ্বিতীয় বিষয়ে আমি চেষ্টা করার ইচ্ছা করি।

পরেরদিন ছিলো বুধবার। আমরা সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণের নিকট থেকে এ মর্মে অনুমতি নিয়েছিলাম যে, দারুল উলূম করাচী বা পাকিস্তানের অন্যান্য মাদরাসা থেকে শিক্ষা লাভকারী তাজিকিস্তানের ছাত্রদের সঙ্গে এখনো পর্যন্ত

আমাদের দেখা-সাক্ষাত করার এবং বিস্তারিতভাবে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়নি। তাই আজ আমরা তাদের প্রোগ্রামের বাইরে সে সব ছাত্রের সঙ্গে মিলিত হতে চাই। সুতরাং তাজিকিস্তানী এক ব্যবসায়ীর অফিসে আমাদের এসব সাথীকে সমবেত করা হয়। তাদের অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে আমি মোটামুটিভাবে অবগত ছিলাম। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে যে পদ্ধতিতে কাজ করা উচিত আমি তার উপর আলোকপাত করি। পরিস্থিতি এমন ছিলো যে, তাজিকিস্তানে কোন দ্বীনী খেদমত করতে তারা দ্বিমুখী সংকটের সম্মুখীন ছিলেন। একদিকে আমাদের ভুল কর্ম-কৌশলের কারণে পাকিস্তান সম্পর্কে ব্যাপক আকারে এ প্রতিক্রিয়া ছড়ানো হয়েছে যে, এটি সন্ত্রাসীদের দেশ। এ কারণে এখান থেকে যারা পড়াশোনা করে যায়, সরকারী লোকেরা তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। দ্বিতীয়ত, সে দেশে প্রাচীন ধাঁচের যে সমস্ত আলেমের প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে, তাদের এ কৃতিত্ব তো অনস্বীকার্য যে, তারা সেভিয়েত ইউনিয়নের জুলুম-অত্যাচারের শাসনামলে দ্বীনের হেফাযতের জন্যে নিজেদের জান বাজি রেখেছেন এবং বিভিন্ন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করে নিজেদের দ্বীন সংরক্ষণ করেছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইসলামিক সেন্টারসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তাদের মধ্যে এমন কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতি চালু হয়ে যায়, যেগুলো সংশোধনযোগ্য। যেসব ছাত্র দ্বীনী ইলমে সজ্জিত হয়ে সেখানে যায় তারা এসব পদ্ধতির সঙ্গে একমত হতে পারে না। ফলে, প্রাচীন ধাঁচের এসব আলেমও তাদেরকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। এ কারণে তারা উভয় সংকটে রয়েছে। তৃতীয়ত, এখনো পর্যন্ত সে দেশে দ্বীনী তালীম-তারবিয়তের সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে তারা সেখানে দ্বীনী খেদমত সম্পাদন করতে পারে। আমি তাদের কাছে নিবেদন করি যে, আপনারা প্রজ্ঞার সাথে এবং পর্যায়ক্রমে অধিক গুরুত্বপূর্ণকে প্রাধান্য দেওয়ার মুলনীতির ভিত্তিতে কাজ করুন। নিজেদের জন্যে উপার্জনের যে কোন পন্থা অবলম্বন করে ব্যক্তিগতভাবে মসজিদভিত্তিক দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে থাকুন। এ বিষয়ে সেখানকার অবস্থা মোতাবেক উপযোগী পরামর্শ দিই। তারা ফিক্‌হ বিষয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন লিখে এনেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সেসব প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ধারা চলতে থাকে। মাওলানা মুঈনুদ্দীন সাহেব অনেক আগে দারুল উলূম করাচী থেকে শিক্ষা সমাপন করে এসেছেন। তিনি আমার নিকট জামে' তিরমিযী পড়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ, তিনি এখানে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন। খুশীর বিষয় যে, দুসানবেতে তরুণ আলেমগণ তাঁকে নিজেদের শীর্ষস্থানীয় মেনে চলছেন। তাঁর পরামর্শ মোতাবেক তারা সমস্ত কাজ করে থাকেন। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ মজলিস তাদের তৃপ্তির কারণ হয়। কয়েকদিন ধরে বিস্তারিত আলোচনা না হওয়ার বেদনা দূরীভূত হয়।

ফেরার পথে অল্প সময়ের জন্যে মাওলানা মুঈনুদ্দীন সাহেবের মসজিদেও হাজির হই। সেখানে দু'আ হয়। তারপর পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জনাব খালেদ ওসমান সাহেব পাকিস্তান থেকে আগত মেহমানদের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন। একটার দিকে আমরা পাকিস্তান দূতাবাসে পৌঁছি। সাধারণত আমাদের দূতাবাসগুলোর ব্যাপারে এই প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় যে, তারা দেশের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের হক আদায় করেন না। কিন্তু আমরা এখানকার দূতাবাসকে এর ব্যতিক্রম পাই। মাশাআল্লাহ, জনাব খালেদ ওসমান সাহেব একজন কর্মতৎপর দেশপ্রেমিক মানুষ। তিনি তাজিকিস্তানে দেশের স্বার্থ রক্ষায় যেসব উদ্যোগ নিয়েছেন, সেগুলো বিস্তারিতভাবে অবহিত করেন। তিনি একথাও বলেন যে, এখানে পাকিস্তানী পণ্য বাজারজাতের অত্যন্ত উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এদেশে ব্যবসা প্রসারের জন্যে কী কী পদক্ষেপ নিয়েছেন তাও আলোচনা করেন। তাজিকিস্তানী ছাত্রদের ভিসা প্রদানের বিষয়েও তার সঙ্গে কথা হয়। তিনি তার কর্মপন্থা বলে দেন। দেশের স্বার্থকে সামনে রেখে মানুষের ভিসা পেতে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট করতে যেন না হয়, সে জন্যে তিনি পরিপূর্ণ চেষ্টা করবেন বলে নিশ্চয়তা দেন। আমার অসুস্থ অবস্থায় তিনি যেই ভালোবাসা নিয়ে আমার যত্ন নেন এবং তার স্ত্রী সাহেবা আমার স্বাস্থ্যোপযোগী খানা পাঠানোর বিষয়ে যে গুরুত্ব দেন, সে কারণে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাদের শুকরিয়া আদায় করি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং দেশ ও জাতির অধিক থেকে অধিক খেদমত করার তাওফীক দিন। আমীন।

বিশকেকে

পরেরদিন সকাল দশটায় আমাদের ফিরতি যাত্রা আরম্ভ হবে। হোটেলে এবং তারপর বিমানবন্দরে বিদায়ী শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকারীদের সঙ্গে সাক্ষাত করতে করতে আমরা দশটার সময় কিরগিজিস্তান এয়ারওয়েজের বিমানে আরোহণ করি। তাজিকিস্তান কিরগিজিস্তানের তুলনায় পাকিস্তানের অধিক নিকটবর্তী। ইসলামাবাদ থেকে দুসানবের সরাসরি বিমান থাকলে হয়তো দেড়ঘণ্টায় এ সফর সম্পন্ন হতো। কিন্তু যেহেতু সরাসরি কোন বিমান নেই তাই যাওয়া-আসা উভয়ক্ষেত্রে প্রথমে কিরগিজিস্তান যেতে হয়। কিরগিস্তানের রাজধানী বিশকেক যাওয়ার জন্যেও ইসলামাবাদ থেকে সপ্তাহে মাত্র একটি বিমান রয়েছে। যা শুক্রবারে যাতায়াত করে। এ কারণে আমাদেরকে বৃহস্পতিবার বিশকেক পৌঁছে দেড়দিন সেখানে অবস্থান করতে হবে। আমি তিন বছর পূর্বে যখন কিরগিজিস্তান এসেছিলাম, তখন এখানকার একটি ঐতিহাসিক শহর অওযোজান্দ যাওয়ার বাসনা ছিলো। সে উদ্দেশ্যে আওশ পর্যন্ত সফরও করেছিলাম। কিন্তু সে সময় অওযোজান্দে কিছু বিশৃঙ্খলা চলছিলো, যে কারণে সেখানে যাওয়ার পথ বন্ধ

করে দেয়া হয়েছিলো। ফলে আমি সেখানে যেতে পারিনি। এবার জনাব জাভেদ হাজারবী সাহেব ও বিশকেকের বন্ধুজনেরা এভাবে প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন যে, আমি দুসানবে থেকে বিশকেক ফিরে এসে বিমানবন্দর থেকেই বিমানযোগে আওশ চলে যাবো এবং সেখান থেকে গাড়িতে করে আওযোজান্দ গিয়ে সেখানে অবস্থান করবো। জুমার দিন সেখান থেকে ফিরে এসে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। কিন্তু দুসানবেতে যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন বন্ধুরা মত দেন যে, বর্তমান অবস্থায় কষ্টকর এ সফর করা সমীচীন হবে না। সে মতে সেখান থেকে ফোন করে বিশকেকের লোকদেরকে এ প্রোগ্রাম স্থগিত করতে বলি। তারা ক্রয়কৃত টিকিটও ফিরিয়ে দেন। তাদেরকে বলেছিলাম যে, বিশকেক অবস্থানকালে যেন কোন প্রোগ্রাম না রাখা হয়। এ সময়টি যেন পুরোপুরি আরামের জন্যে রাখা হয়।

আমি বিশকেক পৌঁছলে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মোখতার সাহেব ও আরো কিছু বন্ধু প্রত্যাশানুসারে স্বাগত জানান। এয়ারলাইনসের পক্ষ থেকে যদিও আমাদের জন্যে বিশিষ্ট একটি হোটেলে বুকিং দেয়া ছিলো, কিন্তু বিশকেকের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জনাব সমর সাহেবের ইচ্ছায় বন্ধুগণ তার বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন। যা ছিলো শহরের অত্যন্ত আকর্ষণীয় এলাকায় সমস্ত আবাসিক সুবিধা দ্বারা সজ্জিত। সমর সাহেব নিজেও বিমানবন্দরে এসেছিলেন। তিনি বলেন যে, দীর্ঘদিন ধরে আমি আপনার সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করে আসছিলাম। এজন্যে পাকিস্তান সফর করার ইচ্ছা ছিলো। কিন্তু যখন আপনার আসার কথা জানতে পারলাম, তখন এটাকে আমি আমার জন্যে খোদাপ্রদত্ত ব্যবস্থা মনে করলাম। মাওলানা মুহাম্মাদ আলী ও মোখতার সাহেবের নিকট আমি আবেদন করি, আমার এখানে যেন থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তারা তা মঞ্জুর করেন।

বিশকেকের আবহাওয়া ছিলো অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। মেঘাচ্ছন্ন ও শীতল। যা সবসময়ই আমার কাছে খুব ভালো লাগে। দুসানবেতেই শরীর কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলো। এখানকার আবহাওয়া এবং মেযবানগণের ভালোবাসা ও নিষ্ঠা তা আরো উন্নত করে দেয়। মোখতার সাহেব আমার মনের প্রফুল্লতা দেখে বলেন যে, 'এখনো অওযোজান্দের প্রোগ্রাম হতে পারে। তা এভাবে যে, আজ আপনি পরিপূর্ণ বিশ্রাম করবেন। কাল সকালে আমরা আটটার বিমানে আওশ যাবো এবং সেখান থেকে অওযোজান্দ যাবো। দুপুর পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে তৃতীয় প্রহরে সেখান থেকে ফিরে আসবো। বিশকেক থেকে ইসলামাবাদের বিমান সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় রওয়ানা হবে। তাই সময়ের অনেক পূর্বেই আপনি ফিরে আসতে পারবেন। এতে করে আপনার বাসনাও পূর্ণ হবে এবং অওযোজান্দের ওলামায়ে কেরাম এবং মান্যগণ্য ব্যাক্তিগণ- যারা

আপনার সফর রহিত করায় ব্যথিত ছিলেন- তারাও আনন্দিত হবেন।' আমিও চিন্তা করলাম- জানি না, আবার কখনো আসা হবে কি না। তাই আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে রাজী হয়ে গেলাম। সমর সাহেব অত্যন্ত ভালোবাসা ও নিপুণতার সঙ্গে বিশ্রামের এতো সুন্দর ব্যবস্থা করেন যে, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে দুপুরের বিশ্রামের পর শরীর আরো চাঙ্গা হয়ে ওঠে। আছরের নামাযের পর তিনি বলেন যে, বিশকেকের উপকণ্ঠে আমি একটি মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি। এখনো সেখানে নামায আরম্ভ হয়নি। আমার মনের বাসনা, আপনি সেখানে প্রথম নামায পড়াবেন। গাড়িতে গেলে আমরা সেখানে মাগরিবের নামায পড়তে পারবো। আমিও এটাকে নিজের জন্যে সৌভাগ্যের কারণ মনে করলাম। আমরা সেখানে যাই। মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে কিরগিজিস্তানই একমাত্র দেশ, যেখানে মসজিদ-মাদরাসার উপর কোন বিধি-নিষেধ নেই। সুতরাং সেখানে কয়েকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে একটি মাদরাসা আমাদের সফরসঙ্গী জনাব জাভেদ হাজারবী সাহেব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আরেকটি মাদরাসা করেছেন, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী সাহেব। এখন এ মাদরাসাটি করতে চাচ্ছেন সমর সাহেব। সেখানে গিয়ে দেখলাম, মাশাআল্লাহ! তিনি অত্যন্ত সুরুচি ও মহব্বতের সঙ্গে মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেছেন। এখানে নির্মাণ ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু মাশাআল্লাহ, এ পুরো নির্মাণ কাজ সমর সাহেব নিজ খরচে সম্পন্ন করেছেন। এখানে আমরা মাগরিবের নামায পড়ি। এভাবে মসজিদে নিয়মিত নামায আরম্ভ হয়ে যায়।

রাতে ইশার নামাযের পর কিছু সাক্ষাতপ্রার্থী আসেন। তাদের সঙ্গে কিছু সময় দ্বীনী কথাবার্তা ও প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। তারপর বিশ্রাম করি। পরেরদিন সকাল আটটায় মোখতার সাহেবের সঙ্গে বিমানবন্দরে গিয়ে আওশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমানে আরোহণ করি। অন্য সাথীরা সিট না পাওয়ায় বিশকেকেই রয়ে যান। আওশ যদিও এখান থেকে ছয়শ' কিলোমিটার দূরে। কিন্তু ছোট জেট বিমানটি পঞ্চাশ মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। আমি পূর্বেও আওশ এসেছি। কিরগিজিস্তানের সফরনামায় তার পরিচয়ও তুলে ধরেছি। এ সফরে এ তথ্যটি জানতে পারি- যা বিভিন্ন কিতাব দ্বারা সত্যায়িতও হয়- আওশ হযরত খাজা কুতুবউদ্দীন বখতিয়ার কাকী রহ.-এর জন্মস্থান এবং তাঁর মাতৃভূমি। কিন্তু এখন এখানে অবস্থান করা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। আমাদেরকে এখান থেকে পয়ঁতাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অওযোজান্দ যেতে হবে। এর জন্যে মোখতার সাহেবের এক বন্ধু বিমানবন্দরেই তার ল্যান্ডক্রুজার গাড়ী পাঠিয়েছিলেন। তখন নয়টা বাজছিলো। আমাদেরকে সোয়া দুইটার সময় এখান থেকে বিশকেক যাওয়ার উদ্দেশ্যে বিমান ধরতে হবে। এ কারণে

এখানকার ভি. আই. পি. লাউঞ্জের দায়িত্বশীলদের কাছে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে রাখার জন্যে টিকিট দিয়ে দেয়া হয়। ল্যান্ডক্রুজার আমাদেরকে নিয়ে অওযোজান্দের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। সড়ক ছিলো পরিচ্ছন্ন। পয়ঁতাল্লিশ কিলোমিটার পথ আধাঘণ্টার থেকেও কিছু কম সময়ে অতিক্রম করি।

কাযী খান রহ.-এর শহরে

অওযোজান্দকে অওযোগন্দও বলা হয়। এটি 'মা ওয়ারাউন নাহার'-এর মানবপ্রসবা ভূখন্ড 'ফারগানা' প্রদেশে অবস্থিত। যার বেশিরভাগ অংশ এখন উজবেকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। অওযোজান্দ থেকে অনেক খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে। তবে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব আল্লামা কাযী খান রহ.। যাঁর ফাতাওয়া হানাফী ফিকহে স্বতসিদ্ধ ভিত্তির মর্যাদা রাখে। তাছাড়া বিখ্যাত হানাফী ফকীহ শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ. এ শহরেই দীর্ঘদিন বন্দী ছিলেন। এখানেই তিনি তাঁর জগদ্বিখ্যাত কিতাব 'আল মাবসুত' সংকলন করেন। তাঁর কবরও রয়েছে এ শহরেই।

এ শহরে একটি মিনার রয়েছে, যা প্রাচীনতা সত্ত্বেও নিজ প্রভাব দ্বারা প্রত্যেক দর্শককে প্রভাবিত করে থাকে। এ মিনারের সামনে খনন করার ফলে একটি বিশাল মাদরাসার নিদর্শন বের হয়েছে। যার সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, এটি আল্লামা কাযী খান রহ.-এর মাদরাসা ছিলো। হয় তো এ মিনারটি মাদরাসার বা তৎসংলগ্ন মসজিদের মিনার ছিলো। আমাদের পথপ্রদর্শক ঐ মিনারের নিকট গিয়ে গাড়ি থামান। মোখতার সাহেবের বন্ধু- যিনি আমাদের জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছিলেন- তার নামও মোখতার। তিনি এ প্রদেশের গভর্ণরের আত্মীয়। আমরা সেখানে পৌঁছতেই গভর্ণর সাহেব এবং মোখতার সাহেব আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্যে সেখানে চলে আসেন। সাথে একজন প্রত্নতত্ত্ববিদকেও নিয়ে আসেন। তিনি এ মিনার ও অন্যান্য নিদর্শনের বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য আমাদেরকে অবহিত করেন। আমি গভর্ণর সাহেবকে বলি- 'আপনি এমন এক এলাকার সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন, যা বহু শতাব্দী পর্যন্ত ইলম ও তাকওয়ার কেন্দ্র ছিলো।' আমি বিশেষভাবে আল্লামা কাযী খান ও শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ. সম্পর্কে তাকে বলি। তিনি বললেন- প্রথমে আমি এ শহরের এই ইলমী গুরুত্বের কথা জানতাম না। পরবর্তীতে যখন জানতে পারলাম যে, এখানে এতো মহা মনীষীর জন্ম হয়েছে, তখন থেকে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। আমরা এখানে খনন কাজ চালিয়ে এ মাদরাসার নিদর্শনসমূহ আবিষ্কার করেছি। আমরা এ মাদরাসার স্মৃতি ধরে রাখার জন্যে এখানে নির্মাণ কাজ করতে চাই। তিনি বলেন- কিছুদিন পূর্বে জার্মানীর একটি দল এখানে এসেছিলো। তারা এ জায়গাকে সংরক্ষিত করার

জন্যে নিজেদের ব্যয়ে চতুর্দিকে একটি জালির দেয়াল তৈরী করেছে। মুসলিম দেশগুলো এ কাজে আগ্রহী হলে এখানে অনেক কল্যাণমূলক কাজ হতে পারে।

আল্লামা কাযী খান রহ.-এর পুরো নাম হাসান বিন মনসুর অওযোজান্দী। ফখরুদ্দীন তাঁর উপাধি। তিনি ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীর অন্যতম ফকীহ। তাঁর দাদা মাহমুদ বিন আব্দুল আযীয অওযোজান্দী রহ. শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ.-এর শাগরিদ ছিলেন। কাযী খান তাঁর দাদা ছাড়া আল্লামা জহীর উদ্দীন মারগিনানী রহ. থেকেও ফিকহের শিক্ষা লাভ করেন। মারগিনান শহর- যা 'হিদায়া'র গ্রন্থকারেরও মাতৃভূমি- এখান থেকে অনেক কাছে উজবেকিস্তানে অবস্থিত। 'ফাতাওয়া কাযী খান' ছাড়াও ফিক্‌হ বিষয়ে তাঁর আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তাঁর মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর জামে সগীরের ভাষ্যগ্রন্থ এবং আল্লামা খাস্‌সাফ রহ.-এর 'আদাবুল কাযা'র ভাষ্যগ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত। ৫৯২ হিজরীতে তাঁর ইনতিকাল হয়। এ মাদরাসা যদিও এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, কিন্তু এখানকার বাতাসে ইলম ও তাকওয়ার সেই সমস্ত পর্বতসম ব্যক্তিত্বের পবিত্র আত্মার সৌরভ অনুভূত না হয়ে পারে না। আল্লাহ তাঁদের প্রতি রহম করুন।

ইমাম সারখসী রহ.-এর মহল্লায়

এখান থেকে আমরা অওযোজান্দের প্রাচীন মহল্লাসমূহ অতিক্রম করতে করতে একটি মহল্লায় এসে পৌঁছি। এখানে শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ.-এর কবর আছে বলা হয়। কবরটি একটি ঘন জনবসতির মাঝে অবস্থিত। প্রত্নতত্ত্বের লোকেরা বলে যে, এ কবরের উপর অত্যন্ত পুরাতন একটি ফলক লাগানো ছিলো। তাঁর উপর শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ.-এর নাম লেখা ছিলো। প্রত্নতত্ত্বের লোকেরা সেটি রাশিয়ায় নিয়ে যায়। আমরা যখন ঐ কবরের নিকট যাই, তখন শহরের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তারা বলেন যে, আমরা যখন কবরবাসীর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানতে পারি, তখন কবরের নিকটে একটি মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করার ইচ্ছা করি। কিন্তু পুরো এলাকাটি ঘন বাড়িঘর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো। এখানকার লোকেরা অন্য কোথাও যেতে রাজী ছিলো না। কিন্তু যখন তাদেরকে বলা হলো যে, এখানে অনেক বড়ো একজন আলেমের স্মৃতিস্বরূপ একটি মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করা হবে, তখন তারা উপযুক্ত মূল্যে নিজেদের জায়গা ছেড়ে দিতে তৈরী হয়ে যায়। এখানে প্রস্তাবিত মসজিদ ও মাদরাসার নকশা বসানো ছিলো। সেই নকশা দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল যে, কবরটি পাকা করে তার উপর গম্বুজ বানানোর ইচ্ছাও তাদের রয়েছে। আমি দায়িত্বশীল লোকদের বলি- কবরকে পাকা বানানো এবং তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করা ঠিক নয়। আল্লামা সারখসী রহ. নিজেও এটি পসন্দ করতেন না। একারণে নকশার মধ্যে এতোটুকু পরিবর্তন করা উচিত।

তিনি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করার ওয়াদা তো করেন- কিন্তু জানি না, এর উপর তিনি কতটুকু আমল করতে পারবেন।

কূপের মধ্য থেকে ইমাম সারখসী রহ.-এর 'মাবসূত' সংকলন

শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ. (মৃত্যু- ৪৩৮ হিজরী) এর পুরো নাম মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আবু বকর সারখসী রহ.। তিনি পঞ্চম শতাব্দীর সেসকল আলেমের অন্যতম, যাঁদের 'আয়াতুম মিন আয়াতিল্লাহ' (আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন) বলা উচিত। মূলত তিনি ছিলেন খোরাসানের জনবসতি সারাখসের লোক। সম্ভবত তিনি ইলম অর্জনের জন্যে ফারগানার এ অঞ্চলে এসেছিলেন। তিনি সে যুগের শাসকের মর্জির বিরুদ্ধে কোন ফাতাওয়া দিয়েছিলেন কিংবা নসিহতমূলক কোন কথা বলেছিলেন, যে কারণে তখনকার শাসক খাকান তাঁকে কূপের ন্যায় একটি গর্তের মধ্যে বন্দী করে রাখে। কী কারণে তাঁকে এতো কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়, নির্ভরযোগ্য কোন সূত্রে তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারিনি। ডক্টর সালাহ উদ্দীন মুনজিদ 'শরহুস সিয়ারুল কাবীরের' ভূমিকায় একটি কারণ এই বর্ণনা করেছেন যে- 'খাকান তার এক বাঁদীকে মুক্ত করে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই বিবাহ করে। ইমাম সারখসী রহ.-এর উপর আপত্তি করেন।' কিন্তু এর কোন উদ্ধৃতি তিনি দেননি। এর কাছাকাছি একটি ঘটনা তাঁর মুক্তির পরের নির্ভরযোগ্য আলোচনা গ্রন্থে পাওয়া যায়। হতে পারে সে কারণে কারো সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। কারণ যাই হোক, সে যুগের শাসক হক-কথা বলার কারণে তাঁকে এ কঠিন পরীক্ষায় ফেলেছিলো যে, তাঁকে বহু বছরের জন্যে কূপের ন্যায় একটি গর্তে বন্দী করে রাখা হয়। যেখানে তাঁর জন্যে চলাফেরা করাও সম্ভব ছিলো না। শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ. মাবসুতের কিতাবুস সীয়ারের শেষে একথা লিখেছেন যে, একটি হক কথা বলার কারণে তাঁকে বন্দী করা হয়। কিন্তু তিনি তার বিস্তারিত বিবরণ দেননি। (তার ভাষ্য সামনে আসছে)

এ ঘটনায় তাঁর ছাত্রদের কী পরিমাণ কষ্ট হয়েছিলো তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তারা উস্তাযের মনোরঞ্জনের জন্যে আবেদন করেন যে, 'আমরা প্রতিদিন কূপের নিকট চলে আসবো, আপনি আমাদের দ্বারা কিছু লেখাবেন।' শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ. আগে থেকেই ইমাম হাকেম শহীদ রহ.-এর কিতাব 'আল কাফী'র ভাষ্যগ্রন্থ লিখতে চাচ্ছিলেন। সুতরাং তিনি ঐ কূপের মধ্য থেকে তাঁর বিশাল গ্রন্থ 'আল-মাবসুত' লেখাতে আরম্ভ করেন। ইলমের ইতিহাসের ব্যতিক্রমী এই রাজকর্ম অওযোজান্দের একটি কূপসদৃশ কয়েদখানার মধ্যে এভাবে অস্তিত্ব লাভ করে যে, বৃহদাকারের ত্রিশ ভলিউমের এ কিতাব কূপের মধ্য থেকে বলে বলে কূপের মুখে উপবিষ্ট শাগরিদদের দ্বারা লেখানো হয়েছে। কিতাবের ভূমিকায় শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ. নিজেই বলেন-

فرأيت الصواب فى تأليف شرح المختصر لاأزيد على المعنى المؤثر فى بيان كل مسئلة اكتفاء بما هو المعتمد فى كل باب و قدإنضم إلى ذلك سوال بعض الخواص من أصحابى زمن حبسى حين ساعدونى لأنسى أن أملى عليهم ذلك فأجبتهم إليه.

(المبسوط: ص:٥، ج:١)

'আমি 'মুখতাসার' (হাকেম)-এর একটি ভাষ্যগ্রন্থ লেখা সমীচীন মনে করছিলাম। তার মধ্যে প্রত্যেক মাসআলার বিষয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত উক্তির উপর (অন্য আর কোনো কথা) বৃদ্ধি করবো না। প্রত্যেক অধ্যায়ে কেবল নির্ভরযোগ্য বিধানই বর্ণনা করবো। উপরন্তু আমার সঙ্গীদের মধ্য থেকে বিশেষ কিছু লোক আমার বন্দিত্বের সময় আমার নিকট আবেদন করেন এবং আমার তৃপ্তির জন্যে আমাকে এভাবে সাহায্য করেন যে, আমি যেন তাদেরকে এ ভাষ্যগ্রন্থ লিখিয়ে দেই। সুতরাং আমি তাদের এ আবেদন মঞ্জুর করি।'

সুতরাং তার যেসব শাগরিদ ভাষ্যগ্রন্থ লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাদের এ কথা কিতাবের শুরুতে রয়েছে যে,-

قال الإمام الأجل الزاهد شمس الائمة أبوبكر محمد بن أبى سهل السرخسى رحمه الله و نور ضريحه و هو فى الحبس باوزجند إملاء.

'মহান ইমাম শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ. অওযোজান্দে বন্দী অবস্থায় বলেন।'

ইমাম সারখসী রহ.-এর প্রায় সকল জীবনীকার লিখেছেন যে, কূপের মধ্য থেকে তিনি যা কিছু লেখাতেন, তার সবই নিজের স্মরণশক্তি থেকে লেখাতেন। কোন কিতাবের সহযোগিতা তিনি পাননি। কূপের মধ্যে বন্দী থাকাবস্থায় বাহ্যত অন্যান্য কিতাব থেকে উপকৃত হওয়ার সম্ভাবনা যে ছিলো না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যারা মাবসূত কিতাব থেকে উপকৃত হয়েছেন, তারা এ কারামতটি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, এমন গবেষণামূলক কিতাব- যা পরবর্তী লোকদের জন্যে হানাফী ফিকহের নির্ভরযোগ্য উৎসে পরিণত হয়- কীভাবে পুরোটা স্বরণশক্তি থেকে লেখানো হয়েছে! এ বাস্তবতা সামনে থাকলে এ বর্ণনার বিশুদ্ধতা অনুমান করা সম্ভব, যা বিভিন্ন জীবনীকার উদ্ধৃত করেছেন- একবার তিনি পাঠদানরত ছিলেন। এমন সময় কেউ একজন বললো- ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তাঁর তিনশ' খাতা মুখস্থ ছিলো। তখন ইমাম সারখসী রহ. বলেন- হিফযুশ শাফেয়ী যাকাতু মাহফুযী- অর্থাৎ, আমার যা মুখস্থ আছে, তার যাকাত ইমাম শাফেয়ীর মুখস্থ ছিলো। (আল জাওয়াহিরুল মুযিয়াহ, কুরাশীকৃত, ৩/৮০) যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর তুলনায় আল্লামা সারাখাসী রহ.-এর প্রায় চল্লিশ গুণ বেশি

মুখস্থ ছিলো। তিনি যে অবস্থায় এবং যেখানে মাবসুত লিখিয়েছেন, সে দৃষ্টিকোণ থেকে এ কথাকে খুব অস্বাভাবিক মনে হয় না। একটি কূপ বা গর্তের মধ্যে বন্দী অবস্থায় এ মহান ব্যক্তিত্বের কতো কষ্ট হয়েছে, তা অনুমান করাও আমাদের জন্যে কঠিন। তিনি নিজেই মাবসুত সংকলনের মাঝে বিভিন্ন অধ্যায়ের শেষে অত্যন্ত বেদনাপূর্ণ ভাষায় নিজের করুণ অবস্থার কথা আলোচনা করেছেন। সুতরাং ইবাদত সংক্রান্ত মাসআলা চার ভলিউমে লেখানোর পর 'কিতাবুল মানাসিক' (হজ্জ) এর শেষে তিনি বলেন-

هذا آخر شرح العبادات بأوضح المعانى و أوجز العبارات أملأه المحبوس عن الجمع والجماعات، مصليا على سيد السادات، محمد المبعوث بالرسالات، وعلى أهله من المؤمنين والمؤمنات. تم كتاب المناسك ولله المنة وله الحمد الدائم الذى لايفنى أمده ولاينقضى عدده. (المبسوط، ج:٣، ص:٣٤٨)

'এটি সুস্পষ্ট বিষয় ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় ইবাদতের ব্যাখ্যার শেষ অংশ। যা এমন এক ব্যক্তি লিখিয়েছে, যে এমনভাবে বন্দী রয়েছে যে, না জুমায় উপস্থিত হতে পারে, না জামাতের সাথে নামায আদায় করতে পারে। (তবে) সাইয়্যিদুস সাদাত জনাব মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- যিনি আল্লাহ তাআলার পয়গাম নিয়ে প্রেরিত হয়েছিলেন- তাঁর উপর এবং যে সকল মুমিন পুরুষ ও নারী তাঁর আহলের অন্তর্ভুক্ত, তাঁদের উপর দরূদ প্রেরণ করে এ অংশ লিখিয়েছে। (এভাবে) আল্লাহ তাআলার দয়ায় কিতাবুল হজ্জ সমাপ্ত হলো। অসংখ্য ও অনন্ত প্রশংসা তাঁরই, যিনি অন্তহীন।'

এ বক্তব্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভাষায় অন্তরের সেই বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যে, বিরাট বিরাট চার ভলিউমে নামায ও অন্যান্য ইবাদতের বিধান এমতাবস্থায় লেখানো হয়েছে, যখন লেখক নিজে জামাতের সাথে নামায পড়া তো দূরের কথা জুমু'আর নামাযে অংশগ্রহণ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু কঠিন পরীক্ষায় আক্রান্ত অবস্থায় এ বিশাল খিদমত সম্পাদন করায় আল্লাহ তাআলা তাঁকে জুমু'আ ও জামাতের সওয়াব থেকেও না জানি কতো অধিক নেয়ামত দ্বারা ভূষিত করেছেন! আল্লাহ তাআলা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।

পঞ্চম ভলিউমে 'কিতাবুন নিকাহ'র শেষে বলেন-

هذا آخر شرح كتاب النكاح بالمأثور من المعانى والأخبار الصحاح أملأه المنتظر للفرج والفلاح مصليا على المبعوث بالحق بالسيوف والرماح وعلى آله وأصحابه أهل التقى والصلاح الذين مهدوا قواعد الحق وسلكوا طريق النجاح. (ج:٥، ص:٥١٢)

'বিবাহ সংক্রান্ত যেসব বিষয় সহীহ বর্ণনার উপর নির্ভরশীল এটি তার শেষাংশ, যা মুক্তি ও সফলতার জন্যে প্রতীক্ষারত এক ব্যক্তি এমতাবস্থায় লিখিয়েছে, যখন সে ঐ সত্তার উপর দরূদ প্রেরণ করছে, যাঁকে সত্য ধর্ম দিয়ে তীর-বর্শাসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং তাঁর আল ও আসহাবের উপর, যারা সলাহ ও তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। যারা সত্যের রাস্তা সমতল করেছেন এবং সফলতার পথে চলেছেন।'

সপ্তম ভলিউমে 'কিতাবুত তালাকে'র শেষে বলেন-

هذا آخر شرح كتاب الطلاق بالمؤثرة من المعانى الدقاق أملأه المحصور عن الإنطلاق المبتلى بوحشة الفراق مصليا على صاحب البراق و آله و أصحابه أهل الخير والسباق صلاة تتضاعف و تدوم إلى يوم التلاق كتبه العبد البرى من النفاق. (ج:٧، ص:١٠٧)

'এটি 'কিতাবুত তালাকে'র ব্যাখ্যার শেষ অংশ, যার মধ্যে সূক্ষ্ম বিষয়সমূহের মধ্যে থেকে প্রাধান্যযোগ্য মাসআলাসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এটা এমন এক ব্যক্তি লিখিয়েছে, যে এমনভাবে বন্দী রয়েছে যে, চলাফেরা করতেও অক্ষম। এবং (আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের) বিরহ যন্ত্রণায় আক্রান্ত। সে বোরাকের অধিকারী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আল ও আসহাবের উপর- যাঁরা কল্যাণকার্যে একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন- এমন দরূদ পাঠায়, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এটা এমন এক বান্দা লিখেছে, যে কপটতা থেকে সম্পর্কহীনতা প্রকাশ করছে।'

অতঃপর অষ্টম ভলিউমে 'কিতাবুল ওয়ালা'র শেষে বলেন-

إنتهى شرح كتاب الولاء بطريق الإملاء من الممتحن بأنواع البلاء يسأل من الله تعالى تبديل البلاء والجلاء بالعز والعلاء فإن ذلك عليه يسير وهو على ما يشاء قدير وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و أصحابه الطاهرين. (ج:٨، ص:٢٢٣)

'এখানে 'কিতাবুল ওয়ালা'র ব্যাখ্যা সমাপ্ত হলো। যা এমন এক ব্যক্তি লিখিয়েছে, যে কয়েক প্রকার বিপদে আক্রান্ত। আল্লাহ তাআলার কাছে সে দু'আ করছে যে, তিনি যেন এই পরীক্ষা ও নির্বাসনকে মর্যাদা ও সফলতার দ্বারা পরিবর্তিত করে দেন। কারণ, এটা তাঁর জন্যে খুবই সহজ। তিনি যা চান তা করতে সক্ষম। ওয়াসাল্লাল্লাহু আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ, ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহীত তাহীরীন।'

তারপর দ্বাদশতম ভলিউমে 'কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সিয়ারে'র শেষে বলেন-

إنتهى شرح السير الصغير المشتمل على معنى اثير بإملاء المتكلم بالحق المنير المحصور لأجله شبه الأسير المنتظر للفرج من العالم القدير السميع البصير المصلى على البشير الشفيع لأمته النذير، وعلى كل صاحب له و وزير، والله هو اللطيف الخبير. (ج:١٢، ص: ٣٥٤)

সিয়ারে 'সগীরে'র ব্যাখ্যা সমাপ্ত হলো, যা 'মানকুল' বিষয় সম্বলিত। এমন এক ব্যক্তি তা লিখিয়েছে, যে একটি স্পষ্ট সত্য কথা বলেছিলো। যে কারণে তাকে বন্দীর ন্যায় আটকে রাখা হয়েছে। সে আল্লাহ তাআলার নিকট- যিনি সববিষয় জানেন, সবকথা শোনেন, সবকিছু দেখেন- মুক্তির প্রতীক্ষায় আছে। জনাব নবীয়ে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রত্যেক সাহাবী ও সহযোগীর উপর দরূদ পাঠায়। যিনি তাঁর উম্মতের জন্যে সুসংবাদদাতা, তাদের জন্যে সুপারিশকারী এবং তাদেরকে সতর্ককারী। আল্লাহ তাআলা করুণাময়, সব বিষয়ে অবহিত।'

এমনিভাবে 'মাবসুতে'র কোন কোন কপির অষ্টাদশ ভলিউমে 'কিতাবুল ইকরারে'র শেষে একথাও রয়েছে যে-

إنتهى شرح كتاب الإقرار، المشتمل من المعانى ما هو سر الأسرار، أملاه المحبوس فى موضع الأشرار، مصليا على النبى المختار.

'কিতাবুল ইকরারে'র ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হলো। যা তত্ত্ব ও অন্তর্নিহিত বিষয় সম্বলিত। মহান নবীর উপর দরূদ পাঠিয়ে তা এমন ব্যক্তি লিখেছে, যে দুষ্ট লোকদের জায়গায় বন্দী রয়েছে।'

অধিকাংশ জীবনীকারের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তিনি 'মাবসুত' পুরোটাই বন্দী অবস্থায় লিখিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু পুরাতন জীবনীকারগণ পনেরো ভলিউমের কথা বলেছেন, আর বর্তমানের মুদ্রিত কপি ত্রিশ ভলিউমে ছেপে বেরিয়েছে, একারণে কেউ কেউ মনে করেছে যে, তিনি অর্ধেক কিতাব বন্দী অবস্থায় এবং বাকী অর্ধেক মুক্ত অবস্থায় লিখিয়েছেন। কিন্তু যাচাই করলে জানা যায় যে, কিতাবটি ত্রিশ ভলিউমে পরে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমে যে পাণ্ডুলিপি তৈরী করা হয়েছিলো, তা পনেরো ভলিউমেই করা হয়েছিলো এবং পুরো কিতাব বন্দী অবস্থায়ই লেখানো হয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। যার সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, ত্রিশতম ভলিউমের 'কিতাবুর রযা'এর শুরুতে এ ইবারত রয়েছে-

قال الإمام الأجل الزاهد شمس الائمة فخر الإسلام أبوبكر محمد بن أبى سهل السرخسى إملاء يوم الخميس الثانى عشر من جمادى الأخرى سنة سبع و سبعين و أربع مأة. (المبسوط، ج:٣٠، ص:٢٨٧)

যার দ্বারা এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ১২ জুমাদাল উখরা ৪৭৭ হিজরীতে 'কিতাবুর রযা' শুরু হয়েছিলো। অপরদিকে 'উসূলুস সারখসী'র ভূমিকা দ্বারা জানা যায় যে, ইমাম সারখসী ৪৭৯ হিজরীতে বন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং সে সময় তিনি 'উসূলুস সারখসী' সংকলন আরম্ভ করেন। (মূল ভাষ্য সামনে আসছে।) মাবসুতের 'কিতাবুর রযা' থেকে কিতাবের শেষ পর্যন্ত মোট ষোল পৃষ্ঠা জুমাদাল আখিরাহ ৪৭৭ হিজরী থেকে শাওয়াল ৪৭৮ হিজরী পর্যন্ত প্রায় সোয়া দুই বছরের ব্যবধান। বলা বাহুল্য যে, এই ষোল পৃষ্ঠা ৪৭৭ হিজরীতেই সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে পুরো কিতাব- যার মোট মুদ্রিত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৬৩৩৩ এই বন্দী অবস্থায় লিখিয়েছেন। তখন নিয়মতান্ত্রিকভাবে অন্যান্য কিতাবের শরনাপন্ন হতে পারেননি। কখনো নিতান্ত প্রয়োজনের সময় সাময়িকভাবে কোন কিতাবের শরনাপন্ন হয়ে থাকলে তা ভিন্ন কথা। কিতাবের বিষয়বস্তু সাধারণ ঘটনাবলীর সাদামাটা বিষয় ছিলো না, যার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করা ও কিতাব দেখার প্রয়োজন হবে না। বরং এটি ফিকহের অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয় সম্বলিত কিতাব। তারপর থেকে আলেম ও ফকীহগণ শত শত বছর ধরে এ কিতাব পড়ে আসছেন। কিন্তু কেউ এ কথা বলেননি যে, বন্দী অবস্থায় স্মরণশক্তির উপর ভিত্তি করে কিতাব লেখানোতে অমুক জায়গায় ভুল হয়েছে। এ কিতাবকে ফিকহে হানাফীর নির্ভরযোগ্য উৎসসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়। এটি এমন একটি বিষয়, যার কোন দৃষ্টান্ত অন্য কোন আইন গ্রন্থ এবং অন্য কোন লেখকের জীবনীতে পাওয়া যায় না।

শুধু এটাই নয়, ইমাম সারখসী রহ.-এর দ্বিতীয় বৃহৎ গ্রন্থ 'শরহুস সীয়ারুল কাবীর'। যা যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইসলামী আইন বিষয়ে নির্ভরযোগ্য উৎসের গুরুত্ব রাখে। এটি পাঁচ ভলিউমে মুদ্রিত। সম্ভবত সে সময়ে এ বিষয়ে এতো বিস্তারিত কিতাব আর কোনটি ছিলো না। জীবনীকারগণ লিখেছেন যে, এ কিতাবটিও তিনি বন্দী অবস্থাতেই লিখিয়েছেন। কিতাবটির বর্তমান কপিগুলোতে এমন কোন ইবারত আমি পাই নি, যার দ্বারা জানা যায় যে, এ কিতাবটিও তিনি বন্দী অবস্থায় লিখিয়েছেন। তবে হাজী খলীফা রহ. এ কিতাবের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, তার শেষে ইমাম সারখসী রহ. এ বাক্য লিখেছেন-

إنتهى إملاء العبد الفقير المبتلى بالهجرة الحصير المحبوس من جهة السلطان الخطير بإغراء كل زنديق حقير وكان الإفتتاح بأوزجند فى آخر أيام المحنة،

والتمام عند ذهاب الظلام بمرغينان فى جمادى الأولى سنة ثمانين و أربعمأة.

(كشف الظنون:١٠١٣:٢)

'এ কিতাবটি লেখানোর ধারা ঐ মুখাপেক্ষী বান্দার পক্ষ থেকে সম্পন্ন হলো, যে একজন তুচ্ছ যিন্দিকের কথায় ভয়ঙ্কর বাদশাহর পক্ষ থেকে নির্বাসন ও বন্দিত্বে আক্রান্ত ছিলো। এ (কিতাবের) সূচনা অওযোজান্দে পরীক্ষাকালের শেষ সময়ে হয়েছিলো। জুমাদাল উলা ৪৮০ হিজরীতে মারগিনানে সে সময় এটি সম্পন্ন হয়, যখন ঘনঘটা কেটে গেছে।'

মনে হয় যে, হাজী খলীফার কপিতে এ বাক্যটি বিদ্যমান ছিলো। যা পরবর্তী কপিগুলো থেকে বাদ পড়েছে। তবে বাক্যের ভঙ্গি ঐ সব বাক্যের সঙ্গে সুস্পষ্ট সম্পর্ক রাখে, যেগুলো 'মাবসুতে'র কয়েক অধ্যায় থেকে উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

উসুলে ফিকহ বিষয়ে ইমাম সারখসী রহ.-এর আরেকটি কিতাব রয়েছে। যা 'আল মুহাররার ফী উসুলিল ফিকহ' বা 'উসূলুস সারখসী' নামে প্রসিদ্ধ। জীবনীকারগণ বলেন যে, এ কিতাবের শুরুতে এই ইবারত এখনো বিদ্যমান রয়েছে-

قال الإمام الأجل الزاهد شمس الائمة أبوبكر محمد بن أبى سهل السرخسى إملاء فى يوم السبت سلخ شوال سنة تسع و سبعين و أربعمأة فى زاوية من حصار أوزجند. (أصول السرخسى، طبع بيروت، ص:٤)

এ ইবারত দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এ কিতাবটিও ইমাম সারখসী রহ. অওযোজান্দের বন্দীশালায় শাওয়াল ৪৭৯ হিজরীতে লেখানো আরম্ভ করেন।

এসব তথ্যকে মিলালে একথা পরিষ্কার হয় যে, 'মাবসুত' পুরোটাই বন্দী অবস্থায় লিখিয়েছেন এবং বাহ্যত ৪৭৭ হিজরীতে তা সম্পন্ন হয়েছে। তারপরও দুই বছরের কিছু অধিক সময় ইমাম সারখসী রহ. বন্দী অবস্থায় থাকেন। সে অবস্থায় আরও দু'টি কিতাব সংকলন আরম্ভ করেন। একটি 'শরহুস সীয়ারিল কাবীর' ও অপরটি 'উসূলুস সারখসী'। মনে হয় যে, উভয় কিতাবের সংকলন এক সঙ্গে চলছিলো। তারপর 'কাশফুয যুনুনে'র গ্রন্থাকার লিখেছেন যে, 'উসূলুস সারখসী'র 'বাবুশ শুরুত' পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করেন। (কাশফুয যুনুন, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৮) এ ভাবে উভয় কিতাবের বাকী অংশ মারগিনানে গিয়ে সম্পন্ন করেন। যেমনটি 'শরহুস সিয়ারিল কাবীরে'র শেষ বাক্য দ্বারা জানা যায়। যা হাজী খলীফা রহ.-এর উদ্ধৃতিতে পিছনে চলে গেছে। 'উসূলুস সারখসী'তে 'বাবুশ শুরুত' নামে কোন অধ্যায় নেই, তবে 'ফসলুশ শরতি' নামে

একটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। হাজী খলীফার উদ্দেশ্যে সম্ভবত এটিই। কিন্তু কেউ কেউ এর দ্বারা 'মাবসুতে'র 'কিতাবুশ শুরুত' মনে করে বলেছে যে, এ পর্যন্ত পৌঁছে তিনি মুক্তি লাভ করেন। বাহ্যত এ কথা ঠিক নয়। কারণ, 'কিতাবুর রযা'- যার শুরুর ইবারত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে- তা রয়েছে 'কিতাবুশ শুরুতে'র অনেক পরে। এবং 'কিতাবুর রযা'র সূচনা নিশ্চয়ই বন্দী অবস্থায় হয়েছিলো। যেমন উপরে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

শিশুকালে যখন আমার ওয়ালেদ মাজেদের কাছ থেকে 'মাবসুত' সংকলনের ঘটনা শুনেছিলাম, তখন থেকেই শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ.-এর শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কিন্তু আজ আমি তাঁর সেই শহরে দাঁড়িয়ে আছি, যেখানে তিনি এ বিস্ময়কর কীর্তি সম্পাদন করেছিলেন। যাকে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীনের মোজেযা-ই বলা চলে। বর্তমানে ঐ গর্ত বা কূপের কোন নাম-নিশানা নেই, যেখানে তিনি বহু বছর যাবৎ অত্যন্ত ধৈর্যসংকুল সময় কাটিয়েছেন এবং ঐ শাসক সম্পর্কেও কেউ অবগত নয়, যে অহঙ্কার ও হঠকারিতার আতিশয্যে এমন মহান ব্যক্তিকে এমন বর্বরতার সঙ্গে বন্দী করেছিলো। কিন্তু সারখসী রহ.-এর নাম জীবন্ত ও অমর রয়েছে। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত তাঁকে ভক্তিমাল্য পেশ করা হতে থাকবে। মানুষ তাঁর জন্যে রহমতের দোয়া করতে থাকবে।

رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ جَزَاهُ عَنِ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ

অওযোজান্দ শহরে আমি মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় পাই। কিন্তু কল্পনার চোখ এখানে জ্ঞান-গরিমা ও মহান কীর্তির সে সব পাহাড় দেখতে পাচ্ছিলো, যাঁদের খেদমত দ্বারা আজ পুরো জ্ঞানজগত পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

শামসুল আইম্মাহ সারখসী রহ.-এর কবরে সালাম পেশ করে ঈসালে সওয়াব করার পর মোখতার সাহেবের বন্ধু আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। সেখানে কিছু সময় প্রশ্নোত্তরের বৈঠক চলে। অতঃপর এখানকার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে আমার সংক্ষিপ্ত বয়ানও হয়। যেখানে অনেকক্ষণ ধরে মানুষ অপেক্ষায় বসেছিলেন। মোখতার সাহেব কিরগীজ ভাষায় বয়ানের অনুবাদ করেন। একটা পঁচিশ মিনিটে আমারা মসজিদ থেকে বের হই। আওশ থেকে আমাদেরকে যে বিমানে আরোহণ করতে হবে তার যাত্রার সময় ছিলো দুইটা দশ মিনিটে। আমাদেরকে এখান থেকে পয়ঁতাল্লিশ কিলোমিটার পথ সফর করে আওশ বিমানবন্দরে পৌঁছতে হবে। গাড়িচালক অত্যন্ত দক্ষতার সাথে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। আওশ শহরে অধিক যানজট হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। এ কারণে তিনি একটি দীর্ঘপথে চলতে আরম্ভ করেন। যার ফলে দূরত্ব আরও বেড়ে যায়। কিন্তু যখন আমরা বিমানবন্দরে প্রবেশ করি, তখন দুইটা বাজছিলো। ভি. আই.

—১৬

পি. লাউঞ্জের কর্মচারী আমাদের বোর্ডিং পাশ নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আমাদেরকে সোজা বিমানে নিয়ে যান। তিনটার সময় যখন আমরা বিশকেক বিমানবন্দরে অবতরণ করি, তখন সাত ঘণ্টায় প্রায় তেরোশ' কিলোমিটারের এই ঝটিকা সফরকে একটি স্বপ্ন মনে হচ্ছিলো।

বিশকেকে একজন পাকিস্তানী ব্যবসায়ী জনাব সিদ্দীক সাহেবের একটি পাকিস্তানী রেষ্টুরেন্ট রয়েছে। তিনি সমর সাহেবের বাড়িতে পাকিস্তানী খাবার নিয়ে এসেছিলেন। তার স্বাদ আমরা উপভোগ করি এবং সেখানে সমবেত বন্ধুদের সঙ্গেও মোলাকাত হয়। সন্ধ্যা সাতটায় ইসলামাবাদের বিমান ছিলো। আমার সফরসঙ্গী জাভেদ হাজারবী সাহেব মেহেরবানী করে সামানাপত্র নিয়ে আগেই চলে যান। ফলে আমি সমর সাহেবের বাড়িতে বিশ্রামের সুযোগ পাই। মাগরিবের সময় যখন আমি বিমানবন্দরে পৌঁছি, ততক্ষণে সেখানকার সমস্ত ধাপ অতিক্রম হয়ে গিয়েছিলো। সাতটার সময় আমরা বিমানে আরোহণ করে আড়াই ঘণ্টায় ইসলামাবাদ পৌঁছি। রাত এগারোটায় সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে আল্লাহর মেহেরবানীতে রাত একটায় নিরাপদে করাচী পৌঁছি।

এ সফরে যে সব কাজের কথা চিন্তা করেছিলাম, অসুস্থতার কারণে সেসব কাজ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারপরও আল্লাহ তাআলার অশেষ অনুগ্রহে সপ্তাহব্যাপী এ সফর অনেক দিক থেকেই আমার জন্যে অত্যন্ত কল্যাণকর হয়।

হিন্দুস্তান সফর

(রজব ও শাবান, ১৪৩১ হিজরী, জুলাই, ২০১০ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

হিন্দুস্তানের সাথে আমার আবেগঘন সম্পর্কের অনেকগুলো কারণ রয়েছে। তারই ভূখন্ড 'দেওবন্দ' আমার জন্মস্থান ও পিতৃভূমি এবং ইলম ও হেদায়েতের মারকায। এরই মোজাফ্ফরনগর জেলায় থানভবন ও জালালাবাদ অবস্থিত। যা আমার রূহানী মাশায়েখের অবস্থানকেন্দ্র। এই হিন্দুস্তানেরই বিভিন্ন ভূখন্ডে আমাদের ইতিহাসের সে সমস্ত উজ্জ্বল কীর্তি সৃষ্টি হয়েছে, যা জ্ঞান–গরিমা, বুযুর্গী ও পরহেযগারী থেকে আরম্ভ করে ত্যাগ ও সাধনা এবং বীরত্ব ও আত্ম বিসর্জনের সব ময়দানে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে। তাছাড়া এ ভূখন্ডেই পনেরো কোটি মুসলমান রয়েছেন, যারা নিজেদের ধর্মীয় স্বকীয়তা অক্ষত রাখার জন্যে প্রসংশাযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিগত কয়েক বছরে আমার প্রায় সবগুলো কিতাব হিন্দুস্তানে মুদ্রিত হয়ে সারাদেশে প্রসার লাভ করেছে। এগুলোর কারণে সেসব মুসলমানের পক্ষ থেকে অসংখ্য ভালোবাসাপূর্ণ চিঠি আমার কাছে আসতে থাকে। সেগুলোতে পাগলপারা ভালোবাসার প্রকাশ হতে থাকে। যদিও আমি তার যোগ্য নই। কিন্তু এর দ্বারা এটা অবশ্যই বোঝা যায় যে, তাদের পক্ষ থেকে এ ভালোবাসায় কোন খাদ নেই। এ সময়ে কতো দিক থেকে যে, আমি হিন্দুস্তানে আসার দাওয়াত পেয়েছি তার হিসেব নেই। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি সেখানে যেতে পারিনি। দু–একবার তারিখও নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত এমন কিছু কারণ সামনে চলে আসে যে, প্রত্যেকবার সফর স্থগিত করতে হয়। কিন্তু আল্লাহ

তাআলার নিকট প্রত্যেক কাজের একটি সময় নির্ধারিত থাকে। মাদ্রাজের বড়ো একজন ব্যবসায়ী জনাব ফারুক আহমাদ সাহেব- যিনি মাশাআল্লাহ, আলেমদের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক রাখেন– মাদ্রাজ যওয়ার জন্যে আমার সঙ্গে কয়েক বছর ধরে অবিরাম যোগাযোগ করে চলেছেন। এ বছর পবিত্র রমাযান মাসে তিনি মক্কা মুকাররমায় একদল বন্ধুসহ আমার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তিনি এমন পাগলপারা আঙ্গিকে আমাকে পুনরায় দাওয়াত দেন এবং একই সঙ্গে ভিসা ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা করার নিশ্চয়তাও দেন যে, আমি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করে ওয়াদা করি যে, ইনশাআল্লাহ এ বছর কোন এক সময় হিন্দুস্তান যাওয়ার প্রোগ্রাম করবো। ফারুক সাহেব ভিসার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে ভিসা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করার পর এবার রজব মাসে এই স্মরণীয় সফর বাস্তবে রূপ নেয়।

৪ঠা জুলাই (২২ শে রজব ১৪৩১ হিজরী) বুখারী শরীফের শেষ দর্স হয়। আমি তার পরেরদিনই পি. আই. এ. যোগে মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার স্ত্রী ও আমার ছোট ছেলে মৌলবী হাসসান আশরাফ (সাল্লামাহু)-ও আমার সঙ্গে যাচ্ছিলেন। মেযবানদেরকেও তা জানিয়ে দেয়া হয়। তারা স্বাগত জানানোর জন্যে মুম্বাই এসেছিলেন। নির্ধারিত সময়ে আমরা বিমানবন্দরে পৌঁছি। তখন ভিসা সংক্রান্ত এমন এক আইনী জটিলতা শুরু হয় যে, সেদিন আমাদেরকে বিমানবন্দর থেকে ফিরে আসতে হয়। আমাদের মেযবান- যিনি মাদ্রাজ থেকে মুম্বাই এসেছিলেন- তিনি ভীষণভাবে হোঁচট খান। পরের দু'দিন করাচী থেকে মুম্বাইয়ের কোন বিমান ছিলো না। তাই তিনি ফোন করে বলেন যে, আমরা আগামী দিন কাগজপত্র ঠিক করে আমিরাত এয়ারলাইনসে দুবাইয়ের পথে মুম্বাই বুকিং করাবো। সুতরাং আমরা তাই করি। অল্প সময়ের মধ্যে ডাভেলের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা আহমাদ খানপুরী সাহেবের ফোন আসে। তিনি বলেন– আমার আসার সংবাদ শুনে তিনি ডাভেল থেকে মুম্বাই এসেছিলেন। এমনিভাবে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নোমানী রহ.-এর ছেলে এবং মাসিক আল ফুরকানের সম্পাদক জনাব মাওলানা খলীলুর রহমান সাজ্জাদ (হাফিযাহুল্লাহু তাআলা)-এর ফোন আসে যে, তিনিও আমার আসার সংবাদ শুনে লক্ষ্মৌ থেকে মুম্বাই এসেছিলেন। আমি তাদের কষ্টের কারণ হলাম বলে অত্যন্ত ব্যথিত হই। কিন্তু বাস্তবে হয় দুতাবাসের পক্ষ থেকে, না হয় আমাদের ট্রাভেল এজেন্টের পক্ষ থেকে এ ত্রুটি হয়েছিলো যে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ভিসার সঙ্গে আমাদের কাছে আসেনি। নিশ্চয়ই ঐদিন আমাদের সফর না হওয়ার মধ্যেই কোন কল্যাণ নিহিত ছিলো।

মুম্বাইতে

আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে পরেরদিন কাগজপত্র প্রস্তুত হয়। আমরা আমিরাত এয়ারলাইন্সে দুবাইয়ের পথে সফর করি। যে সফর খুব জোর পৌনে দুই ঘণ্টার ছিলো, তা এভাবে প্রায় দশ ঘণ্টা লেগে যায়। আমরা ৬ই জুলাই রাত সাড়ে আটটায় মুম্বাই বিমানবন্দরে অবতরণ করি। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে যে পর্যায়ের সর্ম্পক বিরাজ করছে, সে কারণে ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য ধাপ অন্য দেশের তুলনায় অত্যাধিক জটিল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। কিন্তু বিমান থেকে বের হতেই বিমানবন্দরের কয়েকজন অফিসার আমাদেরকে স্বাগত জানান। জনাব মাওলানা সাজ্জাদ সাহেব, জনাব ফারুক সাহেব এবং তাদের কিছু সাথীও ভিতরে এসেছিলেন। গোলাম রসুল নামের এক যুবক তড়িৎ ও নিপুনভাবে এসব ধাপ অতিক্রম করান এবং বিমানবন্দরের ভিতরে স্বাগত জানানোর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এ ব্যক্তি শুধু আমার নয়, ফারুক সাহেবেরও অপরিচিত ছিলেন। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে পরিচয় হয়। মোটকথা, এভাবে বিমানবন্দরের জটিল সকল ধাপ বসে বসেই অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু বের হতে এগারোটা বেজে যায়। আমাদের মেযবানগণ বলেন যে, মাওলানা বদরুদ্দীন আজমল সাহেব- যিনি একজন সংসদ সদস্য এবং মক্কা শরীফে দাওয়াত দেওয়ার সময় সঙ্গে ছিলেন- মুম্বাইয়ে একদিনের অবস্থান তার বাড়িতে হবে। সুতরাং প্রথমদিকে এরূপ ইচ্ছাই ছিলো। কিন্তু হঠাৎ তিনি অসুস্থ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ কারণে মাওলানা সাজ্জাদ সাহেব মুম্বাইয়ের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও নেককার ব্যবসায়ী জনাব আসিফ সাহেবের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেন। সুতরাং রাতে আমরা তার বাড়িতেই অবস্থান করি। সেখানে অনেক দোস্ত-আহবাবের সাথেও মোলাকাত হয়। পরবর্তীতে আসিফ সাহেব আমাদের সঙ্গেই থাকেন এবং সফরসঙ্গীর হক আদায় করেন।

মুম্বাইয়ে বয়ান বা অন্য কিছুর প্রোগ্রাম ছিলো না। পরেরদিন সন্ধ্যা সাতটায় আমাদেরকে মাদ্রাজের উদ্দেশ্য রওয়ানা হতে হবে। এ কারণে মেযবানগণ খুব কম মানুষকেই আমার আসার বিষয়ে অবহিত করেন। কিন্তু সকাল থেকে সাক্ষাতপ্রার্থীদের ধারা অব্যাহত ছিলো। তারপর আসিফ সাহেব আমাদেরকে গাড়িতে করে মুম্বাইয়ের কতক দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যান। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সেই সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত পুল, যা মুম্বাইয়ের দুই অংশকে সংযুক্ত করার জন্যে সমুদ্রের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। একে সী–লিঙ্ক (Sea Link) বলা হয়। মুম্বাইয়ের একজন বিখ্যাত মুসলমান ব্যাবসায়ী জনাব শিহাব উদ্দীন সাহেব মরহুম 'শালিমার হোটেল' নামে একটি রেষ্টুরেন্ট বানিয়েছেন। এক দুর্ঘটায় তিনি

শহীদ হওয়ার পর এখন তার স্ত্রী ও ছেলে উমায়ের তা চালাচ্ছেন। সেখানে তারা আমাদের দুপুরের খাবার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেন। আমরা দুপুরে সেখানে পৌঁছি। তারা অত্যন্ত মহব্বতের সাথে অত্যাধিক সুস্বাদু খাবার খাওয়ান। কিন্তু কীভাবে যেন আমাদের হোটেলে অবস্থান করার খবর ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং হোটেলে অত্যাধিক ভীড় হয়ে যায়। মুম্বাইয়ের মুসলমানগণ ছাড়া বেশিরভাগ লোক গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সফর করে এসেছিলেন। তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর কিছু সময় বিশ্রাম করি।

মুম্বাইয়ের সবচেয়ে বড়ো জামে মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা শওকত সাহেব (মু.যি.) বর্তমানে মুম্বাইয়ের সবচেয়ে বর্ষীয়ান বুযুর্গ ব্যক্তি। তাঁর উপর সেখানকার সমস্ত মুসলমান আস্থা পোষণ করে থাকেন। এখন তিনি চলাফেরা করতেও অক্ষম। আমার ইচ্ছা ছিলো আছরের নামায তার মসজিদে পড়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবো। কিন্তু ভীড়ের কারণে আমাদের বের হতে বিলম্ব হয়। ফলে হোটেলেই জামাত করতে হয়। নামাযের পর সাথে সাথে জানতে পারি যে, আমাদের আসার সংবাদ শুনে হযরত মাওলানা নিজেই হোটেলের নিচ তলায় এসেছেন। আমি নিচ তলায় নেমে দেখি তিনি একটি চেয়ারে উপবিষ্ট রয়েছেন। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই যে, আমার কারণে তিনি চলাফেরা করতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও এতো কষ্ট করে তাশরীফ এনেছেন। আমার আবেদনে তিনি অনেক দোয়া করেন এবং উৎসাহ প্রদান করেন। ফেরার পথে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে আমি যখন তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি, তখন বুঝতে পারি যে, দু'দিক থেকে ধরে রাখা সত্ত্বেও তিনি চার কদম চলার পর পড়ে যাচ্ছিলেন। অতিরিক্ত জটিলতা এই হয় যে, আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতকারীদের ভীড় এতো অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় যে, সামনে অগ্রসর হওয়ার বা মাওলানাকে চেয়ারে বসিয়ে নিয়ে যাওয়ার জায়গা ছিলো না। এভাবে দশ-বারো গজের দূরত্ব কয়েক ধাপে তিনি অতিক্রম করেন। তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে যখন আমি ফিরে আসার ইচ্ছা করি, তখন ভীড়ের প্রচন্ডতার কারণে পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। এ কারণে আসিফ সাহেব আমাকে ফিরিয়ে আনার পরিবর্তে হযরতের গাড়িতেই বসিয়ে দেন এবং একটি লম্বা চক্কর কেটে হোটেলের অপর দিক থেকে ভিতরে প্রবেশ করান। এ দিকে আমার বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছিলো। তাই এদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথকভাবে শুধু মোসাফাহা করাও সম্ভব ছিলো না। সুতরাং সম্মিলিত দোয়া করে আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

বিমান বিলম্বিত হয়। বিমানবন্দরে অনেকক্ষণ দেরী করতে হয়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ওড়ার পর আমরা মাদ্রাজের বিমানবন্দরে অবতরণ করি। এখানেও

অনেক মানুষ স্বাগত জানানোর জন্যে উপস্থিত ছিলেন। ফারুক সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করি। তারপর আবিরাম ব্যস্ততার এক ধারা আরম্ভ হয়ে যায়।

মাদ্রাজে

মাদ্রাজ তামিলনাড়ু প্রদেশের প্রধান শহর। বর্তমানে তার নতুন নাম দেওয়া হয়েছে চেন্নাই। এখানে বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী হওয়ার কারণে শহরটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রও। এখানকার ব্যবসা-বানিজ্যে মুসলমানদেরও বিরাট অংশ রয়েছে। বিশেষ করে চামড়া শিল্পের ব্যবসা বেশির ভাগ মুসলমানদের হাতেই রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! এরা ব্যবসার সাথে সাথে মুসলমানদের সামাজিক কাজে মন খুলে অংশগ্রহণ করে থাকেন। এসব প্রচেষ্টার মধ্যে 'হজ্জ হাউজ' নামে একটি বিশাল-বিস্তৃত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে সারা প্রদেশের হাজী সাহেবান হজ্বে যাওয়ার জন্যে সমবেত হন। তাদের থাকারও সুব্যবস্থা রয়েছে। তাদের সফরের সমস্ত কার্যক্রম এক জায়গাতেই সম্পন্ন হয়। জাহাজের বোর্ডিং কার্ডসহ সমস্ত কাগজপত্র তারা এখানেই পেয়ে থাকেন। তারা এখান থেকে সোজা বিমানে উঠে যান।

৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার 'হজ্জ হাউজে' স্থানীয় ওলামায় কেরামের একটি সমাবেশ রাখা হয়েছিলো। এখানে মাদ্রাজেরই শুধু নয়, বরং সারা প্রদেশের এমনকি প্রদেশের বাইরেরও ওলামায়ে কেরাম, মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও মুফতী সাহেবগণের বড়ো একটি জামাত অংশ গ্রহণ করেন। তাঁদের খেদমতে কিছু কথা পেশ করার সুযোগ হয়। যার বেশিরভাগ আমাদের বড়োদের থেকে শোনা কথারই পুনরাবৃত্তি ছিলো।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও ব্যবসায়ীদেরকে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করতে হয়। অন্যান্য জায়গার মতো এখানকার ওলামায়ে কেরাম ও ব্যবসায়ীরাও এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার চেষ্টা করছেন– যার মাধ্যমে তারা এসব লেনদেন সুদের মিশ্রণ ছাড়া সম্পাদন করতে পারবেন। এ প্রচেষ্টার জন্যে এখানকার কতিপয় ব্যক্তি পৃথক একটি দলও গঠন করেছেন। কেরালা প্রদেশে এর বাস্তব ভিত্তিক সূচনাও করা হয়েছে। কিন্তু সরকারী লোকদের মাথায় প্রশ্ন রয়েছে যে, ধর্ম ভিত্তিক কোন ইসলামী অর্থ-প্রতিষ্ঠান আবার তাদের ধর্ম নিরপেক্ষতার পরিপন্থী হবে না তো? আদালতের একটি রায়ের কারণে এ প্রশ্ন আরোও জোরদার হয়। এ বিষয়ে একটি ব্যাপক চেতনা সৃষ্টির জন্যে ওলামায়ে কেরাম ও ব্যবসায়ীরা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় একটি সমাবেশের আয়োজন করেন। তাতে প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদেরকে দাওয়াত করা হয়। আমার মেযবান জনাব ফারুক সাহেব ছাড়া মুফতী শাকিল সাহেব, মুফতী খলীলুর রহমান সাহেব,

মুফতী জাফর আহমাদ সাহেব, মাওলানা ইকবাল কাসেমী সাহেব ও জনাব হাজী মুহাম্মাদ হাসেম সাহেব- যিনি তামিলনাড়ুর একজন বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব এবং শুধু এ প্রদেশেই নয়, বরং সারা দেশেই তিনি অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান করেছেন- এ সমাবেশের আয়োজনে অগ্রগামী ছিলেন।

মাদ্রাজে পাচঁতারা হোটেল অনেক। এমনি একটি রেসিডেন্সী হোটেলের হলকক্ষে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অধিবেশনের শুরুতেই আমার কাছে আবেদন করা হয় যে, আমি যেন ইসলামের অর্থনৈতিক মূলনীতির উপর আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তুলে ধরি যে, এ মূলনীতি শুধু মুসলমানরদের জন্যেই নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির অর্থনৈতিক সাফল্যের চাবিকাঠি। একটি অমুসলিম বা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ নিজেদের উপর ধর্মের ছাপ লাগানো ছাড়াই নিখাদ অর্থনৈতিক স্বার্থে এ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারে। এ বিষয়ে মঞ্চ থেকে এ দাবিও জানানো হয় যে, এ বছরের শুরুতে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম (World Economic Forum) তাদের বার্ষিক সম্মেলনে বর্তমানের অর্থনৈতিক ধসের সমাধানকল্পে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সমস্ত প্রস্তাব চেয়েছিলো এবং তার উত্তরে আমি যে প্রবন্ধ পেশ করেছিলাম তার সারাংশও যেন তুলে ধরি। উপস্থিত লোকদের মধ্যে যেহেতু অনেক অমুসলিমও ছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে উর্দূ বুঝতে সক্ষম ছিলেন না, এ কারণে ইংরেজীতে বক্তব্য দেওয়ার জন্যে আবেদন করা হয়।

এসব আবেদন পুরো করে আল্লাহ তাআলার দেয়া তাওফীকে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় বক্তব্য দেই। যার মধ্যে আল্লাহ তাআলাই নতুন আঙ্গিকে ইসলামী ব্যবসা-বানিজ্যের নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকের উপর আলোকপাত করার বিষয়বস্তু অন্তরে ঢেলে দেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে উপস্থিত লোকদের মধ্যে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে দেখা যায়। পুরো বক্তব্যটি রেকর্ড করা হয় এবং সিডি আকারে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়।

পরেরদিন ছিলো জুমাবার। মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে- যাকে 'বড়ি মেট মসজিদ' বলা হয়– জুমার বয়ান করি এবং নামায পড়ানোরও সৌভাগ্য লাভ হয়।

দেওবন্দের স্মরণীয় সফর

দেওবন্দে যাওয়াই ছিলো আমার হিন্দুস্তানের এ সফরের সর্বাধিক আর্কষণীয় বিষয়। কিন্তু শুরুর দিকে যে তিন জায়গার ভিসা পেয়েছিলাম তার মধ্যে দেওবন্দ ছিলো না। এ কারণে আমার মেযবানগণ দেওবন্দকে বাদ দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরী করেন। পরবর্তীতে আমার পীড়াপীড়িতে দেওবন্দের ভিসার জন্যে চেষ্টা করা হয়। অবশেষে তা পাওয়া যায়। কিন্তু এখন চূড়ান্ত প্রোগ্রামের মধ্যে

রদবদল করে মাঝখানে দেওবন্দের জন্যে অতিকষ্টে জুমা থেকে সোমবার পর্যন্ত তিনটি দিন বের করা সম্ভব হয়। তার মধ্যেও দেড় দিন মাদ্রাজ থেকে দেওবন্দ পৌঁছতে পার হয়ে যাবে। তারপরও একেবারেই না যাওয়ার তুলনায় এটাকেই গনীমত মনে না করে উপায় ছিলো না। সময় যদিও সংক্ষিপ্ত ছিলো, তারপরও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাত করা ছাড়া দারুল উলূম দেওবন্দের উভয় প্রতিষ্ঠানে স্বভাবিকভাবেই আমার যাওয়ার নিয়ত ছিলো। এই ইলমী ও রূহানী মারকাযের বরকত হাসিল করা এবং সেখানকার আকাবিরের যিয়ারতের মধ্যে আমার উদ্দেশ্য ছিলো সীমাবদ্ধ। কিন্তু মাদ্রাজে অবস্থানকালে হযরত মাওলানা সালেম কাসেমী সাহেব (মু.যি.) এর পক্ষ থেকে দারুল উলূম (ওয়াকফে) ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বয়ান করার পয়গাম পাই। তিনি তখন বাইরের কোন দেশে সফরে ছিলেন। আমার চাচাতো ভাই হযরত মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেব (মু.যি.) এই দারুল উলূমেরই যোগ্য ও সমাদৃত উস্তায। তার উপর সহীহ বুখারীর বিরাট অংশ পাঠদানের দায়িত্ব রয়েছে। তিনি ফোন করে জানান যে, এখানকার ছাত্ররা হাদীসের ইজাযত নিতে চায়। তারপর দারুল উলূম দেওবন্দ (কাদীম) এর মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান সাহেব (মু.যি.)-এর এ পত্র আমি মাদ্রাজে পাই-

বিসমিহী তাআলা

মুকাররামী ওয়া মুহতারামী হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী সাহেব, যীদা মাজদুকুম, করাচী (পাকিস্তান)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আশা করি ভালো আছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাদ্রাজের জনাব মালিক মুহাম্মাদ ইবরাহীম সাহেবের মাধ্যমে জানতে পেরে অত্যন্ত খুশি হই যে, আপনি অতি সত্বর হিন্দুস্তানে তাশরীফ আনছেন। আল্লাহ করুন এ সফর কল্যাণ ও নিরাপত্তার সাথে সম্পন্ন হোক। আমীন।

এ পর্যায়ে আমরা যারা দারুল উলূমের খাদেম আছি, আমাদের বাসনা এই যে, জনাব দারুল উলূম দেওবন্দকেও নিজের প্রোগ্রামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবেন। দেওবন্দের সঙ্গে আপনার যেমন পারিবারিক সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি দারুল উলূম দেওবন্দের সঙ্গেও রয়েছে বিরাট ও গভীর সম্মন্ধ। আপনার আগমনে অবশ্যই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (কু.সি.)-এর স্মরণ তাজা হয়ে উঠবে। দারুল উলূমের খাদেমগণ এবং আসতেযায়ে কেরামও আপনার সাক্ষাত লাভে আনন্দিত হতে পারবে। দারুল উলূমের ছাত্ররাও এ

সুযোগে আপনাকে দেখার ও আপনার নসীহত শোনার জন্য আগ্রহী। তাদের সে তৃষ্ণাও নিবারিত হবে।

আমাদের শুধু আশাই নয়, বরং পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে যে, জনাব দারুল উলূমের খাদেমদের এ দাওয়াত গ্রহণ করে ভূষিত করবেন এবং দেওবন্দের প্রোগ্রামকে এভাবে বাস্তবে রূপ দেবেন যে, এক বেলা উপস্থিত যা কিছু থাকে আমাদের সঙ্গে আহার করবেন। প্রিয় ছাত্রদের উদ্দেশ্যেও মেহেরবানী করে বয়ান করবেন। আশা করি আমাদের এ বাসনা পুরো করে বাধিত করবেন। ওয়াস সালাম।

(মাওলানা) মারগুবুর রহমান
মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ
২৩/০৭/১৪৩১ হিজরী, ৬/০৭/২০১০ ঈসায়ী

আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত ছাড়া দারুল উলূমের যিয়ারতই ছিলো দেওবন্দ সফরের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ পয়গাম পেয়ে আরো উৎসাহিত হই। জুমার দিন সন্ধ্যা সাতটার বিমানে দিল্লী যাওয়ার প্রোগ্রাম চূড়ান্ত হয়। কিন্তু কিছু আইনী ধাপ পুরো করতে বিলম্ব হয়। ফলে বিমান হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে সাড়ে আটটার বিমানে বুকিং দেয়া হয়। মাদ্রাজে আমার প্রিয় দোস্ত জনাব হাজী হাসান সাহেব এ পুরো সফরে সাথে থাকেন। আমার আরামের ব্যবস্থা করতে তিনি কোনরূপ ত্রুটি করেননি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন।

জনাব হাজী মুহাম্মাদ হাশেম সাহেব– যাঁর আলোচনা উপরে করেছি- তাঁর ছেলে মাওলানা ইবরাহীম সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। তিনি আমাদের একদিন আগেই দিল্লী গিয়েছিলেন। যাতে সেখানকার ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। তার মাধ্যমে আমি হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান (মু.যি.)-এর নিকট পয়াগাম পাঠাই যে, দারুল উলূমে হাজির হওয়া তো আমার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ইনশাআল্লাহ, এ সৌভাগ্য আমি অবশ্যই অর্জন করবো। তবে খানার বিষয়ে আমার আবেদন এই যে, আমার আত্মীয়–স্বজনের সাথে সাক্ষাত করার সময় খুব কম হবে। তাদের বাড়ীতে নিকট খানা খাওয়া তাদের হক বলে মনে হচ্ছে। যাতে করে কমপক্ষে খানা খাওয়ার সময় তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায়। আলহামদুলিল্লাহ ! হযরত আমার এ আবেদন কবুল করেন।

ইবরাহীম সাহেবের পিতা জনাব হাশেম সাহেবের দিল্লীতে একটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে তিনি আমাদের রাতে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কিন্তু আমার মামাত ভাই আশরাফ কারীম সাহেবও দিল্লীতে বাস করেন। তিনি তার ওখানে অবস্থান করার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিলেন। তার হকও ছিলো অগ্রগণ্য

এবং তার ওখানে কিছু সময় কাটানোর ইচ্ছা আমারও ছিলো। এ কারণে বিমানবন্দর থেকে তার বাড়িতেই যাই। মাদ্রাজ থেকে আগমনকারী আমাদের সফরসঙ্গী জনাব হাসান সাহেব প্রমুখ ইবরাহীম সাহেবের বাড়িতে অবস্থান করেন। আশরাফ কারীম সাহেবের ওখানে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত বারোটা বেজে গিয়েছিলো। শুতে শুতে দু'টা বেজে যায়। দেওবন্দ যাওয়ার জন্যে ভোর পাঁচটায় রেলওয়ে ষ্টেশনে যেতে হবে। অপরদিকে কেউ কেউ এ আশংকা ব্যক্ত করছিলেন যে, রেলগাড়ি সাধারণত বিলম্বে এসে থাকে, এমনটি হলে দেওবন্দে যে সামান্য সময় পাওয়ার কথা, তা আরো কমে যাবে। তাই গাড়িতে সফর করা উচিত।

ইবরাহীম সাহেব একই সঙ্গে দুই ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। যদি ট্রেন বিলম্ব হয় তাহলে যেন আমরা গাড়িতে রওয়ানা হতে পারি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ, আহমাদাবাদ এক্সপ্রেস যথা সময়ে চলে আসে এবং ছয়টার সময় রওয়ানাও হয়ে যায়। গাড়ির জানালা দিয়ে লাল কেল্লার দালান দেখা যাচ্ছিলো। তখন আমার দৃষ্টির সামনে সেই দৃশ্য ভেসে ওঠে, যখন ১লা মে ১৯৪৮ ঈসায়ীতে আমার পাঁচ বছর বয়সে মা-বাবা ও ভাই-বোনের সঙ্গে দিল্লী ষ্টেশন থেকে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হচ্ছিলাম। তখনও রেলগাড়ি থেকে লাল কেল্লার দেয়াল এভাবেই দেখা যাচ্ছিলো। সে দৃশ্য আমার এমনভাবে মনে আছে, যেন তা আজই দেখছি। আর আজ আমি সে দৃশ্যই আমার ছেলেকে দেখাচ্ছিলাম।

কয়েক রাত থেকে ঘুম খুব কম হচ্ছে। ফারুক সাহেব এয়ার কন্ডিশন স্লিপারে বুকিং এ জন্যে করিয়েছিলেন, যেন ঘুমানোর জন্যে কিছু সময় পাই। যমুনা নদী পার হওয়ার পর রেল যখন দ্রুত গতিতে চলতে আরম্ভ করে, তখন আমি ঘুমানোর জন্যে শুয়ে পড়ি। বাষট্টি বছরের উত্থান-পতন মাথায় ভেসে ওঠে। কল্পনার জগত আমাকে অনেক দূর পৌঁছে দেয়। অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ি। প্রায় এক ঘণ্টা ঘুমানোর পর কিছুটা হৈচৈয়ের আওয়াজে আমার চোখ খুলে যায়। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, অনেকেই আমার সঙ্গে দেওবন্দে যাওয়ার জন্যে এ গাড়িতেই বুকিং করিয়েছেন। তারা বিভিন্ন ষ্টেশনে আমার বগিতে এসে দেখা করার চেষ্টা করছিলেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাত হয়। কিছুক্ষণ পর অন্য লোকদের সারি দাঁড়িয়ে যায়। প্রথমদিকে টি. টি. তাদেরকে নিষেধ করে। পরে সে আমার কাছে এসে বলে যে, এরা আপনাকে মহব্বত করে। এ কারণে আমি আর কাউকে নিষেধ করবো না। আপনি আমার মাথাতেও হাত বুলিয়ে দিন। সুতরাং অল্প অল্প বিরতির পর এ ধারা চলতে থাকে। গাড়ি চলতে থাকে আর আবেগের যাত্রীদল তার চেয়েও

দ্রুত ধাবিত হতে থাকে। অবশেষে সকাল দশটার কিছু পূর্বে গাড়ি দেওবন্দ ষ্টেশনে প্রবেশ করে।

দেওবন্দে

দেওবন্দ স্টেশনের প্লাটফরমে প্রচুর লোকের সমাগম দেখতে পাই। আমি যখন প্লাটফরমে অবতরণ করি, স্টেশন তখন নারায়ে তাকবীর স্লোগানে গমগম করে ওঠে। লোকদেরকে স্লোগান দেয়া থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাদের আবেগ-উদ্দীপনার সামনে কারো চেষ্টাই কাজে আসছিলো না। আমার মাল-সামানা ও সঙ্গীদের ব্যাপারে সাথীরা আমাকে নিশ্চিন্ত করেন। প্লাটফরমে নামার পর আমি বুঝতেই পারছিলাম না যে, কীভাবে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছি। অনেক আত্মীয়-স্বজন স্বাগত জানানোর জন্যে এসেছিলেন। কিন্তু প্রচন্ড ভীড়ের কারণে দু'-তিনজন ছাড়া আর কারো সাথে তখন সাক্ষাত হয়নি। আমার আত্মীয়দের মধ্যে আনাস খাজা সাহেব- যাঁর বাড়িতে আমাকে অবস্থান করতে হবে- এবং মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেবের ছেলে মৌলবী আরিফ সাহেব, আমার মামাতো ভাই আশরাফ কারীম সাহেব ও কারী আসেম সাহেব কোন প্রকারে আমার পাশে ছিলেন। তারাই অতিকষ্টে আমাকে প্লাটফরম থেকে বাইরে এনে গাড়িতে বসাতে সক্ষম হন। কিন্তু ছাত্ররা চর্তুদিক থেকে গাড়ি ঘিরে ফেলে। ফলে গাড়ি স্বাভাবিকভাবে চলতে পারছিলো না। তাদের ইচ্ছা ছিলো তারা শোভাযাত্রা আকারে গাড়ির সাথে যাবে। গাড়ি তাদের সাথে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাবে। কিন্তু এ ধরনের শোভাযাত্রা আমার সম্পূর্ণ স্বভাববিরুদ্ধ। সময় সল্পতার কারণেও এর কোন সুযোগ ছিলো না। তাই কিছুক্ষণ পর আমি গাড়ি থেকে নেমে তাদের কাছে আবেদন করি যে, আপনাদের মহব্বতের কারণে আমি অন্ত রের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু এখন গাড়িকে যেতে দিন। ইনশাআল্লাহ সন্ধ্যায় মাগরিবের পর এবং আগামী দিন দারুল উলূমের সমাবেশে সবার সাথে সম্মিলিতভাবে সাক্ষাত হবে। তখন ছাত্ররা দু'দিকে সারিবদ্ধ হয়ে গাড়িকে পথ করে দেয়।

মন তো চাচ্ছিলো সেসব চেনা-জানা পথ ও অলিগলি দিয়ে এগিয়ে যাই, যেগুলোর সাথে অসংখ্য স্মৃতি জড়িয়ে আছে। কিন্তু ভীড়ের কারণে বাজারের মধ্য দিয়ে সোজা পথ ধরে যাওয়া সম্ভব ছিলো না। এমনিতেও এখানে গাড়ি চলাচলের কথা কল্পনাও করা যেতো না। আগে পায়ে হেঁটে বা টমটমে যাতায়াত করা হতো। এখন সাইকেল রিক্সা সে জায়গা দখল করে নিয়েছে। এই প্রথমবার আমরা গাড়িতে চড়ে আমাদের মহল্লায় যাচ্ছিলাম। আমাদের মেযবান আনাস খাজা সাহেব শহরের বাহির দিয়ে জি. টি. রোডের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে দেন। সেই রোড ধরে আমরা শহরে প্রবেশ করি। দেওবন্দের অধিকাংশ গলি এখন

পাকা সড়কে পরিণত হয়েছে। বাড়ি ও দোকানগুলোও আধুনিক শহরের ঢং শিখে ফেলেছে। যেসব পেঁচানো গলিতে এক সময় গাড়ি চলার কথা চিন্তাও করা যেতো না, সেগুলো দিয়ে অতিক্রম করে অবশেষে গাড়ি আনাস সাহেবের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখানে আত্মীয়–স্বজনের আনন্দপূর্ণ সমাগম অপেক্ষমান ছিলো। আনাস সাহেব এ বাড়িটি আমাদের পূর্ব-পুরুষের আদীনী মসজিদের দক্ষিণের গলিতে নতুন বানিয়েছেন। মাশাআল্লাহ, বাড়িটি বেশ বড়ো এবং আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় সজ্জিত। এ কারণে আমার আত্মীয়-স্বজন আমাদের অবস্থানের জন্যে একেই মনোনীত করেছিলেন। যাতে যাতায়াতকারীদেরও সুবিধা হয় এবং আমিও মেটামুটি পূর্ব-পুরুষের মহল্লার কাছাকাছি অবস্থান করতে পারি।

বাড়িতে প্রবেশ করার পর বহু বছর ধরে বিচ্ছিন্ন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের দৃশ্যটি ছিলো অত্যন্ত আবেগঘন ও আনন্দপূর্ণ। আমি বাইশ বছর পর দেওবন্দে এসেছি। এসময় শিশুরা যুবক হয়ে সন্তানের পিতা হয়েছে। যাদের চুল কালো দেখেছিলাম, তাদেরকে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ দেখতে পাই। বহু তরুণকে জন্মের পর এই প্রথম দেখার সুযোগ হয় ।এভাবে পরিচয় পর্বেই অনেক সময় পার হয়ে যায়। সেখানেই হযরত মাওলানা আসলাম কাসেমী সাহেব তাশরীফ আনেন। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)–এ যাওয়ার জন্যে দাওয়াত দেন।

তাছাড়া জনাব হাসীব আহমাদ সিদ্দিকী সাহেব দেওবন্দের বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। তিনি শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. ও হাকীমুল ইসলাম হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব (কু.দি.)–এর প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বহুবিধ সমাজসেবামূলক কাজের কারণেও তিনি পরিচিত। তার সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তাও রয়েছে। বিশেষ করে আমার বড়ো ভাই হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী সাহেব ও জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ ওলী রাযী সাহেবের বাল্যবন্ধু ছিলেন তিনি। বর্তমানে দেওবন্দসহ সাহারানপুর জেলার মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভাপতি। যার মর্যাদা শহরের মেয়রের সমান। তিনিও তাশরীফ আনেন এবং বলেন যে, তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ সংলগ্ন মাহমুদ হলে একটি স্বাগত সভার আয়োজন করেছেন। মাগরিবের পর আমাকে সেখানে যেতে হবে।

আদীনী মসজিদে

যোহরের নামায আমাদের পূর্ব-পুরুষের আদীনী মসজিদে আদায় করি। আমি হযরত ওয়ালেদ সাহেবের মুখে শুনেছি যে, মসজিদটি সুলতান মুহাম্মাদ তুঘলকের শাসনামলে নির্মাণ করা হয়। দেওবন্দের ঐতিহাসিক জনাব মাহবুব

রিজভী সাহেব মরহুম লিখেছেন যে, এটি সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে নির্মিত। এর মুতাওয়াল্লী ছিলেন, আমার দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াসীন সাহেব রহ.। এরপর আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-এর মুতাওয়াল্লী ছিলেন। তিনি পাকিস্তান চলে যাওয়ার পর আমার চাচা হযরত মাওলানা যহুর আহমাদ সাহেব এর মুতাওয়াল্লী ছিলেন। এখন তাঁর সুযোগ্য সাহেবযাদা হযরত মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেব (মু.যি.) মুতাওয়াল্লী হিসেবে এর খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মসজিদ সংলগ্ন একটি হুজরা রয়েছে। হুজরাটি আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ. দাদা সাহেবের জন্যে বানিয়েছিলেন। এখনো তা পূর্বাবস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে।

দুপুরের খাবার খাই আমার চাচাতো ভাই খুরশীদ আলম (মু.যি.)-এর বাড়িতে। তিনি দেওবন্দে আমাদের এবং আমাদের আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন। আমাদের বাপ-দাদার মহল্লাতেই তাঁর বাড়ি। একে 'বড়ো ভাইদের মহল্লা' বলা হয়। হিজরত করার সময় আমার বয়স ছিলো মাত্র পাঁচ বছর। এ কারণে দেওবন্দের অন্যান্য এলাকার চিত্র মস্তিষ্ক থেকে অস্পষ্ট হয়ে গেলেও এ মহল্লার চিত্র মনের মধ্যে সবসময় ভাস্বর থাকে। সে সময় এ মহল্লার গলিগুলোকে বড়ো বড়ো সড়ক বলে মনে হতো। এখানেই বাড়িগুলোর মাঝখানে কিছুটা প্রশস্ত একটি জায়গা ছিলো, যাকে আমরা 'চক' বলতাম। তা সে সময় আমাদের চোখে বিশাল স্টেডিয়ামের চেয়ে কম ছিলো না। কিন্তু এখন এ সব গলি ও চক দেখে মনে হয়, যেন বড়ো একটি ছবিকে হঠাৎ সংকুচিত (Reduce) করে ফেলা হয়েছে। দুনিয়াতে মানুষের জীবনে বিভিন্ন ধাপে এ অবস্থাই সামনে আসে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের পরিবেশ থেকে বাইরে বের না হয়, তার কাছে নিজের পরিবেশকেই সবকিছু এবং সবচেয়ে বড়ো মনে হয় । কিন্তু যখন সে নিজের পরিবেশ থেকে বের হয়ে অধিকতর প্রশস্ত জায়গায় যায়, তখন বুঝতে পারে যে, অনেক ছোট জায়গাকেও সে বড়ো মনে করেছে। আমরা এ দুনিয়াকেও আজ অনেক বড়ো মনে করে থাকি এবং এর বিস্তৃতির মধ্যে হারিয়ে যাই। এর থেকে অধিক বিস্তৃত কোন জগতের কথা কল্পনা করা আমাদের জন্যে কঠিন হয়ে থাকে। আখেরাতের জগতে পৌঁছলে আমরা বুঝতে পারবো যে-

مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى.

'দুনিয়ার ভোগ-সামগ্রী অতি সামান্য। পরহেযগারদের জন্যে আখেরাত অনেক উত্তম।' (সূরা নিসা-৭৭)

আমাদের সেই বাড়িতে

যাইহোক, 'বড়ো ভাইদের মহল্লায়' আমাদের সেই বাড়িটি অবস্থিত, যা এখন আর আমাদের নেই। শিশুকালের স্মৃতি তাজা করার জন্যে তা দেখতে মন চাচ্ছিলো শুধু তাই নয়, বরং আমার ছেলে মৌলবী হাসসান আশরাফ (সাল্লামাহু) বুঝ হওয়ার পর এই প্রথম দেওবন্দে এসেছে, তাকেও বাড়িটি দেখানো উদ্দেশ্য ছিলো। সুতরাং আমরা প্রথমে আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় দাদা হযরত মাওলানা ইয়াসীন সাহেব (কু.দি.)–এর বাড়িতে প্রবেশ করি। আল্লাহ তাআলার রহমতে বাড়িটি এখনো আমার ফুফাতো বোনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ বাড়িতেই আমাদের দাদা তাঁর পুরো জীবন এবং আমাদের আব্বাজান তাঁর দেওবন্দের জীবনের বিরাট অংশ অতিবাহিত করেন। আমাদের দাদা দারুল উলূম দেওবন্দের সমবয়সী ছিলেন। অর্থাৎ, যে বছর দারুল উলূম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বছর তাঁর জন্ম হয়। তিনি বলতেন যে, আমি দারুল উলূম দেওবন্দের সে জামানা দেখেছি, যখন তার শাইখুল হাদীস থেকে নিয়ে চৌকিদার পর্যন্ত 'নিসবতে'র অধিকারী আল্লাহর ওলী ছিলেন। তিনি হাকীমুল উম্মাত হযরত থানভী রহ.-এর সহপাঠী ছিলেন। তিনি হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর মুরীদ ছিলেন। সারাটি জীবন দারুল উলূম দেওবন্দে পাঠদানের কাজে অতিবাহিত করেন। কয়েক প্রজন্মের উস্তায ছিলেন তিনি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দারুল উলূম থেকে পাঠদান শেষ করে পায়ে হেঁটে গাঙ্গুহ যেতেন। হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর খেদমতে জুমার দিন কাটিয়ে তারপর দেওবন্দ আসতেন। আমি আমার দাদার সাক্ষাত পাইনি। আমার দাদী সহেবাও হযরত গাঙ্গুহী রহ.-এর মুরীদ ছিলেন। আমরা বহু বছর দেখেছি যে, তাঁর জিহ্বা কখনই আল্লাহর যিকির থেকে বিরত থাকতো না। তার প্রত্যেক শ্বাসের সাথে আমরা 'আল্লাহ,আল্লাহ' আওয়াজ শুনতে পেতাম। এটি সে সকল আল্লাহওয়ালা বুযুর্গের সাদামাটা বাসস্থান। আজও তা পূর্বের আকারে অক্ষত রয়েছে। এখানে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. সহ দেওবন্দের সমস্ত বড়ো বড়ো আলেমের যাতায়াত ছিলো। তাঁদের পবিত্র আত্মার সৌরভ এর দ্বার-প্রাচীরে আজও গেঁথে আছে।

এ বাড়ির কাছেই হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. একটি নতুন বাড়ি বানিয়েছিলেন। যার মধ্যে আমার এবং আমার কয়েক ভাইয়ের জন্ম হয়েছে। দুই বাড়ির মাঝখানে সুড়ঙ্গ সদৃশ একটি পথ ছিলো। যাকে আমরা 'খিড়কি দরজা' বলতাম। এখন তা নেই। এ জন্যে আমরা দাদার বাড়ির ছাদে চড়ে ঐ বাড়িতে অবতরণ করি। আমরা পাকিস্তান যাওয়ার পর বাড়িটি কাস্টোডিয়ানরা নিয়ে শরণার্থীদের দিয়ে দেয়। পরে তা বিভিন্ন হাত বদল হয়ে তিন ভাগে বিভক্ত হয়েছে। আমরা বাড়ির উত্তর অংশে ছিলাম। হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ.

আমাদের মরহুম ভাই জনাব মাওলানা মুহাম্মাদ যাকী কাইফী রহ.-এর বিবাহের সময় এখানে দু'টি কক্ষ বানিয়েছিলেন। একটু সামনে অগ্রসর হলে বাড়ির প্রধান ফটক, যা পূর্ব দিকে সড়কমুখী উন্মুক্ত হয়। তার ডান দিকে হযরত ওয়ালেদ সাহেবের বৈঠকখানা এবং তৎসংলগ্ন তাঁর ইবাদতকক্ষ ছিলো। বাড়ির ঐ অংশ দেখে চোখের সামনে কতো না দৃশ্য ভেসে ওঠে। বাড়ির বাকী অংশ তালাবদ্ধ ছিলো। উপস্থিতভাবে তা খোলার ব্যবস্থা করা যায়নি। হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. যখন এ বাড়ি নির্মাণ করেন, তখনই এর উপর একটি ফলক বসিয়েছিলেন। যার উপর এ কবিতাটি লেখা ছিলো-

دنیا کا کچھ قیام نہ سمجھو، کرو خیال
اس گھر میں تم سے پہلے بھی کوئی مقیم تھا

'পৃথিবীতে তোমার এ অবস্থানকে
চিরস্থায়ী ভেবো না।
এ ঘরে তোমার পূর্বেও কেউ বাস করেছে
তা ভুলে যেয়ো না।'

আমার মরহুম ভাই জনাব মুহাম্মাদ রাযী সাহেব রহ. পাকিস্তান যাওয়ার সময় উপরের তলায় এ কবিতাটি লিখেছিলেন। -

یہ چمن یونہی رہیگا اور ہزاروں جانور
اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے!

'এ কানন এমনই রয়ে যাবে,
আর হাজার হাজার পশু-পাখি
নিজ নিজ বুলি গেয়ে উড়ে যাবে।'

এ কবিতা এ বাড়ির নতুন অধিবাসীদেরকে বিগত লোকদের কথাও স্মরণ করিয়ে দেবে এবং স্মরণ করিয়ে দেবে আগত লোকদের কথাও। হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. বাড়িটি অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনার সাথে বানিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেন– যেদিন আমি এ বাড়ি থেকে বের হয়ে আসি, সেদিনই আমার অন্তর থেকেও তা বের হয়ে যায়। হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. তাঁর দেওবন্দের সফরনামায় দুনিয়ার নশ্বরতার যে শিক্ষণীয় আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর প্রভাবশালী।

এ মহল্লাতে আমাদের অনেক আত্মীয়ের বাড়ি রয়েছে। তাদের সবার বাড়িতেই অল্প সময়ের জন্যে উপস্থিত হয়ে আমরা হযরত মাওলানা খুরশীদ

আলম সাহেবের বাড়িতে পৌঁছি। সেখানে তিনি আমার দাদার দিকের আত্মীয়দের বড়ো সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। খানার সময় তাদের সকলের সঙ্গে আবেগঘন সাক্ষাত হয়।

খানা খাওয়ার পর অবস্থানস্থলে পৌঁছে কিছু সময় বিশ্রাম করার সুযোগ হয়। আল্লাহ তাআলা আনাস সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন, তিনি আমাকে একটি আরামদায়ক কক্ষে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন এবং আগমনকারীদের প্রতি নজর রাখেন।

স্থানীয় আলেমগণের সাথে সাক্ষাত

চারটার দিকে কামরা থেকে বের হয়ে দেখি, বৈঠক ঘর সে সমস্ত আলেম-উলামা দ্বারা পরিপূর্ণ, যাদের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা ছিলো, কিন্তু এই অল্প সময়ে কী করে তাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে, তা বুঝে আসছিলো না। করাচী থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় আমি মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুর থেকে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ শাহেদ সাহেবের চিঠি পাই। তাতে তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে মাযাহিরুল উলূমে যাওয়ার দাওয়াত দেন। আমি তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিবেদন করি যে, আমার ভীষণ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেওবন্দ ছাড়া অন্য কোথাও এমনকি থানাভবন ও জালালাবাদেও যাওয়ার সুযোগ হবে না। সুতরাং তিনি মেহেরবানী করে নিজে দেওবন্দে তাশরীফ আনেন। ভিসা না পাওয়ার ফলে থানাভবনে না যাওয়ার আক্ষেপ ছিলো। কিন্তু সেখানকার খানকার বর্তমান মুহতামিম হযরত মাওলানা নাজমুল হাসান থানভী (যীদা মাজদুহুম)-ও সেখান থেকে সফর করে দেওবন্দে তাশরীফ আনেন। এভাবে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের নেয়ামত লাভ হয়। মাওলানা নুরুল হাসান রাশেদ সাহেব কান্ধলবী (হাফিযাহুল্লাহু তাআলা) 'খাতিমুল মসনবী' হযরত মুফতী ইলাহী বখশ কান্ধলবী সাহেবের খান্দানের লোক। তাঁর নিকট আকাবিরের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অনেক দুর্লভ ও মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। তার ভিত্তিতে তাঁর অনেকগুলো ইলমী ও তাহকীকী কীর্তি জনসমক্ষে এসেছে। এ সফরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার আশা ছিলো না। তিনি মেহেরবানী করে কান্ধলা থেকে তাশরীফ আনেন। মোটকথা, ইলাহাবাদ, মীরাঠ, মোজাফফরনগর, সাহারানপুর, ফুলাত আরো না জানি কতো জায়গা থেকে উলামায়ে কেরামের এ পুষ্পস্তবক এখানে উদ্ভাসিত হন। দারুল উলূম (ওয়াক্ফ) ও দারুল উলূম (কাদীমের) হাযরাতে আসাতেযায়ে কেরাম এবং হযরত মাওলানা আসআদ মাদানী সাহেবের সাহেবযাদাও তাশরীফ এনেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে মোলাকাত ও যিয়ারত আমার জন্যে অপ্রত্যাশিত নেয়ামত ছিলো। যা দ্বারা আমার মন ও নয়ন ধন্য হয়ে ওঠে।

—১৭

এরই মধ্যে সামনের গলিতে হৈ চৈ শোনা যায়। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি যে, গলির মধ্যে অনেক তালিবে ইলম ও সাধারণ মুসলমানের সমাগম হয়েছে। তারা সাক্ষাতপ্রার্থী। কামরায় সমবেত উলামায়ে কেরাম বললেন- অনেক লোক দূর–দূরান্ত থেকে এসেছে, আপনি তাদের সঙ্গে কমপক্ষে মোসাফাহা করুন। আনাস সাহেবের বাড়ির বেলকনি সামনের গলির দিকে উম্মুক্ত হয়েছে। আমি ঐ বেলকনিতে যাই। তখন এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পাই। পুরো গলি– যাকে আমরা 'বকরে কাসসাবানের গলি' বলতাম– এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মানুষে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে তিল ধারণের ঠাঁই নাই। আমি তো এ দৃশ্য দেখে হতবাক। আল্লাহ জানেন, না জানি কতো জায়গা থেকে মানুষ কী মনে করে এখানে সমবেত হয়েছে! তাদের এ ভালোবাসার আমি কী মূল্য দিতে পারি? আমার মেযবানদের কথামতো তারা সারিবদ্ধ হয়ে একজন একজন করে সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে থাকে এবং প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথকভাবে সালাম ও মোসাফাহা চলতে থাকে। কিন্তু মনে হচ্ছিলো, যেন এ ধারাবাহিকতা দীর্ঘই হয়ে চলছে। এর যেন কোন শেষ নেই। এমনকি আছরের আযান হয়ে যায়। আদীনী মসজিদ মাত্র দশ-বারো ফুট দূরে। কিন্তু সেখান পর্যন্ত পৌঁছার কোন পথ ছিলো না। পুরো গলি এখনো পরিপূর্ণ ছিলো। মসজিদের প্রত্যেকটি সিঁড়ি মানুষ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। ফলে আমরা মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারিনি। উপস্থিত উলামায়ে কেরামের সঙ্গে অবস্থানস্থলেই জামাত করতে হয়। জামাতের পর আমি পুনরায় বেলকনিতে গিয়ে উপস্থিত জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বয়ান করে তাদের কাছে আবেদন করি যে, ভীড়ের কারণে অনেকক্ষণ পর্যন্ত এ গলি বন্ধ হয়ে আছে। ফলে মানুষের কষ্ট হচ্ছে। এখন সবার সঙ্গে মোসাফাহা করাও সম্ভব নয়। তাই এতোটুকুর উপরই ক্ষান্ত করুন। মাগরিবের পরের সমাবেশে ইনশাআল্লাহ সবার উদ্দেশ্যে কথা হবে। অতঃপর সম্মিলিতভাবে দুআর পর সমাবেশ ভাঙ্গতে আরম্ভ করে। ফলে গলির মধ্যে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হয়।

অভ্যর্থনা সভা

মাগরিবের নামাযের জামাত মাহমুদ হলে হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। নামাযের পর দেওবন্দবাসীর পক্ষ থেকে সেই অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠিত হবে, জনাব হাসীব সাহেব যার আয়োজন করেছিলেন। মগরিবের কিছু পূর্বে আনাস সাহেব গাড়িতে করে আমাদের নিয়ে রওয়ানা হন। আমার বাসনা ছিলো প্রথমে কাসেমী কবরস্তানে গিয়ে বুযুর্গদের উদ্দেশ্যে সালাম আরয করে তারপর সেখানে যাবো। কিন্তু সাথীরা একবাক্যে বলেন যে, সেখানে এত ভীড় হবে যে, সামলানো মুশকিল হবে। আমরা শহরের বাহির দিয়ে জি.টি. রোডের দিকে বের হই। আমার স্মরণ হলো, এ রোডের পাশেই আমার পরদাদা হযরত খলীফা

তাহসীন আলী সাহেবের কবর রয়েছে। কমপক্ষে তাঁর কবরে সালাম আরয করার তাওফীক হোক। আমার ভাতিজা মৌলবী আসেফ ও মৌলবী আরেফ সাহেব কবরের জায়গা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। সেখানে হাজির হই। সে কবরের আলামত এই ছিলো যে, সেখানে একটি আমগাছ ছিলো যাকে 'সুনারাওয়ালা' গাছ বলা হতো। আমি বড়োদের থেকে শুনেছি যে, এ গাছের ফল পুরো খান্দানের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হতো। সে গাছটি এখনো রয়েছে, তবে সম্ভবত তা এখন আর ফল দেয় না।

অবশেষে আমরা কোন রকমে মাহমুদ হলে পৌঁছি। হলটি হযরত শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান রহ.-এর নামে নির্মাণ হয়েছে'। বিভিন্ন সমাবেশ, বিশেষ করে দারুল উলূমে আগত মেহমানদের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান এখানেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বাইশ বছর পূর্বে আমার দেওবন্দ আসার সময়েও জনাব হাসীব আহমাদ সিদ্দীকী সাহেব এখানে একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আজকে তো এখানকার অবস্থাই ছিলো অন্যরকম। ব্যবস্থাপকগণ পূর্বেই অনুমান করতে পেরেছিলেন যে, এ হলকক্ষ সমাবেশের জন্যে যথেষ্ট হবে না। এ কারণে তারা হলের বাইরে খোলা ময়দানে মঞ্চ তৈরী করেছিলেন। পুরো ময়দান লোকে গিজগিজ করছিলো। মাগরিবের নামায আমাকে পড়ানোর জন্যে বলা হয়েছিলো। কিন্তু জায়নামায পর্যন্ত পৌঁছা কঠিন হয়ে যায়। নামাযের মধ্যে অনুমান হয় যে, অনেক মানুষ জায়গার অভাবে জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

নামাযের পর আমরা অন্যদের কাঁধ ডিঙ্গিয়ে মঞ্চে পৌঁছি। মঞ্চ ছিলো বিশাল। মঞ্চে আকাবির উলামায়ে কেরাম উপবিষ্ট ছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! দারুল উলূম বিভক্ত হওয়ার পর সম্ভবত এটি প্রথম মুহূর্ত ছিলো, যখন উভয় দারুল উলূমের আকাবির উলামা এক মঞ্চে সমবেত হয়েছিলেন। দেওবন্দের বিখ্যাত ও সমাদৃত কবি জনাব নওয়াজ দেওবন্দী মঞ্চ পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। আমার ভাতিজা মাওলানা কারী মুহাম্মাদ ওয়াসিফ কুরআন তেলাওয়াত করেন। তারপর দারুল উলূম দেওবন্দের হাদীসের বিখ্যাত উস্তায হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনুরী সাহেব (দা.বা.) এ অধমের জন্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। সভার সভাপতিত্বের জন্যে হযরত মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেবের নাম প্রস্তাব করা হয়। অতঃপর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান সাহেব– সাভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও সাবেক নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম দেওবন্দ– তাঁর বক্তব্যে এ অধমের জন্যে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেন এবং হযরত মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেবকে সাভাপতিত্বের জন্যে সমর্থন দেন। জনাব হাসীব আহমাদ সিদ্দীকী সাহেব (হাফিযাহুল্লাহু তাআলা)

প্রশংসাপত্র পাঠ করেন। যার একেকটি শব্দ স্নেহ ও ভালোবাসা দ্বারা পরিপূর্ণ ছিলো। তারপর আমার ভাতিজা মাওলানা মুহাম্মাদ আরেফ কাসেমী খান্দানের লোকদের পক্ষ থেকে পৃথক প্রশংসাপত্র পাঠ করেন। তারপর আমাকে বক্তব্য দানের জন্যে আহবান করা হয়। আমি বক্তব্য দেয়ার জন্যে চেয়ারে বসলে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কেবল মাথাই চোখে পড়ছিলো। মনে হয় চতুর্দিক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী কয়েক তলা ভবনসমূহের ছাদ ও গ্যালারী মানুষ দ্বারা ভরে গিয়েছিলো। সাংবাদিকদের অনুমানে সমাবেশে পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজারের কম লোক ছিলো না।

আমি নিবেদন করি যে, এখন আমার অন্তরে মিশ্র আবেগ-উদ্দীপনা তরঙ্গায়িত হচ্ছে। সে কারণে কখনো কোন বক্তব্য দেয়া আমার নিকট এতো কঠিন মনে হয়নি, যতো এখন মনে হচ্ছে। তারপর আমি নিবেদন করি- দেওবন্দ ছোট একটি জনবসতি। পৃথিবীর কোন শহরের সঙ্গে তুলনা করা হলে নগরী হিসেবে তার বিশেষ কোন মর্যাদা নেই। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার বিশাল খ্যাতিই শুধু দান করেননি, বরং সমগ্র পৃথিবীতে তার ফয়জের নূর বিস্তার লাভ করেছে। আমরা যারা দেওবন্দবাসী, তাদের এর কারণ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত। এর কারণ শুধু এই নয় যে, এখানে জ্ঞান-গবেষণার সাগর প্রবাহিত করা হয়েছে। বরং এর আসল কারণ হলো, এখানকার আকাবির শুধু কথা ও কলমের মাধ্যমেই নয়, বরং নিজেদের আমল ও আদর্শের মাধ্যমে দ্বীনের সেই রূপরেখা তুলে ধরেছেন, যা ছিলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র ভাষায় 'মা আনা আলাইহি ও আসহাবী' এর বাস্তবভিত্তিক তাফসীর। আমি আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের পরহেযগারী, দুনিয়াবিমুখিতা, বিনয়, সরলতা ও সুন্নাতের অনুসরণের কিছু ঘটনা তুলে ধরে আবেদন করি যে, আমরা এ আকাবিরের অনুসারী। তাই আমাদেরকে সবসময় এ সমীক্ষা চলাতে হবে যে, আমাদের জীবনে তাদের কীর্তি ও চরিত্রের কোন প্রতবিম্ব আছে কি না?

ইশার নামাযের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে অবিস্মরণীয় এ সমাবেশ সমাপ্ত হয়। সভার শুরুর দিকে মজমার আধিক্যের কারণে ধাক্কাধাক্কি হতে দেখা গিয়েছিলো। তাই আমি আমার বক্তব্যে আরও নিবেদন করি যে, আমাদের দ্বীন আমাদেরকে নিয়ম-শৃংখলা শিক্ষা দিয়ে থাকে। আমাদের এমন কোন দৃশ্য তুলে ধরা উচিত নয়, যার মাধ্যমে আমরা নিজেদের বিশৃঙ্খলার কারণে দ্বীন ও আকাবিরে দেওবন্দের ভুল প্রতিনিধিত্ব করি। তাই সমাবেশ সমাপ্ত হলে নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রদর্শন করা উচিত। সুতরাং মঞ্চে জায়গার সংকীর্ণতার কারণে স্বাভাবিকভাবে যেটুকু সমস্যা হওয়ার কথা ছিলো তা হয়েছে, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে

শ্রোতারা এ নিবদনের সম্মান রক্ষা করেন। মানুষ মোটের উপর ধীরস্থিরভাবে সভাস্থল ত্যাগ করে।

ইশার নামাযের পর আমার মামাতো ভাই কারী মুহাম্মাদ আসেম সাহেবের বাড়িতে খানার আয়োজন করা হয়েছিলো। তার বাড়িতে যাওয়ার পথে আমার ফুফাতো ভাই হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ হাসান সাহেবের বাড়িতে যাই। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের যোগ্য ও সমাদৃত উস্তায এবং হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর খলীফা এবং দরবেশ প্রকৃতির বুযুর্গ ছিলেন। বর্তমানে এ বাড়িতে তাঁর সাহেবযাদা মাওলানা খুরশীদ হাসান সাহেব বাস করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছেন। গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজেও জড়িয়ে আছেন। তার কিতাবসমূহও বেশ সমাদৃত। তার বাড়িতে কিছু সময় অতিবাহিত করে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেওবন্দের জামে মসজিদের সামনের বাজারের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করি। বাজারটি ছিলো আমার পরিচিত। এখানকার দোকানদাররা সমবেত হয়। তাদের সবার সঙ্গে মোলাকাত হয়। অবশেষে আমরা আসেম সাহেবের বাড়িতে পৌঁছি। এটি আমাদের নানার বাড়ি। আমার তিন মামা এখানে বাস করতেন। তিনজনই ইনতিকাল করেছেন। আসেম সাহেব তাদের স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছেন। তিনি আমাদের নানার বংশের সমস্ত আত্মীয়কে সমবেত করেছিলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে খুব উপভোগ্য সময় কাটে।

দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)–এ

পরের দিন আমার মরহুম চাচাতো ভাই হযরত মাওলানা শাকুর আহমাদ সাহেবের সাহেবযাদা মাওলানা সারওয়ার আহমাদের বাড়িতে নাশতার ব্যবস্থা ছিলো। তারপর প্রোগাম এভাবে চূড়ান্ত করা হয়েছিলো যে, সকাল সাড়ে আটটায় দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)–এ যাবো এবং দশটার সময় দারুল উলূম (কাদীম)–এ যাবো। সুতরাং আমি প্রথমে দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)–এ যাই।

দারুল উলূম বিভক্ত হওয়ার পর আমি এই প্রথম দেওবন্দ আসি। এ কারণে ইতিপূর্বে দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)–এ আমার আসা হয়নি। এবার গিয়ে মাশাআল্লাহ অত্যন্ত শানদার ভবন দেখতে পাই। ছাত্র সংখ্যাও অনেক ছিলো। অল্প সময়ে এ দারুল উলূম অনেক উন্নতি করেছে। জনাব ইউসুফ শেঠি সাহেব মরহুমের কথা আমার স্মরণ হলো। তিনি বলতেন যে, আমি কোন মাদরাসার কর্তৃপক্ষের মধ্যে মতবিরোধের সংবাদ পেলে এদিক থেকে খুশি হই যে, এখন আরেকটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে মতবিরোধের অনিষ্ট থেকেও আল্লাহ তাআলা কল্যাণ সৃষ্টি করে থাকেন। ডাভেলের দারুল উলূম বহু বছর ধরে এর

জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এখন এই দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)-ও তারই আরেকটি উদাহরণ। আল্লাহর মেহেরবানীতে এখন উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমঝোতার পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছে। যার নমুনা স্বরূপ মানুষ গতরাতে উভয় প্রতিষ্ঠানের আকাবিরকে একমঞ্চে উপবিষ্ট দেখেছে।

এখানেও ছাত্র ও উস্তাযগণের পক্ষ থেকে অত্যন্ত মহব্বত এবং আমার যোগ্যতার চেয়ে অধিক সম্মানের আচরণ করা হয়েছে। তিলাওয়াতের পর দারুল উলূমের মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী সাহেব (মু.যি.)-এর নিম্নোক্ত পয়গাম পড়ে শোনানো হয়। তিনি এখন দেশের বাইরে সফরে রয়েছেন।

বিসমিহী তাআলা

শ্রদ্ধেয় হযরত মাওলানা তাকী উসমানী সাহেব যীদা মাজদুহু,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

আপনি মাতৃভূমি দেওবন্দে তাশরীফ এনেছেন জেনে আন্তরিকভাবে আনন্দিত হই। এ সুবাদে দারুল উলূম (ওয়াক্ফ) দেওবন্দের আসাতিযা ও তলাবাগণের সাথে সাক্ষাত ও উপদেশমূলক বক্তব্যদানের জন্যে আপনি আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার কারণে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। দারুল উলূম (ওয়াক্ফ) দেওবন্দ সম্পর্কে আপনি অনবহিত নন। দারুল উলূম (ওয়াক্ফ) দেওবন্দের জন্যেও আপনি নন অপরিচিত। আপনার আগমন উপলক্ষে 'আহলান, সাহলান, মারহাবা' এবং আপনার প্রত্যাবর্তনের সময় এখানকার সকলের মুখে শান্তি ও নিরাপত্তার দুআ ও পুনরায় আগমনের দাবি উচ্চারিত হচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা আপনার আগমনকে সারাদেশের জন্যে ব্যাপকভাবে এবং দেওবন্দবাসী ও দারুল উলূম ওয়াকফের জন্যে বিশেষভাবে বরকতের কারণ বানান। সুস্থতা ও নিরাপত্তাসহ আপনার ইলমী খিদমত সর্বদা অব্যাহত থাকুক। সফরের কারণে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত না হওয়ার আফসোস রইলো। ওয়াস সালাম।

(মাওলানা) মুহাম্মাদ সালেম কাসেমী (মু.যি.)
মুহতামিম, দারুল উলূম (ওয়াক্ফ), দেওবন্দ
মাওলানা মুহাম্মাদ সুফিয়ান কাসেমী (মু.যি.)
নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম (ওয়াক্ফ) দেওবন্দ এর পক্ষে-
আব্দুল্লাহ ইবনুল কমর আল হুসাইনী
নাযেম, প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ, দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)
তারিখঃ ১১ই জুলাই ২০১০ ঈসায়ী

তারপর ইলাহাবাদ থেকে আগত জনাব কামেল চাইলী ছাহেব, যিনি সুমধুর কবি- আমার সম্মানে তার কবিতা শোনান। হযরত মাওলানা খুরশীদ আলম সাহেব মু.যি. সহীহ বুখারীর শেষ অধ্যায়ের দরস দানের হুকুম দেন। দারুল উলূমে এমন দুঃসাহস করা ছিলো আমার সাধ্যের বাইরে। কিন্তু হুকুম পালন ও সৌভাগ্যলাভের উদ্দেশ্যে আমি ছাত্রদেরকে 'মুসালসাল বিল আওয়ালিয়াত' হাদীস শুনাই। তারপর সহীহ বুখারী শরীফের শেষ অধ্যায় ও শেষ হাদীস সর্ম্পকে কিছু কথা আলোচনা করি। ছাত্রদের আবেদনে তাদেরকে হাদীসের সাধারণ ইজাযতও দেই। প্রায় এক ঘণ্টা বয়ান করার পর সেখান থেকে রওয়ানা হই। কাসেমী কবরস্তানে এখনো যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তখন আমি পুনরায় সেখান হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করি। কিন্তু সঙ্গীরা বলেন– প্রচন্ড ভিড়ের কারণে সেখানে মানুষকে সামাল দেওয়া বড়ো কঠিন হয়ে পড়বে। তবে খানকাহ নামক মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত দারুল উলূম (ওয়াক্ফ) দেওবন্দের একেবারে নিকটে ইমামুল আসর হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ ছাহেব কাশ্মীরী রহ.-এর মাযার অবস্থিত। সেখান পর্যন্ত পৌঁছা কঠিন ছিলো না। আলহামদুলিল্লাহ! ইমামুল আছরের পবিত্র মাযারে হাজির হওয়ার ও সালাম আরয করার সুযোগ হয়। যার ইলম দ্বারা প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোনভাবে আমার উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন। তাঁরই পাশে তাঁর সুযোগ্য সাহেবযাদা হযরত মাওলানা আনযার শাহ রহ.-এর তাজা কবর রয়েছে। তিনি এ অধমের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। সাম্প্রতিককালেই তাঁর ইনতিকাল হয়েছে। দারুল উলূম (ওয়াক্ফ)–এর হাদীসের মাসনাদ বহু বছর যাবত তাঁর মাধ্যমে আবাদ ছিলো। তার লেখা ও বক্তৃতার ফয়েয মাশাআল্লাহ আলমে ইসলামের বিভিন্ন ভূখন্ডে বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর কবরেও সালাম আরয করি। তারপর দারুল উলূম (কাদীম)–এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

দারুল উলূম দেওবন্দ (কাদীম)–এ

ভিড় তো সবজায়গাতেই সাথে সাথে চলছিলো। দারুল উলূম (কদীমে) যাওয়ার জন্যেও ব্যবস্থাপকগণকে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। গাড়ি কোন দিক দিয়ে আনা হবে। কোথায় দাঁড় করানো হবে ইত্যাদি। প্রথমে মেহমানখানায় যাই। সেখানে দারুল উলূমের আসাতাযায়ে কেরাম ও কর্তৃপক্ষ সমবেত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মাওলানা আবদুল খালেক সাহেব মাদ্রাজী মু.যি. (নায়েবে মুহতামিম, দারুল উলূম), হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ উসমান সাহেব (সাভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ), হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী সাহেব বিজনূরী (মু.যি.) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ হয়। তাঁরা সকলে অত্যন্ত মহব্বত ও স্নেহের আচরণ করেন। হযরত

মাওলানা আরশাদ মাদানী সাহেব (মু.যি.) এ সময় সফরে ছিলেন। এ কারণে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। হযরত মাওলানা সাঈদ আহমাদ সাহেব পালনপুরী মু.যি.কে সম্ভবত আজ সফরে যেতে হবে। এ কারণে তিনি এখানে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু আজ সকালেই ফজরের নামাযের পর তিনি দয়া করে নিজেই আমার অবস্থানস্থলে তাশরীফ এনেছিলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে এভাবে তাঁর সঙ্গে আগেই মোলাকাত হয়েছিলো। দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা মারগুবুর রহমান মু.যি. বর্তমানে শয্যাশায়ী। তাঁর খেদমতে হাজির হই। অসুস্থতার কারণে তাঁর জন্যে কথা বলাও ছিলো কঠিন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করেন। তিনি বলেন যে, আমি জ্যোতির্বিদ্যার কিতাব 'আত তাসরীহ' আপনার ওয়ালেদ মাজেদ (হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব কু.সি.)-এর নিকট পড়েছি। ফেরার সময় তাঁর বাগানের এক পেটি আমও দিয়ে দেন।

তারপর ব্যবস্থাপকগণের পক্ষ থেকে দারুল উলূমের মসজিদে রশীদে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিলো। আমাকে পূর্বেই বলা হয়েছিলো যে, ছাত্ররা হাদীসের ইজাযতও নিতে আগ্রহী। জনসমাগমের আধিক্যের কারণে আয়োজকগণ চিন্তা করেছিলেন যে, মসজিদেই হাদীসের দরস হবে, তারপর সেখানেই বয়ান হবে। সে প্রোগাম মতো আমি মসজিদে রওয়ানা হওয়ার সময় ছাত্ররা পীড়াপীড়ি করে যে, প্রথমে দারুল হাদীসে গিয়ে হাদীসের দরস হোক। তারপর মসজিদে রশীদে বয়ান হোক। ব্যবস্থাপকগণ তাদের বাসনা অনুপাতে আমাকে দারুল হাদীসে নিয়ে যান। সত্যকথা হলো, দারুল হাদীসের সেই মাসনাদে বসা আমার জন্যে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা মনে হচ্ছিল, যেখানে হযরত শাইখুল হিন্দ রহ., ইমামুল আসর হযরত আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ., হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. ও হযরত মাদানী রহ.-এর মতো ইলম ও ফযলের স্তম্ভগণ দরস দিয়েছেন। কিন্তু এতো প্রচন্ডভাবে আমাকে পীড়াপীড়ি করা হচ্ছিলো যে, তা অমান্য করা খুব কঠিন ছিলো। সুতরাং আমি এটিকে একটি শুভলক্ষণ মনে করে তাঁদের হুকুম পালন করি। ছাত্রদেরকে 'হাদীস মুসালসাল বিল আওয়্যালিয়াত' শুনাই। তারপর ছাত্ররা সহীহ বুখারী শরীফের একটি হাদীস পাঠ করে এবং সাধারণ ইজাযত লাভ করে। তারপর সংক্ষিপ্ত বয়ান হয়। তারপর আমরা দারুল উলূমের আলীশান মসজিদে রশীদে পৌঁছি। সেখানে বিশাল এক জনসমাবেশ অপেক্ষমান ছিলো। হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনূরী মু.যি. সভার সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে নিজস্ব সুধারণার ভিত্তিতে এমন একটি কথা বলেন, যা আমি আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিজের জন্যে শুভলক্ষণ মরে করি। তিনি বলেন– 'দারুল

উলূম দেওবন্দে কোন মেহমান এলে আমরা তার সামনে দারুল উলূমের পরিচয় তুলে ধরি, কিন্তু আজ এমন একজন মেহমানকে আমরা অভ্যর্থনা জানাচ্ছি, যিনি নিজেই দারুল উলুমের সদস্য। তাঁর সামনে দারুল উলূমের পরিচয় তুলে ধরার পরিবর্তে আমাদেরকে তাঁর নিকটেই জিজ্ঞাসা করতে হবে যে, দারুল উলূম দেওবন্দ কী? এর কারণ এই যে, আমরা তাঁকে সারা পৃথিবীতে দারুল উলূম দেওবন্দের মুখপাত্র মনে করি।' এ কথাগুলো ছিলো আমার জন্যে অত্যন্ত সম্মানজনক। আল্লাহ তাআলার নিকট দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে এর যোগ্য হওয়ার তাওফীক দান করেন। আমীন।

আমি আমার বক্তব্যে নিবেদন করি যে, আজ আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। যেদিন আল্লাহ তাআলা আমাকে সেই দারুল উলূমে হাজির হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন, যা ছিলো বাল্যকাল থেকে আমার সমস্ত স্বপ্নের কেন্দ্রবিন্দু। আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-এর নিকট থেকে সকাল-সন্ধ্যা যার আলোচনা শুনেছি। যার আকাবিরের মহব্বত ও আযমত দ্বারা আমার দিল সবসময় কানায় কানায় পরিপূর্ণ রয়েছে। যার মাসলাক ও মাশরাব তথা জাহেরী ও বাতেনী মতাদর্শ ও কর্মপন্থাকে দ্বীনের আদর্শ উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন মনে করে এসেছি। সমগ্র পৃথিবীতে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরাকে নিজের জন্যে সৌভাগ্যের কারণ মনে করেছি। লেখা ও কথার মাধ্যমে তার প্রতিরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করার তাওফীক লাভ হয়েছে। তারপর আমি আকাবিরে দারুল উলূমের এমন কিছু ঘটনার পুনরাবৃত্তি করি, যেগুলো আমি আমার ওয়ালেদ মাজেদ রহ.-এর নিকট শুনেছিলাম। যেগুলো দ্বারা উলামায়ে দেওবন্দের মাসলাক ও মাশরাব এবং ইলমী ও আমলী মেযাজ ও মযাকের উপর আলোকপাত হয়। হযরত মাওলানা রিয়াসত আলী বিজনূরী মু.যি. আমাকে বলেছিলেন যে, তুমি সারা পৃথিবীতে সফর করো, আজকের বয়ানে এ কথাও বলো যে, তোমার কাছে মুসলিম বিশ্বের ভবিষ্যত কেমন মনে হয়। তার উত্তরে আমি নিবেদন করি যে, বর্তমানে সারা বিশ্বে দু'টি ঢেউ সমান্তরালে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। একটি ধর্মহীনতা ও আল্লাহর নারাজির ঢেউ, যা বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা সজ্জিত। তা মানুষের অন্তর থেকে ঈমান ও আখেরাতের ফিকির খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বের করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে সাধারণ মুসলমান- বিশেষ করে যুবকদের মধ্যে নিজেদের বাস্তবজীবনে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং ইসলামের প্রথম যুগসমূহের সাথে নিজেদেরকে সংযুক্ত করার ঢেউ তরঙ্গায়িত হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানরা- কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া- ব্যাপকভাবে প্রথম ঢেউয়ের প্রভাবাধীন রয়েছে। আর তাদের সঙ্গে রয়েছে মিডিয়ার শক্তি। আর দ্বিতীয় ঢেউ নিঃসম্বল। কিন্তু তা মানুষের অন্তরের গভীর থেকে উঠে এসেছে। সরকার বা

গণমাধ্যমের কৃত্রিম কোন শক্তি তাকে ওঠায়নি। এ কারণে বাহ্যত চূড়ান্ত বিজয় ইনশাআল্লাহ তারই লাভ হবে। তবে তাকে ঈমান ও হিকমতের আঁচল ধরে রাখতে হবে। এমন আবেগময় স্লোগান থেকে দূরে থাকতে হবে, যেগুলো অনেক জায়গায় অনেক শক্তি-সামর্থ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বর্তমানে একথা বুঝতে পারা অত্যন্ত কঠিন হয়ে গেছে যে, কোন্ আবেগময় স্লোগানের রশি কার হাতে রয়েছে। এ কারণে বিশেষভাবে যুবকদেরকে তাদের সেই আকাবিরের ছত্রছায়ায় থাকা উচিত, যাঁদের ইলম, অন্তর্দৃষ্টি, নিষ্ঠা ও অভিজ্ঞতা তারা প্রত্যক্ষ করেছে।

প্রায় একঘণ্টা বয়ান করি। আমার তো বাসনা ছিলো, দারুল উলূম (কাদীম)–এর একেকটি ভবনে গিয়ে বুযুর্গদের স্মরণ জীবন্ত করি। কিন্তু প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে তার কোন সুযোগই ছিলো না। শুধুমাত্র মেহমানখানা, দারুল হাদীস ও মসজিদে রশীদের মধ্যে কয়েকটি ভবনের উপর চোখ পড়ে। তার মধ্যে একটি কক্ষ সেটিও ছিলো, যার মধ্যে আমার ওয়ালেদ মাজেদ (কু.সি.) দারুল উলূমের প্রধান মুফতী হিসেবে বহু বছর ফাতাওয়া দানের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

এরপর আমার মেযবানগণ আমাকে কোন রকমে গাড়িতে বসিয়ে জি.টি. রোডের দিকে বের করে দিতে পারাকেই নিরাপদ মনে করেন। এভাবে আমি যোহরের কিছু পূর্বেই পুনরায় নিজেদের মহল্লায় পৌঁছে যাই। মহল্লার যেসব বাড়িতে কাল যেতে পারিনি আজ সেগুলোতে যাওয়ার সুযোগ হয়। তার মধ্যে একটি বাড়িতে যাওয়ার তীব্র বাসনা ছিলো। যে বাড়িতে আমি তোতলা মুখে 'বাগদাদী কায়দা' পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। এটি ছিলো আমাতুল হান্নান সাহেবা (রহিমাহাল্লাহু তাআলা) নাম্নী এক বুযুর্গ মহিলার ঘর। তিনি শুধু মহল্লারই নয়, বরং বাহিরের ছেলেমেয়েদেরকেও কুরআনে কারীম পড়াতেন। তার এ বাড়ি শিশুদের তিলাওয়াতের আওয়াজে গমগম করতো। তিনি সারাটি জীবন এ স্বেচ্ছাসেবা দান করে যান। এমনকি দেওবন্দের অনেক পরিবারের কয়েক প্রজন্ম তাঁর কাছেই কুরআনে কারীম পড়েছে। কুরআনে কারীম পড়ানোর মধ্যেই বিষয়টি সীমাবদ্ধ ছিলো না। তাঁর এ বাড়ি ইসলামী আদব-আখলাক শেখানোরও একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্রের মতো ছিলো। এখানে শিক্ষা গ্রহণকারী মেয়েরা এখান থেকে ঘরসংসারের আদব-কায়দাও শিক্ষা লাভ করতো। শুধু সেসব ছেলেমেয়েদের উপরেই নয়, বরং তাদের মা-বাবা ও পরিবারের অন্যদের উপরেও তাঁর বিরাট প্রভাব ছিলো। তারা নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় এমনকি বিবাহ শাদীর বিষয়েও তাঁর মাতামতকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতো। মহীয়সী এ নারী নিজের ছাত্রদের সকল অবস্থার খবর রাখতেন। এমনকি তাঁর যে সমস্ত ছাত্র

পাকিস্তান চলে গিয়েছিলো, তাদেরও খোঁজ-খবর রাখতেন। আমার সকল ভাই-বোন তাঁর কাছে পড়েছে। আমিও কায়দায়ে বাগদাদীর অনানুষ্ঠানিক সূচনা তাঁর ঘরেই করেছিলাম। তিনি কয়েকবার পাকিস্তান তাশরীফ এনেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার সর্বশেষ সাক্ষাত হয় লাহোরে। আমি তো অবাক যে, আমাকে জেদ্দার মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর সহকারী প্রধান মনোনীত করা হয়েছে, এ কারণে তিনি আমাকে মোবারকবাদ দিলেন এবং আনন্দ প্রকাশ করলেন।

আমি চিন্তা করি যে, এই বুযুর্গ মহিলার হাতে কতো শিশু শিক্ষা পেয়ে জ্ঞান–গরিমার উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকে খ্যাতির চূড়া স্পর্শ করেছে। আজ পৃথিবী তাদের কথা তো খুব জানে, কিন্তু খ্যাতিহীন যেই মহিলা ঘরের কোণায় বসে তাদের অন্তরে ঈমান ও ইলমের বীজ বপন করেন, তাঁর নাম ও কীর্তি সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। তাঁর খেদমতের মধ্যে যশ-খ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের কোন গন্ধও ছিলো না। তাই আল্লাহই ভালো জানেন, তিনি কতো বড়ো পুরস্কারের অধিকারিনী হবেন ! না জানি, তাঁর মতো কতো মহিলা রয়েছেন, যারা খ্যাতিহীনভাবে বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্ব তৈরী করেছেন। কিন্তু কেউ তাদের সম্পর্কে জানে না । আল্লাহ তাআলা তাঁদের সকলের প্রতি অফুরন্ত রহমত বর্ষণ করুন।

দুপুরের খবারের ব্যবস্থা ছিলো আমার খালাতো ভাই মৌলবী ফাওজান (সাল্লামাহু) সাহেবের বাড়িতে। এটি সেই বাড়ি, যেখানে আমার খালা দরবেশ চরিত্রের আলেম হযরত মাওলানা আব্দুশ শাকুর সাহেব মুহাজিরে মাদানী রহ.-এর স্ত্রী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করেন। এখানে আরেকবার আমার নানার দিকের আত্মীয়দের উপভোগ্য সমাবেশ হয়। এখানে তাদের সাথে বিদায়ী সাক্ষাত হয়। অবস্থানস্থলে ফিরে এসে কিছু সময় বিশ্রাম করি। তারপর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসে। আমাকে পাঁচটার সময় রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছতে হবে। অবস্থানস্থলে বিদায়কারীদের পুনরায় ভিড় লেগে যায়। যখন আমি রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছি, তখন সেখানে পুনরায় দারুল উলূমের ছাত্রদের সমাগম ঘঠেছিলো। আমার অনেক আত্মীয়ও বিদায় জানানোর জন্যে এসেছিলেন। আমি চলন্ত ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের অনেকের চোখে ভালোবাসার অশ্রু দেখতে পাই। দেখতে দেখতে তারা চোখের আড়াল হয়ে যান। আর দেওবন্দের ত্রিশ ঘণ্টার এ অবস্থান একটি স্বপ্নে পরিণত হয়।

দেওবন্দ থেকে দিল্লী

ফেরার পথে একরাত দিল্লীতে অবস্থান করে সকালে পুনরায় মাদ্রাজ যাবো। এখানেও সারা পথ মানুষ আমার বগিতে এসে দেখা করতে থাকে। মিরাঠে হযরত মাওলানা মুফতী ফারুক মিরাঠী সাহেব মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব।

তিনি হযরত মাওলানা মুফতী মাহমুদ হাসান গাঙ্গুলী রহ.-এর ফাতাওয়াসমূহ সংকলন করেছেন। সম্ভবত বিশ ভলিউমে তা প্রকাশিত হয়েছে। তার এক সেট আমি দেওবন্দে পেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যে দেখার সুযোগ হয়নি। ট্রেনের মধ্যেই মিরাঠ স্টেশন আসার আগে মোবাইল ফোনে তাঁর পয়গাম পাই যে, তিনি মিরাঠ স্টেশনে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাশরীফ আনছেন। সুতরাং তিনি উলামায়ে কেরামের একটি জামাতসহ স্টেশনে তাশরীফ আনেন। আল্লহামদুলিল্লাহ, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার এবং তাঁর থেকে দুআ নেয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। সেখানে সম্মিলিতভাবে দুআ হয়। কয়েক মিনিট পর ট্রেন পুনরায় রওয়ানা হয়।

দারুল উলূম দেওবন্দের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মাওলানা ইবরাহীম সাহেব ও জনাব হাসান সাহেব- যিনি পুরো সফরে আমার সঙ্গে ছিলেন- তারা বললেন– অনেক লোক দেওবন্দ থেকে ফেরার জন্যে এ ট্রেনেই সীট বুকিং করিয়েছে। দিল্লী স্টেশনেও ভিড় হওয়ার আশংকা রয়েছে। দেওবন্দের মতো এখানেও মানুষ স্লোগান দিতে পারে। যা এখানকার পরিস্থিতি অনুপাতে মোনাসেব নয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে তাদের বেশির ভাগ লোকের সঙ্গে সাক্ষাতও হয়েছে। তাই তারা প্রস্তাব করেন যে, আমরা দিল্লী স্টেশনের আগে 'শাহেদরাহ' স্টেশনে নেমে যাবো। সুতরাং তারা সাহেদরা স্টেশনে গাড়ি চেয়ে পাঠান । আমরা দিল্লী স্টেশন আসার পূর্বেই নেমে যাই। আজ রাত আমাদেরকে ইবরাহীম সাহেবের বাবা জনাব হাজী মুহাম্মাদ হাশেম সাহেবের বাড়িতে কাটাতে হবে। যা নতুন দিল্লীর নিযামুদ্দীন মহল্লায় অবস্থিত এবং আধুনিক সুবিধাদি দ্বারা সজ্জিত।

এখানে পৌঁছে হযরত মাওলানা মুফতী আহমাদ খানপুরী সাহেব মু.যি.কে অপেক্ষমান পাই। মুম্বাইয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। মাজমাউল ফিকহিল ইসলামীর একটি সমাবেশে অংশগ্রহণের জন্যে তাঁর এখানে আসার প্রোগ্রাম ছিলো। মুম্বাই থেকে ৫ই জুলাই ফিরে যাওয়ার পর তিনি দিল্লীতে মোলাকাত করার প্রোগ্রাম বানিয়েছিলেন। তিনি এ বান্দার প্রতি সবসময় অত্যন্ত অনুকম্পা করে থাকেন। তাঁর যিয়ারত অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়।

অল্পক্ষণের মধ্যে মাওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ রাহমানী সাহেব (হাফিযাহুল্লাহু তাআলা)-ও সেখানে তাশরীফ আনেন। হযরত মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী সাহেব রহ.-এর পর মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী ভারতের তিনিই প্রাণপুরুষ। তিনি 'মাজমা' থেকে প্রকাশিত মূল্যবান কিতাব ও প্রবন্ধসমূহের সেটও উপহার দেন। দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ হয়। যদিও আমরা অনেক রাতে এখানে পৌঁছি এবং অতি ভোরে

আমাদেরকে বিমানবন্দরে যেতে হবে, তারপরেও নিযামুদ্দীন মারকাযের আকাবিরের সঙ্গে মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ করার বাসনাও আমার ছিলো। কিন্তু জানতে পারলাম যে, হযরত মাওলানা যুবায়ের সাহেব এবং হযরত মাওলানা আহমাদ লাট সাহেব (মু.যি.) সফরে আছেন। ইতিমধ্যে হযরত মাওলানা ইবরাহীম বুদলা সাহেব নিজেই তাশরীফ আনেন। তিনি একজন বর্ষীয়ান বুযুর্গ। মুম্বাইয়ের হযরত মাওলানা শওকত সাহেব (মু.যি.)-এর সহপাঠী এবং নিযামুদ্দীন মারকাযের বড়ো জিম্মাদারদের অন্যতম। এভাবে এ সৌভাগ্যও লাভ হয়। এ ছাড়া দিল্লীর অনেক আলেম ও আত্মীয়-স্বজনও তাশরীফ এনেছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত তাদের সাথে মোলাকাত চলতে থাকে। পরের দিন ভোরে আমরা পুনরায় মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। দিল্লী ও মাদ্রাজের মধ্যবর্তী আড়াই ঘণ্টার সফরে গত দুদিনের ঘটনাবলী এক নিরবচ্ছিন্ন স্বপ্নের ন্যায় মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে রাখে।

তামিলনাড়ুতে

তামিলনাড়ু প্রদেশে মাদ্রাজের আশেপাশে কয়েকটি শহর ও উপশহর রয়েছে। সেগুলোতে বহু সংখ্যক মুসলমান অধিবাসী রয়েছেন। দেওবন্দ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সেগুলোর কয়েক জায়াগায় যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিলো। সর্বপ্রথম আমরা মিলবিশারম যাই। এটি একটি সুন্দর ছোট শহর। হাজী হাশেম সাহেব- যাঁর আলোচনা পূর্বেও এসেছে। প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে আমাদের মেযবান জনাব ফারুক সাহেব তাঁকে 'আমীরুল মুমিনীন' বলে থাকেন– তাঁর বাড়িও এখানে। তিনি এখানে মিফতাহুল উলূম নামে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাওলানা রিয়াজ আহমাদ কাসেমী সাহেব মাদরাসার মুহতামিম। তিনি এ অঞ্চলে অত্যন্ত মূল্যবান তালিমী খিদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। সেখানে মাগরিবের পর বড়ো একটি সমাবেশে বয়ান হয়। সেখানেই খাবারের দস্তরখানে অন্যান্য আলেম ছাড়া জনাব মাওলানা কালীম সিদ্দীকী সাহেবের সাথে মোলাকাতের সৌভাগ্য লাভ হয়। তিনি এ বান্দার সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে নিজের সঙ্গী–সাথীসহ তাশরীফ এনেছিলেন।

মাওলানা কালীম সিদ্দীকী সাহেব হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী ছাহেব (কু.দি.)-এর খলীফা। তিনি হিন্দুস্তানের হিন্দুদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে অত্যন্ত মূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। মাশাআল্লাহ, তাঁর হাতে শত শত হিন্দু মুসলমান হয়েছে। তাদের অনেকের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা তাদেরই সাক্ষাতকার আকারে একটি কিতাবে প্রকাশিত হয়েছে। কিতাবের নাম– 'নাসীমে হিদায়াত কে ঝোঁকে'। তিন ভলিউমে এ কিতাব। তার মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করা ও তার পরিণতি বিষয়ে অত্যন্ত

ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী পাওয়া যায়। মাওলানা কালীম সাহেব তাঁর এক সাথীকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন যে, ইনি অত্যন্ত কট্টর হিন্দু ছিলেন। বাবরী মসজিদের উপর সর্বপ্রথম ইনিই কেদাল চালিয়েছিলেন। মাশাআল্লাহ, বর্তমানে ইনি ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দা'য়ী।

প্রকৃতপক্ষে মাওলানা কালীম সিদ্দীকী সাহেব ইসলামের দাওয়াতের কাজে যে খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, তা একদিকে ঈর্ষণীয়, অপরদিকে অনুসরণীয়। আল্লাহ তাআলা তাঁকে উত্তম বদলা দিন।

তারপর আমরা হাজী ফারুক সাহেবের শহর আম্বুর যাই। সেখানে তিনদিন অবস্থান করি। শহরটি মুসলিম চামড়া ব্যবসায়ীদের বড়ো একটি কেন্দ্র। সেখানে তাদের অনেকগুলো কারখানা রয়েছে। যেগুলো চামড়াজাত পণ্য তৈরী করে থাকে। ইউরোপের অনেক দেশের কোম্পানী থেকে তারা এসব পণ্য তৈরীর অর্ডার পেয়ে থাকে। ইতালীর জুতার বিশ্ব বিখ্যাত অনেক ব্র্যান্ড এখানেই তৈরী হয়। মাশাআল্লাহ, সে সকল ব্যবসায়ীর মধ্যে দ্বীনের ফিকিরও রয়েছে। তারা অনেক জনসেবামূলক কাজও করছেন। ব্যবসা বিষয়ক অনেক মাসআলা তাদের সামনে আসে। সেগুলোর সমাধানের জন্যে ১৩ই জুলাই মঙ্গলবার সকালে বড়ো একটি হলকক্ষে তারা ব্যবসায়ীদের একটি সমাবেশ রেখেছিলেন। সেখানে অতি সংক্ষিপ্ত বয়ান হয়। তারপর প্রায় দেড়ঘণ্টা পর্যন্ত মাসআলা সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরের ধারা চলতে থাকে। এখানকার ব্যবসায়ীদের ফেডারেশনের সভাপতি মুহাম্মাদ রফিক আহমাদ সাহেব অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এ সমাবেশের আয়োজন করেন। এখানে স্থানীয় উলামায়ে কেরাম এবং মুফতী সাহেবানও উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে মুফতী সালাহ উদ্দীন সাহেব, মুফতী সাআদাতুল্লাহ কাসেমী ও মাওলানা ইকবাল কাসেমী সাহেবের নাম এখন স্মরণ আছে।

আমি এ বিষয়টিও পরিষ্কার করে দেই যে, হযরত হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. সাধারণ সমাবেশে মাসআলা বলা এ কারণে পছন্দ করতেন না যে, অনেক সময় মানুষ অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ কথা বোঝে তার উপর গলদভাবে আমল করে, শুধু তাই নয় বরং তা মানুষের কাছেও ভুলভাবে বর্ণনা করতে থাকে। এ কারণে আমি এ শর্তে প্রশ্নোত্তরের এ ধারা কবুল করেছি যে, তা পুরাপুরি রেকর্ড করতে হবে এবং আমল করার সময় স্থানীয় মুফতী সাহেবদের শরনাপন্ন হয়ে তাদের থেকে বুঝে নিতে হবে। আমার কোন কথার সঙ্গে তাদের দ্বিমত হলে তখন তাদের কথা মতোই আমল করতে হবে।

আম্বুর যে জেলায় অবস্থিত, তার জেলা শহরের নাম ভেলুর। সেদিন বিকেলেই আসর নামাযের পূর্বে আমরা সেখানে যাই। এখানের একটি প্রচীন দুর্গ এখনও মজুদ রয়েছে। নবাব হায়দার আলী ও সুলতান টিপু রহ.-এর যুদ্ধসমূহে

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষাকেন্দ্র ছিলো। সুলতান টিপু শহীদ রহ.-এর শাহাদাত বরণের পর তাঁর পরিবারের লোকদেরকে এ দূর্গেই রাখা হয়েছিলো। হিন্দুস্তানের প্রাচীনতম মাদরাসা 'আল বাকিয়াতুস সালিহাত' এখানে অবস্থিত। মাওলানা ওসমান মুহিউদ্দীন সাহেব মাদরাসার পরিচালক। তিনি কয়েকবার আম্বুর এসে সেখানে যাওয়ার জন্যে দাওয়াত দেন। তিনি বলেন- এ মাদ্রাসা কার্যত দারুল উলূম দেওবন্দেরও কিছুদিন পূর্বে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু তার নিয়মতান্ত্রিক সূচনা হয় দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর। প্রাচীন এ মাদরাসাটিতে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। আছরের নামাযের পূর্বে মুহতামিম সাহেবের আবেদনে সহীহ বুখারীর একটি হাদীসেরও দরস হয়। এখানকার অনেকগুলো মাদরাসায় সহীহ বুখারী শরীফ পরিপূর্ণ না পড়িয়ে তার নির্বাচিত অংশ পড়ানো হয়। এ মাদরাসার নিয়মও তাই। দরসের পর আছরের নামাযও ঐ মসজিদেই পড়ি, যার সীমানাতে মাদরাসা প্রতিষ্ঠাতার মাযার রয়েছে। সেখানে সালাম আরজ করার ও ঈসালে সওয়াব করার তাওফীক লাভ হয়। তারপর সেখান থেকে ফিরে এসে আম্বুরের মসজিদে মাগরিবের নামায পড়ি।

আমাদের মেযবান হাজী ফারুক সাহেব হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী রহ.-এর বিশেষ গুণগ্রাহী। হযরত মাওলানা জীবনের শেষ সফরে তার শুধু মেহমানই ছিলেন না, বরং মৃত্যুর শেষ সময় পর্যন্ত হাজী ফারুক সাহেব তাঁর খেদমতে নিয়োজিত থাকেন। পরিশেষে তারই হাতে (নিজের শরীর রেখে) আল্লাহ পারেক সান্নিধ্যে চলে যান। হযরত ফারুক সাহেব প্রশংসাযোগ্য একটি কাজ করেছেন যে, হযরত মাওলানা ইহতিশামুল হক থানভী রহ.-এর বয়ানসমূহকে সংকলন করিয়ে 'খুতুবাতে ইহতিশামুল হক' নামে প্রকাশ করেছেন। এর বিন্যাসের কাজে হযরত মাওলানা রহ.-এর সাহেবযাদা মাওলানা তানভীরুল হক সাহেব (সাল্লামাহু) অনেক মেহনত করেছেন। এ পর্যন্ত তার পঞ্চম ভলিউম প্রকাশিত হয়েছে। সেদিনই মাগরিবের পর আম্বুরের হাশেম মসজিদে তার মোড়ক উম্মোচনের অনুষ্ঠান ছিলো। সেখানে তিনি প্রায় পাঁচশ' কপি উলামায়ে কেরাম ও মাদরাসাগুলোর মাঝে বিতরণ করেন। এ সময় আমার বয়ানও হয়।

পরেরদিন আমাদেরকে 'প্রনামবট' যেতে হবে। যা আম্বুর থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের পথ। কিন্তু পর্নাম্বট যাওয়ার পথে ওমরাবাদ নামে একটি জায়গা রয়েছে। সেখানে মাওলানা খলীলুর রহমান আজমী সাহেব জামেয়া দারুস সালাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। মাওলানা অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ মেযাজের আহলে হাদীস আলেম। তিনি তাঁর মাদরাসায় যাওয়ার জন্যে অত্যাধিক

পীড়াপীড়ি করেন। তাঁর হুকুম পালনের জন্যে সেখানে যাই। সেখানেও উলামায়ে কেরামের বড়ো একটা সমাবেশ অপেক্ষমান ছিলো। মাওলানা তাঁর স্বাগত ভাষণে জামেয়া দারুস সালামের পরিচয় তুলে ধরে বলেন যে, মাদরাসার এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, এখানে প্রাচীন ও আধুনিক ইলমের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। বিভিন্ন মাতদর্শের মুসলমানদের মধ্যে এ মাদরাসা ঐক্যের আহ্বায়ক। সুতরাং এখানে বিভিন্ন মাযহাবের ছাত্র চিনি-দুধে একাকার হয়ে পাঠ গ্রহণ করে। এছাড়া এ মাদরাসায় অমুসলিমদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার প্রতিও বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

আমি আমার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বক্তব্যে এসমস্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগের সর্মথন ও প্রশংসা করার সাথে সাথে নিবেদন করি যে, বিশেষভাবে প্রথম দু'টি বিষয় যে পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ, সে পরিমাণ স্পর্শকাতরও। এসব মাকসাদ হাসিলের জন্যে কী কী মুলনীতি সামনে রাখা জরুরী, আমি সংক্ষেপে তার উপর আলোকপাত করি। তারা মুক্তমনে আমার কথাগুলো গ্রহণ করেন। বরং বলেন যে, তারা এ রেখার উপরেই কাজ করে যাচ্ছেন।

তারপর আমরা প্রনামবটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। শুরুর দিকে এ শহরকে 'পেয়ারামপেট' বলা হতো। পরবর্তীতে তার নাম হয় 'প্রনামবট'। আমি শিশু কাল থেকে এ নামগুলোর সাথে পরিচিত ছিলাম। কারণ, এখানে হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব নামে একজন বড়ো আলেম ও বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ.-এর সঙ্গে ইসলাহী তায়াল্লুক রাখতেন। হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ.-এর উত্তরমূলক পত্রের মধ্যে আমরা অনেক সময় তার নামের খাম দেখতাম। তার উপর পেয়ারামপেট বা প্রনামবট ঠিকানা লেখা থাকতো। তাঁরই এক প্রশ্নের উত্তরে আমি সর্বপ্রথম বিস্তারিত ফাতাওয়া লিখেছিলাম। তিনি হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ.-এর নিকট পবিত্র রমাযান মাসে তাহাজ্জুদের জামাত জায়েয বা নাজায়েয হওয়ার বিষয়ে একটি প্রশ্ন পাঠিয়েছিলেন। আমি সে বছর মিশকাত শরীফ পড়ে ছুটির সময় বাড়িতে এসেছিলাম। হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. আমাকে এ বিষয়ে বিভিন্ন কিতাব থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করার হুকুম দেন। আমি উদ্ধৃতি সংগ্রহের সাথে সাথে উত্তর লেখারও চেষ্টা করি। সংশোধনের জন্যে হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ.-এর নিকট পেশ করি। তিনি সামান্য পরিবর্তনের পর তা ফাতাওয়া হিসাবে পাঠিয়ে দেন।

১৯৬৪ ঈসায়ীতে হযরত ওয়ালেদ সাহেব (কু.সি.) তাঁর দাওয়াতেই মাদ্রাজ তাশরীফ এনেছিলেন এবং প্রনামবটে কয়েকদিন অবস্থান করেছিলেন। এখন মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেবের সাহেবযাদা জনাব মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব (মু.যি.) এ এলাকার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। লোকেরা বলছিলো যে,

তিনি চেহারা–সুরত ও স্বভাব–চরিত্র উভয় দিক থেকে তার বাবার মতো। তার সর্ম্পকে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তিনি কোথাও যান না। কিন্তু তিনি এ বান্দার সাথে সাক্ষাত করার জন্যে আম্বুরে তাশরীফ এনেছিলেন। আমার নিজেরও সেখানে যাওয়ার আগ্রহ ছিলো। সর্বপ্রথম আমরা হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাদরাসা 'ওসিয়্যাতুল উলূমে' যাই। সেখানে ছাত্র ও উস্তাযদের উদ্দেশ্যে বয়ান হয়। তারপর এখানকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী সাইয়্যেদ আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব তার বাড়িতে দুপুরের খানা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন। হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেবের সে বাড়ি দেখারও আমার আগ্রহ ছিলো, যেখানে আমার ওয়ালেদ মাজেদ (কু.দি.) অবস্থান করেছিলেন। বর্তমানে সেখানে মুফতী সাঈদ আহমাদ সাহেব বাস করেন। তিনি বাড়ির উপর তলায় সে সাদামাটা কামরাটিও দেখান, যেখানে হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. অবস্থান করেছিলেন। আমার শিশুকালের এ কথা স্মরণ আছে যে, হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. যখন মাদ্রাজ থেকে ফিরছিলেন, তখন আমার ভাই দেওবন্দ স্টেশনে এগিয়ে আনার জন্যে গিয়েছিলেন। আমারও যাওয়ার আগ্রহ ছিলো। কিন্তু ঠিক সে মুহূর্তে কোন কারণে আমার হাত পুড়ে যায়। যে কারণে আমি যেতে পারিনি। ফলে আমার ব্যথা দ্বিগুণ হয়ে যায়। তারপর যখন হযরত ওয়ালেদ সাহেব রহ. বাড়িতে প্রবেশ করেন, তখন সর্বপ্রথম তিনি আমাকে কোলে নিয়ে আদর করেছিলেন। সে সময় আমার বয়স তিন বছরের থেকে একটু বেশি ছিলো। কিন্তু সে দৃশ্যটি আজও আমার এমনভাবে স্বরণ আছে, যেন তা কালকের ঘটনা।

প্রনামবটে যাদের সাথে সাক্ষাত হয়, তাদের মধ্যে জনাব হাকীম রজিউদ্দীন সাহেবও ছিলেন। তিনি বলেন যে, তিনি ইউনানী চিকিৎসার একটি হাসপাতাল চালাচ্ছেন। এমন চল্লিশটি হাসপাতাল দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। সেগুলোর সাথে তিব্বিয়া কলেজও রয়েছে। এর দ্বারা জানতে পারি যে, হিন্দুস্তানে ইউনানী চিকিৎসার প্রসার ঘটানোর জন্যে ভালো কাজ হচ্ছে। এ সব প্রতিষ্ঠান সেখানের অধিবাসীদের সহজলভ্য দেশীয় ঔষধের মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিয়ে থাকে।

মাগরিবের পর এখানের চক মসজিদে জনসাধারনের এক বিরাট সমাবেশ ছিলো। সেখানে সাধারন মানুষের উপযোগী বয়ান হয়। ইশার নামায ও রাতের খানার পর সেখান থেকে আম্বুরে আমার অবস্থানস্থলে ফিরে আসি।

১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় এলাকার সবচেয়ে বড়ো মাদরাসা 'রফিকুল উলূমে' যাই। মাদরাসাটি বিস্তৃত জায়গায় আবাসিক ব্যবস্থাসহ প্রতিষ্ঠিত। হযরত মাওলানা মুফতী সাবীল সাহেব (মু.যি.) এর মুহতামিম।

আজকে তিনি এখানে উলামায়ে কেরামের বড়ো একটি ইজতিমার আয়োজন করেছেন। দূর–দূরান্ত থেকে বহু সংখ্যক উলামায়ে কেরাম তাতে অংশগ্রহণ করেন। এখানে আলেম–উলামা ও মাদরাসার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রায় দেড় ঘণ্টা বয়ান হয়।

আম্বুর থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে 'ওয়ানামবাড়ি' নামে একটি শহর রয়েছে। হায়দার আলী রহ. এবং সুলতান টিপু রহ.-এর ইংরেজ ও মারাঠাদের সঙ্গে যেসব যুদ্ধ হয়েছে, সেগুলোতে এ শহরের সামরিক গুরুত্ব ছিলো। শহরটিতে এখনো মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুরু থেকেই এ অঞ্চল পাকিস্তানের সমর্থক হিসেবে প্রসিদ্ধ। এখনো এখানের একটি রোডের নাম মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহ রোড, একটির নাম আল্লামা ইকবাল রোড, আরেকটির নাম মোহাম্মাদ আলী জওহর রোড। বৃহস্পতিবার বিকালে মাগরিবের পূর্বে আমরা এখানকার প্রাচীন মাদরাসা 'মা'দানুল উলূমে' যাই। মাগরিবের পর আরেকটি বড়ো মাদরাসা ইহইয়াউল উলূমে বয়ান হয়। এখানকার আলেমগণ বলেন- এ শহরে কতিপয় লোক কুরআনে কারীমকে শুধু তরজমার ভিত্তিতে মুফাসসীরীন থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ হয়ে পড়া ও বোঝার দাওয়াত দিয়ে থাকে। তার ফলে পূর্বের মনীষীগণের তাফসীরকে অর্থহীন সাব্যস্ত করে নিজেদের মতানুযায়ী শরীয়তের বিধি-বিধানের বিকৃতি করে থাকে। এ কারণে এখানে কুরআন বোঝার মূলনীতির উপর বিস্তারিত বয়ান হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

কর্ণাটকে

পরেরদিন ছিল জুমাবার। হাজী ফারুক সাহেব আম্বুরের মসজিদে জুমা পড়াকে মূল প্রোগ্রামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তারপর বিকেলে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে দুই দিন সেখান অবস্থান করা হবে। কিন্তু ব্যাঙ্গালোরের প্রোগ্রাম একদিন বৃদ্ধি করে আমার সুলতান টিপু শহীদ রহ.-এর শহর সরঙ্গাপটমে যাওয়ার ইচ্ছা ছিলো। এ কারণে প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে আমরা ওয়ানামবাড়ি থেকে ইশার নামাযের পর গাড়িতে করে ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং দুই ঘন্টা সফর করার পর রাত বারোটায় ব্যাঙ্গালোর শহরে প্রবেশ করি। আমাদের মেযবান হাজী ফারুক সাহেবের এখানেও সুন্দর একটি বাড়ি রয়েছে। সেখানে আমরা অবস্থান করি।

সুলতান টিপু শহীদ রহ.-এর শহর শ্রীরাঙ্গাপাটনামে যাওয়ার জন্যে আমরা ১৬ই জুলাই জুমার দিনটি ব্যাঙ্গলোরের প্রোগ্রামের মধ্যে যোগ করেছিলাম। হাতেগোনা কিছু বন্ধু ছাড়া এ প্রোগ্রাম সম্পর্কে অন্য কেউ জানতো না। বিধায় এই একটা দিন নীরবে সফর করে ফিরে আসার ইচ্ছা করেছিলাম। দূরত্ব ছিলো অনেক। জুমা সেখানেই পড়তে হবে। দুপুরের খানার পর আমার কিছু সময়

বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। এ কারণে ব্যাঙ্গালোরের মাওলানা শাব্বীর সাহেব জানান যে, সেখানকার 'দারুল উমুর' নামক প্রতিষ্ঠানে দুপুরের খানা এবং আরামের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদেরকে তাকীদ করে বলা হয়েছে যে, এ সফরের সংবাদ যেন প্রচার করা না হয়। যাতে ভীড় না হয়। সুতরাং আমরা সকাল সাড়ে নয়টার দিকে রওয়ানা হই। প্রায় আড়াই ঘণ্টার পথ গাড়িতে অতিক্রম করি। এ পুরো পথ সবুজ-শ্যামল ও মনোমুগ্ধকর উপত্যকার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। যা দেখে নয়ন–মণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। এসব প্রান্তরে হায়দার আলী রহ. ও সুলতান টিপু রহ.-এর দৌড়-ঝাঁপ কল্পনার চোখে ভাসতে থাকে।

সুলতান টিপুর শহরে

সুলতান টিপুর শহরের নাম 'সরঙ্গাপটম'। ইতিহাসে আমরা এ নামই পড়েছি, কিন্তু এখানকার লোকেরা তাকে শ্রীরাঙ্গাপাটনাম বলে। নতুন কিছু ইতিহাস গ্রন্থেও এনাম লেখা হয়েছে। আমরা যখন সেখানে পৌঁছি, জুমার সময় তখন ঘনিয়ে এসেছে। 'দারুল উমুরে' পৌঁছে নামাযের প্রস্তুতি নেয়ার ইচ্ছা ছিলো। যদিও এ সফর সম্পর্কে প্রচার করতে নিষেধ করা হয়েছিলো, কিন্তু দারুল উমুরে পৌঁছে অনেক মানুষের ভীড় দেখতে পাই। জানতে পারলাম যে, এরা যে কোন উপায়ে খবর পেয়ে মহীশুর থেকে এখানে এসেছে। উযু করে আমরা মসজিদে আকসায় যাই। এখানকার ইমাম সাহেব আমাকে জুমার বয়ান করার জন্যে এবং জুমার নামায পড়ানোর জন্যে বলেন। বয়ানের মধ্যে আমি নিবেদন করি যে, সুলতান টিপু রহ.-এর জীবন থেকে আমাদের এ শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, যে কাজ আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইখলাসের সাথে সম্পাদন করা হয় তাকে কখনো ব্যর্থ বলা যায় না। সুলতান টিপু রহ. ইখলাসের সাথে দ্বীনের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আল্লাহ প্রদত্ত রাজত্ব রক্ষার জন্যে নিজের জান বাজি রেখেছেন। গাদ্দাররা গাদ্দারী না করলে হিন্দুস্তান থেকে ইংরেজদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার যোগ্যতা তার মধ্যে ছিলো। গাদ্দারীর ফলে তিনি এ লক্ষ্যে কামিয়াব হতে পারেননি ঠিক, কিন্তু আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর জীবন কামিয়াব। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তাআলা ও তার নেক বান্দাদের সঙ্গে গাদ্দারী করে তার শত্রুউদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়, তাদের খারাপ পরিণতি অনেক সময় দুনিয়াতেই দেখিয়ে দেওয়া হয়। মীর সাদিকের গাদ্দারীর পরিণতি এরই একটি শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত। যে সুলতান টিপুর বিরুদ্ধে সে ষড়যন্ত্রের জাল বুনে ছিলো, তিনি তো শাহাদাতের উঁচু মাকাম লাভ করলেন, আর মীর সাদিক তাঁর আগেই নিহত হয়ে এমনভাবে শূলিতে ঝোলে যে, তার লাশ নামিয়ে আনারও কোন লোক ছিলো না। বয়ানের পর সে মসজিদেই খুৎবা দেয়ার এবং জুমার নামায পড়ানোর সৌভাগ্য হয়।

নামাযের পর সুলতান হায়দার আলী ও সুলতান টিপু রহ.-এর মাযার যিয়ারতের সময় অন্তরে আবেগ-উদ্দীপনার বিস্ময়কর এক ভাব বিরাজ করছিলো। আল্লাহ তাআলা অবিরত তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। তাঁরা এই শেষ যুগে ন্যায়বিচারক মুসলমান বাদশাহদের একটি নমুনা দেখিয়েছিলেন। সুলতান টিপু রহ. একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি এমন সময় ক্ষমতা হাতে নেন, যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীশক্তি এক এক করে হিন্দুস্তানের বিভিন্ন ভূখন্ড দখল করে চলছিলো। টিপু বাল্যকাল থেকে ইংরেজ ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিবেশে বড়ো হয়ে ওঠেন। পিতার মৃত্যুর পর যুদ্ধচলাকালীন অবস্থায় রাজ্য সামলান। এতদসত্ত্বেও তিনি আল্লাহ প্রদত্ত মহীশুর রাজ্যকে একটি আধুনিক ও উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে কোনরূপ ত্রুটি করেননি। দেশে উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন। অনেক গ্রন্থ রচনা করান। অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শক্তিশালী নৌবাহিনী তৈরী করেন। প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। উর্দূ পত্রিকা চালু করেন। পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা করেন। অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার এমন পন্থা উদ্ভাবন করেন, যার দ্বারা দেশের উন্নতিতে সহযোগিতা হয়। দেশে সেচ্ছাচারী রাজত্বের পরিবর্তে ইসলামী শুরা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। মজলিশে শুরা প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের বিস্তৃত গোমরাহী ও অজ্ঞতানির্ভর প্রচলিত প্রথাসমূহ বিলুপ্ত করেন। ইসলামী শরীয়তের বিধান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষের মধ্যে ইংরেজদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদী জযবা সৃষ্টি করেন। এর জন্যে নিত্যনতুন অস্ত্র তৈরী করেন। প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনিই রকেট আবিষ্কার করেন। ইংরেজদেরকে হিন্দুস্তান থেকে বিতাড়নের জন্যে আন্তর্জাতিক বিশ্বে যোগাযোগ বৃদ্ধি করেন। এ উদ্দেশ্যে অনেক জায়গায় দূত প্রেরণ করেন। মোটকথা, সব দিক থেকেই তিনি এই শেষ যুগে একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্রের নমুনা তুলে ধরেছিলেন।

তিনি অনেক যুদ্ধে ইংরেজদের দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছেন। তাই ইংরেজদের ভালো করেই জানা ছিলো যে, তারা সম্মুখযুদ্ধে টিপুকে নত করতে পারবে না। তাই পরিশেষে তারা পার্শ্ববর্তী নবাব ও ভিতরের এমন গাদ্দারদের খুঁজতে থাকে, যারা পিছন থেকে তার সংকল্পে ছোরা বিদ্ধ করবে। এমনকি যখন গাদ্দারীর ফলে ইংরেজ সৈন্যরা তার শহরে প্রবেশ করে, তখন কিছু লোক তাকে পরামর্শ দেয় যে, তিনি অস্ত্র সমর্পন করলে ইংরেজরা তাকে সসম্মানে জীবন যাপনের সুযোগ দিবে। তখন তিনি সেই ঐতিহাসিক বাক্যটি বলেছিলেন– 'শৃগালের হাজার বছরের জীবন থেকে সিংহের একদিনের জীবনই শ্রেষ্ঠ'। অবশেষে তিনি সত্যের জন্যে জান কোরবান করার এমন ইতহাস সৃষ্টি করেন, যা পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ইকবাল মরহুম এঁদের সম্পর্কেই বলেছেন–

آں شہیدان محبت را امام * آبروئے ہند و چین و روم و شام

نامش از خورشید و مہ تابندہ تر * خاک قبرش از من و تو زندہ تر

عشق رازے بود بر صحرا نہاد * تو نہ دانی جاں چہ مشتاقانہ داد

از نگاہ خواجۂ بدر و حنین * فقر سلطاں وارث جذب حسین

رفت سلطاں زیں سرائے ہفت روز * نوبت او در دکن باقی ہنوز

'এ শহীদরাই ভালোবাসার ইমাম,
ভারত, চীন, রোম ও শামের সম্ভ্রম।
তাদের নাম চন্দ্র-সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল।
তাদের কবরের মাটি
আমার তোমার থেকে অধিক জীবন্ত।
যুদ্ধের ময়দানে তারা
প্রেমের রহস্য উম্মোচন করেছেন।
তুমি জানো না, কী পাগলপারা হয়ে
তারা প্রাণ দান করেছেন!
বদর ও হুনাইনের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর
দৃষ্টির আলো থেকে তারা
রাজত্বের মধ্যে দরিদ্রতা ও
হুসাইনের প্রেমের
উওরাধিকার লাভ করেছেন।
নশ্বর এ পৃথিবী থেকে
সে বাদশাহ চলে গেছেন।
কিন্তু দাক্ষিণাত্যে সে ধারা
আজো অব্যাহত রয়েছে।'

মাযারের নিকটেই একটি যাদুঘর বানানো হয়েছে। তার মধ্যে সুলতান শহীদ রহ.-এর অনেক স্মৃতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। তার মধ্যে সেই 'কাবা' (ঢোলা জামা বিশেষ)-ও রয়েছে, যা শেষ সময়ে তিনি পরিধান করেছিলেন। তার উপর এখনোও রক্তের ছোপ ছোপ দাগ রয়েছে।

بنا کردند خوش رسمے بہ خون خاک غلطیدن

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

‘রক্ত ও মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়ার
এক অপূর্ব প্রথা তারা চালু করেছেন।
এ পুণ্যাত্মা প্রেমিকদের উপর
আল্লাহ রহমত নাযিল করুন।’

এখান থেকে পুনরায় আমরা ‘দারুল উমুরে’ যাই। দারুল উমুর প্রতিষ্ঠা করা সুলতান টিপু রহ.-এরই স্বপ্ন ছিলো। তাঁর মাথায় এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ছিলো, যার মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়ার উভয় প্রকারের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। কতক ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, ‘জামেউল উমুর’ নামে তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। বর্তমানে হযরত মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর প্রস্তাব ও ইঙ্গিতে সে নামেই এ প্রতিষ্ঠান কায়েম করা হয়েছে। যার মধ্যে এক ডজন ছাত্র দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করছে। জনাব আব্দুর রহমান কমার উদ্দীন সাহেব এর নাযেম। তিনি অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে আমাদেরকে স্বাগত জানান। আমরা জুমার নামায পড়ে যখন এখানে আসি, তখন দারুল উমুরের ভবন আলেম, তালিবে ইলম ও সাধারণ মুসলমানদের দ্বারা ভরে গিয়েছিলো। আমাদের আগমনের সংবাদ শুনে তারা মহীশুর থেকে এখানে এসেছেন। এখানে শ্রীরাঙ্গাপাটনাম ও মহীশুরের গণ্যমান্য অনেকের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তাদের মধ্যে জনাব প্রফেসর বী আলী শাইখ সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ব্যাঙ্গালোর ইউনির্ভাসিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় লিখিত অনেক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক। তিনি সুলতান টিপু রহ.-এর ইতিহাসের উপর বিশেষ গবেষণামূলক কাজ করেছেন। বর্তমানে এখান থেকে প্রকাশিত উর্দু ‘সালার’ পত্রিকার সম্পাদক। তিনি তার কিতাবসমূহের একটি সেট আমাকে দান করেন। আমাদের শ্রীরাঙ্গাপাটনাম সফরের বিস্তারিত বিবরণ ‘সালার’ পত্রিকায় প্রধান শিরোনামে প্রকাশ করেন।

আছরের নামাযের পর আমরা সুলতান টিপু রহ.-কর্তৃক নির্মিত ঐতিহাসিক মসজিদ ‘মসজিদে আ’লা’ দেখতে যাই। মসজিদটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ এবং মজবুতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। দূর থেকে তার মিনার দেখা যাচ্ছিলো। মসজিদভবনের দু’টি অংশ রয়েছে। নিচের অংশে রয়েছে ওযুখানা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ। আর উপরের অংশে রয়েছে মসজিদ। উপরে যাওয়ার জন্যে অনেকগুলো সিঁড়ি রয়েছে। মেহরাবে একটি ফলক রয়েছে। তার মধ্যে

ফার্সি কবিতায় মসজিদের নির্মাণ সন ১২০২ হিজরী লেখা রয়েছে। মসজিদের একটি দেওয়ালে আরেকটি ফলক রয়েছে। তাতে সূরায়ে আহযাবের বনী কুরাইযার অবরোধ সম্পর্কে অবতীর্ণ নিম্নের আয়াতটি লেখা রয়েছে-

وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا.

'কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে (অর্থাৎ মুসলিমদের শত্রুদেরকে) সাহায্য করেছিলো, আল্লাহ তাদেরকে তাদের দুর্গ থেকে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চার করলেন যে, (হে মুসলিমগণ!) তাদের কতককে তো তোমরা হত্যা করেছিলে আর কতককে করেছিলে বন্দী। আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়ারিস বানিয়ে দিলেন তাদের ভূমি, ঘর-বাড়ি ও অর্থ-সম্পদের এবং এমন ভূমির, যে পর্যন্ত এখনও তোমাদের কদম পৌঁছেনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (সূরা আহ্যাব, আয়াত: ২৬-২৭)

উত্তর দেয়ালে আরেকটি ফলক রয়েছে। তাতে কুরাইশ বংশের ফযীলত সম্পর্কিত এ হাদীসটি লেখা রয়েছে-

الناس تبع لقريش فى هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم و كافرهم تبع لكافرهم. (متفق عليه)

'এ (শাসন ক্ষমতার) বিষয়ে মানুষ কুরাইশের অনুগামী। তাদের মধ্যে যারা মুসলমান রয়েছে তারা কুরাইশ মুসলমানদের অনুগামী, আর যারা কাফের রয়েছে তারা কুরাইশ কাফেরদের অনুগামী।'

কতক ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, এ মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, 'সাহেবে তরতীব' ব্যক্তি- অর্থাৎ যার জিম্মায় কোন নামায কাযা নেই, সে এ মসজিদের প্রথম নামাযের ইমামতি করবে। মসজিদের উদ্বোধনের সময় অনেক আলেম ও নেককার লোক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেউ তার নিজের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলতে পারছিলেন না যে, তিনি 'সাহেবে তরতীব'। অবশেষে সুলতান টিপু নিজেকে 'সাহেবে তরতীব' বলেন এবং তিনিই নামায পড়ান। এরপর থেকে সুলতান টিপু রহ. এ মসজিদেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতেন। শাহাদত বরণের দিনও তিনি ফজরের নামায এ মসজিদেই পড়েছেন। মহল থেকে মসজিদে আসার জন্যে তিনি সাধারণের

চলাচলের পথ দিয়ে আসা এ জন্যে পছন্দ করতেন না যে, তার আসার কারণে কাতারে উপবিষ্ট লোকদের ইবাদতে বিঘ্ন ঘটবে। সুতরাং তিনি কেবলার দিকের দেয়ালের কাছে উত্তর দেয়ালের একটি দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেন। এখন তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদের আঙ্গিনায় একটি সূর্যঘড়ি বসানো রয়েছে। তা দ্বারা নামাযের সময় নির্ধারণ করা হতো। আঙ্গিনায় দাঁড়ালে শ্রীরাঙ্গাপাটনামের দুর্গের কিছু দেয়ালও দেখা যায়। মসজিদের পূর্ব দিকে ছোট একটি সড়ক রয়েছে। সেই সড়ক ধরে এক-দেড় কিলোমিটার অগ্রসর হলে ডানদিকে একটি বেষ্টনী রয়েছে। তার মধ্যে একটি ফলক লাগানো রয়েছে। তাতে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে যে, সুলতান টিপু রহ.-এর লাশ এখানে পাওয়া গেছে। যেন এটি তাঁর শাহাদতবরণের জায়গা। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন।

ব্যাঙ্গালোরে

আমরা আছরের নামাযের পর শ্রীরাঙ্গাপাটনাম থেকে রওয়ানা হই। পথে একটি শহরের সুন্দর একটি মসজিদে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে মাগরিবের নামায আদায় করি। তারপর রাত নয়টার দিকে ব্যাঙ্গালোরে আমাদের অবস্থানস্থলে পৌঁছি। ব্যাঙ্গালোর এক সময় নবাব হায়দার আলী ও সুলতান টিপুর রাজ্য মহীশুরের অংশ ছিলো। এখন এটি কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী। অত্যন্ত সবুজ-শ্যামল হওয়ায় একে 'গুলিস্তান' শহর বলা হয়। কিছুটা উচুঁতে হওয়ার কারণে এখানকার ঋতুও সাধারণত অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ও শীতল হয়ে থাকে। আমার তিনদিনের অবস্থানকালে যখন আমি ফজরের নামাযের পর কোন ঝিলের তীরে অথবা কোন পার্কে প্রাতঃভ্রমণ করতাম, তখন অত্যন্ত ভাবোদ্দীপক বায়ুর হালকা দোলায় শরীর সিক্ত হয়ে উঠতো। নগরায়নের দিক থেকেও এটি হিন্দুস্তানের সেই হাতেগোনা কয়েকটি শহরের অন্যতম, যেগুলো দ্রুত উন্নতি করছে। বিশেষকরে তথ্য-প্রযুক্তিতে এ শহরটি অত্যন্ত বিখ্যাত। তামিলনাড়ু থেকে ব্যাঙ্গালোরে আসার পথে সর্বপ্রথম আমাদের ইলেকট্রনিক্স সিটির নজরকাড়া ভবনসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। তারপর আমরা বারো কিলোমিটার লম্বা ফ্লাইওভার অতিক্রম করে শহরের মধ্যবর্তী এলাকায় প্রবেশ করি। শহরের অধিবাসী এক কোটির কাছাকাছি। তার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা পঁচিশ লাখের মতো। বলা হয় যে, ব্যাঙ্গালোর জেলায় প্রায় নয়শ' মসজিদ রয়েছে। তার মধ্যে বেশিরভাগ মসজিদ অত্যন্ত রুচীসম্মতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে ব্যবসা ছাড়া সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রেও মুসলমানদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য। কয়েকজন উচ্চপদস্থ মুসলমান অফিসারের সঙ্গে এখানে সাক্ষাত হয়। তাদের মধ্যে ডঃ

নেছার আহমাদ সাহেব (এডিশনাল কমিশনার পুলিশ) ও সানাউল্লাহ সাহেব (ইন্ডিয়ান এ্যাডমিনিস্ট্র্যাটিক সার্ভিস) তাঁরা আমার অবস্থানকালে সবধরনের আরামের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে উত্তম বিনিময় দিন। আমীন।

ব্যাঙ্গালোরে এসে দেখি, এখানকার উর্দু পত্রিকাগুলো আমাদের সফরের বিস্তারিত বিবরণে পরিপূর্ণ। কতক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় অভ্যর্থনামূলক বাক্য 'হাইলাইট' করা ছিলো। কেউ কেউ পরিচিতিমূলক কলাম লিখেছেন। আগামী দুই দিনের প্রোগ্রাম তো সব পত্রিকাই ছেপেছিলো।

১৭ই জুলাই শনিবার সকাল দশটায় এখানকার দারুল উলূম শাহ ওলিউল্লাহ মাদরাসায় আলেমদের একটি বিশেষ সমাবেশ রাখা হয়েছিলো। এখানে কর্ণাটকেরই শুধু নয়, বরং অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রদেশের আলেমগণও তাশরীফ এনেছিলেন। সভাস্থল মানুষে গিজগিজ করছিলো। মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা যাইনুল আবেদীন সাহেব অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে স্বাগত জানান। তিনি তার পরিচিতিমূলক বক্তব্যে প্রশংসাপত্র পাঠ করতে গিয়ে আবেগের আতিশয্যে অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠেন। 'আল কুল্লিয়্যাতুস সাউদিয়্যাহ' এর মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান সাহেব একজন মধুকণ্ঠী কবি। তিনি নিখাঁদ হিন্দুস্তানী ভাষায় 'মুফতী তাকী জী' শিরোনামে একটি কবিতা পাঠ করে অনেক প্রশংসা কুড়ান। কবিতাটি আমার অতিরঞ্জনমূলক প্রশস্তি সম্বলিত না হলে ভাষার মাধুর্য, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার সূক্ষ্মতার কারণে এখানে উদ্ধৃত করতাম।

তারপর প্রায় একঘণ্টা আমি কিছু কথা নিবেদন করি। সেখানে আমি আমার এ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করি যে, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে হিন্দুস্তানের যেসব এলাকাতে আমার যাওয়া হয়েছে, সেগুলোতে মুসলমানদেরকে নিজেদের দ্বীনের সংরক্ষণের ব্যাপারে তৎপর পেয়েছি। এতে এখানকার উলামায়ে কেরামের যে মূল্যবান ভূমিকা চোখে পড়েছে তা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। তার সাথে সাথে যেসব বিষয়ের দিকে অত্যাধিক গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন, সেগুলোর মধ্যে ইসলামী মুয়াশারাত ও আখলাকী তালীম বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আমি এ কথাও তুলে ধরি যে, পশ্চিমা সভ্যতা নারী স্বাধীনতার নামে যে ধোঁকার ফাঁদ বিস্তার করেছে, আল্লাহর মেহেরবানীতে আমাদের পক্ষ থেকে তা যথেষ্ট পরিমাণে খন্ডন করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ের ইতিবাচক দিক এই যে, ইসলাম নারীদেরকে যে অধিকার দিয়েছে, তার অনেকগুলো আমাদের সমাজে পদদলিত হচ্ছে। যেমন শরীয়তের বিধান মতে তাদেরকে উত্তরাধিকার সম্পদ দেওয়ার প্রচলন খুব কম। তাছাড়া বিবাহ-

শাদীতে সামাজিক প্রচলনকে শরীয়তের বিধানের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যার ফলে তাদের হক পদদলিত হয়। এ প্রয়োজনকে সামনে রেখে আমাদের বুযুর্গগণ এমন সময় বিধবাবিবাহের আন্দোলন চালান, যখন সমাজে বিধবা নারীর বিবাহ করাকে অত্যন্ত দোষণীয় মনে করা হতো। এমনিভাবে আরো যতো গলদ প্রথা সমাজে ছড়িয়ে আছে, সেগুলোর সামনে অস্ত্র সমর্পণ না করে আলেমগণকে সেগুলো সংশোধনের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি প্রদান করতে হবে।

দারুল উলূম সাবীলুর রাশাদ ব্যাঙ্গালোরের সবচেয়ে প্রাচীন মাদরাসা। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী সাহেব তার মুহতামিম। তিনি মাদ্রাজে এসেও দেখা করেছিলেন। তার মাদরাসায় আসার দাওয়াত দিয়েছিলেন। শাহ ওলিউল্লাহ মাদরাসায় দুপুরে খানা খাওয়ার পর আমরা দারুল উলূম সাবীলুর রাশাদে যাই। যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ, সুন্দর ভবনসমূহ, উন্নতমানের প্রন্থাগার ও সুব্যবস্থাপনা দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হই। এখানেও উস্তায ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বয়ান হয়।

মাওলানা শাব্বীর সাহেব দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা থেকে শিক্ষা সমাপন করেছেন। তিনি ছায়ার মতো সব সময় আমার সাথে ছিলেন। তিনি ইসলাহুল বানাত নামে একটি আবাসিক মাদরাসা করেছেন। এখানে মহিলাদেরকে এক-দু বছরের তালীম ও তারবিয়াতী কোর্স করানো হয়। তা অত্যন্ত উপকারী হচ্ছে বলে জানতে পারি। আছরের নামাযের পর সে মাদরাসাতেও যাই। মহিলাদের উদ্দেশ্যে বয়ান হয়। মাগরিবের নামায সেখানেই আদায় করি। মাগরিবের পর ব্যাঙ্গালোরের একটি অডিটোরিয়াম অমিতগড়ভবনে আধুনিক শিক্ষিতদের জন্যে বিশেষ একটি সমাবেশ রাখা হয়েছিলো। সেখানে উকিল, অর্থনীতিবিদ, সরকারী অফিসার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদেরকে দাওয়াত করা হয়েছিলো। এখানে মাগরিব থেকে ইশা পর্যন্ত উর্দূতে বয়ান হয়। তাতে আমি নিম্নের আয়াতের উপর আলোচনা করি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

إِنَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَاتَكُنْ لِلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا

‘নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি সত্য-সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছি, যাতে আল্লাহ তোমাকে যে উপলব্ধি দিয়েছেন, সে অনুযায়ী মানুষের মধ্যে মিমাংসা করতে পারো। আর তুমি খেয়ানতকারীদের পক্ষাবলম্বন করো না।’ (সূরা নিসা, আয়তি: ১০৫)

আমি নিবেদন করি যে, এ আয়াতে লেজিসলেচার (legislature), আদালত ও উকিল এ তিন শ্রেণীর লোকের জন্যেই সামগ্রিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হেদায়ত রয়েছে। তারপর আমি এ প্রশ্নেরও উত্তর দেই যে, পরিবর্তনশীল এ জীবনে চৌদ্দশ' বছরের পুরাতন শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা কী করে কার্যকর হতে পারে?

পরেরদিন ১৮ই জুলাই রবিবার মাসীহুল উলূম মাদরাসার দস্তারবন্দীর সমাবেশ ছিলো। মাদরাসাটি শহরের বাইরে। মাদরাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা মুফতী শুয়াইব উল্লাহ সাহেব (মু.যি.) আমার শাইখ হযরত মাওলানা মাসীহুল্লাহ খান সাহেব জালালাবাদী (কু.সি.)-এর হাতে বাইআত। হযরতের নামেই মাদরাসার নামকরণ করা হয়েছে 'মাসীহুল উলূম'। এখানে এসে দেখি বিরাট এক সমাবেশ অত্যন্ত আবেগ-উদ্দীপনা নিয়ে অপেক্ষা করছে। কুরআন তিলাওয়াতের পর এখানকার এক তালিবে ইলম আমার রচিত দোয়া সম্বলিত কবিতা 'দারবার মেঁ হাযির হ্যায় এক বান্দায়ে আওয়ারা' অত্যন্ত বেদনার্ত সুরে পাঠ করে শোনায়। মাওলানা শিব্বীর সাহেব বললেন, এখানকার মাদরাসাগুলোর প্রত্যেক শিশুর মুখে মুখে এ কবিতা রয়েছে। প্রাথমিক কার্যক্রমের পর প্রায় সোয়া ঘণ্টা আমার বয়ান হয়।

১৮ই জুলাই ছিলো ব্যাঙ্গালোরে আমার শেষ দিন। সেদিন মাগরিবের পর এখানকার সবচেয়ে বড়ো মসজিদ কাদেরিয়াতে সাধারণ ইসলাহী বয়ানের সিদ্ধান্ত হয়েছিলো। এটি বিশাল-বিস্তৃত আড়ম্বপূর্ণ একটি মসজিদ। এর সুন্দর হলকক্ষটিও অনেক বড়ো। এর বাইরে তিনদিকে খোলা ময়দানও রয়েছে। আমরা মাগরিবের সময় সেখানে পৌঁছলে মসজিদের সামনের সড়কে ট্রাফিক জ্যাম ছিলো। কোনোমতে পার্শ্ব রাস্তা ধরে মসজিদে পৌঁছি। মসজিদের ভিতরে এবং বাইরে জনসমুদ্র যেন আছড়ে পড়ছে। আমাকে মাগরিব নামায পড়ানোর জন্যে অনুরোধ করা হয়। ব্যবস্থাপকগণ দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত সমাবেশকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে থাকেন। মসজিদের মধ্যে যতো মানুষ ছিলো, তার চেয়েও বেশি মানুষ বাইরের ময়দানে দাঁড়িয়ে ছিল। বেশ জোরে-শোরে বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তারা সেখানেই অবিচল থাকে। এ অবস্থাতেই আমার এ সফরের শেষ বয়ান হয়। ইশার নামাযের পর সেখান থেকে এমনভাবে প্রত্যাবর্তন করি যে, আমার সাথীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাদেরই একজনের কাছে আমার জুতা ছিলো। তাই আমাকে খালী পায়ে এসে গাড়িতে বসতে হয়।

এ সব তো ছিলো আনুষ্ঠানিক সমাবেশ। কিন্তু এসব সমাবেশ ছাড়াও ব্যাঙ্গালোরের অবস্থানকালে এমন মনে হচ্ছিলো, যেন প্রতিমুহূর্তে হিন্দুস্তানের দূর-দূরান্ত থেকে উলামায়ে কেরামের কাফেলা ব্যাঙ্গালোরে আসতেই আছে।

সবচেয়ে বেশি গুজরাট ও হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্য থেকে গাড়ি ভরে ভরে আলেমগণ তাশরীফ আনেন। কেউ কেউ তো কয়েকদিন ধরে সফর করে এসেছে। এছাড়া উড়িষ্যা ও বিহার থেকে এবং কিছু লোক কাশ্মীর থেকেও ট্রেন ও বিমানযোগে এসে পৌঁছেন। এ কারণে আনুষ্ঠানিক সমাবেশের আগে-পরে এবং অবস্থানস্থলে এদের সঙ্গে সাক্ষাত ও পরিচয়ের ধারা শেষ অবধি অব্যাহত থাকে। সে রাতেও একটার পরে ঘুমানোর সুযোগ হয়।

১৯শে জুলাই সোমবার ভোরে আউয়াল ওয়াক্তে ফজর নামায পড়ে পাঁচটার সময় আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। বিমান ছিলো সকাল সাতটায়। প্রায় নয়টায় মুম্বাই পৌঁছি। এখানে হযরত মাওলানা সাজ্জাদ সাহেব তার সঙ্গীদেরসহ উপস্থিত ছিলেন। আসিফ সাহেব- আসার পথে যার বাড়িতে অবস্থান করেছিলাম- দেওবন্দ চলে এসেছিলেন। দেওবন্দ থেকে ব্যাঙ্গালোর এবং মুম্বাই পর্যন্ত অবিরাম আমার সঙ্গে সফর করেছেন। দুপুর দেড়টায় মুম্বাই থেকে করাচীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে। তিনি প্রস্তাব করেন যে, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যবর্তী এক জায়গায় জনাব মনসুর মাহাত্মা সাহেবের হোটেল রয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী মুসলমান। এ সময়টা তার হোটেলে অতিবাহিত করা হলে তিনিও খুশি হবেন এবং রওয়ানা হওয়ার আগে কিছুটা বিশ্রামও হবে। সুতরাং তাই সিদ্ধান্ত হয়।

গোলাম রাসূল সাহেব- যিনি মুম্বাই আসার পথে সমস্ত আইনী কার্যক্রম সম্পাদন করেছিলেন- এবারেও বিমানবন্দরে প্রতীক্ষারত ছিলেন। তিনি আমাদের থেকে পাসপোর্ট ও ভিসার কাগজপত্র নিয়ে নেন। সব কাগজপত্র প্রস্তুত করার জন্যে অল্প সময়ে তাকে অনেক দূর যেতে হবে। সময়টি ছিলো যানজটের। এ কারণে তিনি গাড়ির পরিবর্তে মোটর সাইকেলে যাওয়াকে প্রাধান্য দেন। তিনি পুলিশ অফিসের উদ্দেশ্যে চলে যান। আমরা হোটেলে পৌঁছে যাই। এটি 'সুবা' হোটেল। এখানে পাঁচতারা হোটেলের সুবিধাদি রয়েছে। কিন্তু যেহেতু এর মালিক মদের ব্যবস্থা করা ও অন্যান্য নাজায়েয বিষয় থেকে বিরত থাকেন, এ কারণে একে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঁচতারা হোটেলের মর্যাদা দেওয়া হয়নি। এর মালিক মাহাত্মা সাহেব মাশাআল্লাহ অত্যন্ত সৎ ও সদাচারী যুবক। অত্যন্ত মহব্বতের সঙ্গে সে মিলিত হয়। আমাদের জন্যে দু'টি কামরা খালি করে দেয়। এভাবে আমরা বারোটা পর্যন্ত এখানে বিশ্রামও করি এবং কিছু লোকের সঙ্গে সাক্ষাতও হয়। ইতিমধ্যে গোলাম রাসূল সাহেব তার কাজ সম্পন্ন করে আসেন। বারোটার সময় আমরা বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এখানেও ডাভেল ও গুজরাটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কিছু লোকের সমাগম হয়। তাদের প্রত্যেকের সাথে আলাদা আলাদাভাবে সাক্ষাত হয়। আল্লাহর মেহেরবানীতে সম্মিলিত দোয়ার মাধ্যমে তাদেরকে বিদায় জানাই। পি.আই.এ. এর বিমান

সরাসরি করাচী যাচ্ছিলো। এ কারণে আসার পথে যে সফর আমরা দশ ঘণ্টায় অতিক্রম করেছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ, তা পৌনে দুই ঘণ্টায় সমাপ্ত হয়। আছরের পূর্বে আমরা বাড়িতে পৌঁছি। পূর্বাপরের সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

আমাকে অনেক সফরই করতে হয়। কিন্তু সাধারণত আমি হারামাইন শরীফাইন ছাড়া কোন এক দেশে এক সপ্তাহের অধিক থাকি না। হিন্দুস্তানের জন্যে আমি অতি কষ্টে দুই সপ্তাহ বের করেছিলাম। কিন্তু এ দুই সপ্তাহ যেন চোখের পলক ফেলতেই পার হয়ে যায়। মন-মস্তিষ্কে এ সফর এমন গভীর রেখাপাত করে যে, তা ভোলা কঠিন। আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানীতে এবং বুযুর্গদের দুআয় যেখানেই যাই, সব জায়গাতেই ভালোবাসা ও সম্মান লাভ হয়। তবে এ সফরকালে আমার মুসলমান ভাইদের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে এবং উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে যে ভালোবাসা পাই, তা ছিলো অসাধারণ। হিন্দুস্তান থেকে বারো বছর ধরে অনবরত আসা চিঠি-পত্রের মাধ্যমে পূর্বেই আমার অনুমান হয়েছিলো যে, সেখানে আমার অসংখ্য মহব্বতকারী রয়েছে। সম্ভবত অন্য যে কোন জায়গা থেকে বেশি। কিন্তু একথা ধারণা করতে পারিনি যে, তাদের আত্মিক সম্পর্ক উপস্থাপনের জন্যে 'ভালোবাসা' শব্দটিও অপ্রতুল হবে। ভালোবাসা নয়, পদে পদে পাগলপারা আসক্তি প্রত্যক্ষ করি। নিশ্চয়ই আমি এমন পাগলপারা ভালোবাসা লাভের হকদার নই। এটি ছিলো তাদের সুধারণা। যাকে আমি নিজের জন্যে অবশ্যই শুভ লক্ষণ মনে করি। আমি দুআ করি, আল্লাহ তাআলা আমার মধ্যে এই নিষ্ঠাবান লোকদের বরকতে এর যোগ্যতাও সৃষ্টি করে দিন। আমীন।

হিন্দুস্তানের বেশিরভাগ উর্দু পত্রিকা আমাদের দেওবন্দ ও ব্যাঙ্গালোরের সফর ও সেখানকার সমাবেশসমূহের সংবাদ প্রধান শিরোনাম আকারে প্রকাশ করে। অনেকে এ বিষয়ে কলাম লেখেন। কয়েকটি পত্রিকায় বিভিন্নজন পরিচিতিমূলক প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। সেগুলোতে এ অধম বান্দা সম্পর্কে অসাধারণ ভালোবাসা ও অতিরঞ্জনমূলক প্রশস্তি প্রকাশ করেন। কেউ কেউ বলছিলেন যে, দেওবন্দে কোন এক ব্যক্তির এমন অভ্যর্থনা এবং তার আগমনে এমন উৎসবমুখর পরিবেশ ইতিপূর্বে হয়েছে বলে আমাদের মনে পড়ে না। এর বাহ্যিক কারণ এটাই যে, আমার সঙ্গে তাদের যে পরিচয় ঘটেছে, তা আমার কিতাব ও লেখনীর মাধ্যমে হয়েছে। এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, সেখানে আলেমগণের মধ্যেই শুধু নয়, বরং শিক্ষিত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যেও কিতাব মুতাআলার আগ্রহ অনেক বেশি। আমার অধিকাংশ কিতাব সেখানকার

বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করেছে। ব্যাপক পরিসরে তা পঠিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে দরসে তিরমিযী, তাকরীরে তিরমিযী, তাকমিলায়ে ফাতহুলমুলহিম, উলূমুল কুরআন, ফিকহী মাকালাত, ইনআমুল বারী, হযরত মুয়াবিয়া রাযি. আওর তারিখী হাকায়েক ও ইসলাম আওর জাদীদ মায়ীশাত ও তিজারাত উলামায়ে কেরামের মধ্যে অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে। যিকর ও ফিকর, হুজ্জিয়াতে হাদীস, আসান নেকীয়াঁ ও তাকলীদ কী শা'য়ী হাইসিয়্যাত সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে সমাদৃত হয়েছে। ইসলাহী খুতুবাত উভয় শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত। অনেক আলেম বলেন যে, তারা জুমার বয়ানের প্রস্তুতি এগুলোর ভিত্তিতে নিয়ে থাকেন। মহিলাদের মধ্যেও এগুলো পড়ার খুব ঝোঁক রয়েছে। সম্ভবত ইসলাহী খুতুবাতের পর আমার সফরনামা জাহান দীদাহ ও দুনিয়া মেরে আগে সর্বাধিক পঠিত কিতাব। হায়দ্রাবাদ দাক্ষিণাত্যের মুজাহিদ আলী এম.এ. আমার সফরনামার উপর গবেষণাপত্র লিখে হায়দ্রাবাদ ইউনির্ভাসিটি থেকে এম.ফিল ডিগ্রী অর্জন করেছেন। তিনি হায়দ্রাবাদ থেকে প্রবন্ধটি ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে আসেন। আমাকেও তা দেন। তিনি এ কথাও বলেন যে, এক ব্যক্তি আমার ফিক্হ বিষয়ক কিতাবসমূহের উপর পি.এইচ.ডি করছেন। এ ছাড়া এখন তাওযীহুল কুরআনও দেওবন্দ, ডাভেল, দিল্লী ও আরো কয়েক জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত মুফতী আহমাদ খানপুরী সাহেব (মু.যি.) তাঁর একসেট আমাকে উপহার দেন। আমি জানতে পারলাম যে, এটিও উলামায়ে কেরাম ও সাধারণ মুসলমান উভয়শ্রেণীর মধ্যে গুরুত্বের চোখে দেখা হচ্ছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানগণ ইংরেজী ভাষায় লিখিত আমার কিতাবসমূহ পড়ে থাকেন। আমি এ বছরের শুরুতে ওয়ার্ল্ড ইকোনোমিক ফোরাম, ডিউস-এর জন্যে যে প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তাদের মধ্যে এরও বেশ চর্চা দেখতে পাই।

মোটকথা, তারা আমাকে এসব লেখনীর মাধ্যমে চিনেছেন। যার বেশিরভাগ আমাদের বুযুর্গদের কথারই পুনরাবৃত্তি। তবে আল্লাহ তাআলার তাওফীকে সেগুলোকেই বিশেষ এক বিন্যাসে তুলনামূলক সহজ আঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে আমার ব্যক্তিগত যোগ্যতার কোন ভূমিকা নেই। কিন্তু এগুলোর কারণে তারা আমার সম্পর্কে সীমাহীন সুধারণা পোষণ করেন। দূরের ঢোল বাজে বেশি। তারা যদি আমাকে নিকট থেকে দেখতেন তাহলে আমার সব দোষ না হলেও কিছু হলেও অবশ্যই প্রকাশ পেতো। কিন্তু তারা দূর থেকে আমার কিতাবসমূহ পড়ে অতিরঞ্জনমূলক ধারণা পোষণ করে আছেন। তার ভিত্তিতে এ পাগলপারা ভালোবাসা প্রকাশ করছেন। ইমাম বাইহাকী রহ. শুয়াবুল ঈমান কিতাবে ইমাম আওযায়ী রহ.-এর অত্যন্ত উপকারী একটি কথা উদ্ধৃত করেছেন। যা এ সফরে আমার জন্যে পঠিত প্রশংসাপত্র শোনার সময় স্মরণ

হতে থাকে। কয়েক জায়গায় আমি আমার বয়ানের মধ্যে তা বর্ণনাও করেছি। ইমাম আওযায়ী রহ. বলতেন-

إذا أثنى رجل على رجل فى وجهه فليقل: اللهم أنت أعلم بى من نفسى، وأنا أعلم بنفسى من الناس، اللهم لاتؤاخذنى بما يقولون، واغفرلى مالا يعلمون.

'কোন ব্যক্তি যখন অন্য কারো মুখের উপর তার প্রশংসা করে তখন তার বলা উচিত যে, হে আল্লাহ! আপনি আমার সম্পর্কে আমার চেয়ে ভালো জানেন। আর আমি আমার সম্পর্কে তাদের চেয়ে অধিক জানি। এ কারণে হে আল্লাহ! তারা যে কথা বলছে, সে জন্যে আমাকে পাকড়াও করবেন না এবং যেসব বিষয় (অর্থাৎ, আমার দোষসমূহ) তারা জানে না, আমার সে সব বিষয় মাফ করে দিন।' (শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকীকৃত, বাবুন ফী হিফযিল লিসান, ৪/৭১২)

লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে খেদমতকারীদের জন্যে মানুষের প্রশংসা একটি ফিৎনার চেয়ে কম নয়। এ কারণেই মুখের উপর প্রশংসা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এতে করে মানুষের মধ্যে আত্মশ্লাঘার ব্যাধি জন্মায়। হযরত ইমাম আওযায়ী রহ. এই ব্যাধির চিকিৎসাকল্পে উৎকৃষ্টতম এ দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। আমার শাইখ হযরত আরেফী (কু.সি.)-ও এর কাছাকাছি কথা বলতেন। তিনি বলতেন- কেউ তোমার প্রশংসা করলে তুমি মনে মনে বলো- হে আল্লাহ! আপনার শোকর যে, আপনি তার সামনে আমার ভালো গুণ প্রকাশ করেছেন। তা না হলে আমার দোষগুলো যদি তার সামনে প্রকাশ পেতো, তাহলে আমাকে ঘৃণা করতো। তিনি আরো বলতেন যে, পদলিপ্সা ও প্রশংসাপ্রীতি প্রবৃত্তির এমন এক চাহিদা, যার তৃপ্তিসাধন প্রথমত নিজের ক্ষমতায় নয়। কারণ, তা অন্যদের কাজের উপর নির্ভরশীল। আর তা পূর্ণ হলেও প্রশংসা এমন এক ক্ষণস্থায়ী জিনিস, যা মুখ থেকে বের হয়ে বাতাসে উড়ে যায়। মানুষের এ কথা চিন্তা করা উচিত যে, এতে তার ফায়দাটা কী?

চিরস্থায়ী ও উপকারী জিনিসতো হলো সেই নেক আমল, যা কারো সুনাম বা দুর্নামের পরোয়া না করে নিখাঁদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে করা হয়।

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا و خير مردا.

'আর চিরস্থায়ী নেক আমল আল্লাহ তাআলার কাছে প্রতিদান হিসেবেও উত্তম এবং পরিণতির দিক থেকেও উত্তম।' (সূরা কাহাফ, আয়াত: ৪৬)

আসল কথা হলো, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে একথা চিন্তা করার তাওফীক দান করুন যে, সেই চিরস্থায়ী নেক আমলের তাওফীক যেন আমাদের লাভ হয়। আমীন।

হিন্দুস্তানের এ সফরে দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এই লাভ হয় যে, আল্লাহ তাআলার মেহেরবানীতে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, তাদেরকে এ দেশেই নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে টিকে থাকতে হবে। তাই তারা এর জন্যে অবিরাম চেষ্টা করে যাচ্ছেন। হিন্দুস্তান বিগত দশ বছরে অর্থনৈতিক ও নগর উন্নয়নের দিক থেকে অতি দ্রুত উন্নতি করেছে। বড়ো মাপের শিল্প, বিশেষ করে তথ্য-প্রযুক্তি ও চিকিৎসার অঙ্গনে এ দেশ বিরাট সফলতা লাভ করেছে। যোগাযোগব্যবস্থা বেশ উন্নত হয়েছে। মজবুত সড়ক ও পুল শহরের মাঝে যোগাযোগ সহজ করে দিয়েছে। এসব উন্নতির মধ্যে মুসলমানদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। তারাও এর মধ্যে মোটের উপর অংশীদার। দক্ষিণ ভারতে আমার যেসব জায়গায় যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, সেখানে মুসলমানদের দ্বীনী হালাতও বেশ উন্নত দেখতে পেয়েছি। একদিকে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে মানসম্মত দ্বীনী তালিমই শুধু হচ্ছে না, বরং পরিস্থিতির দাবি অনুপাতে তার মধ্যে বৈচিত্রও আনা হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে ইতিবাচক কাজও করে যাচ্ছে। দৃঢ়তার সঙ্গে নিত্যনতুন ফেৎনাসমূহের মোকাবেলাও করে যাচ্ছে। অপরদিকে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্ক ও সহযোগিতাও প্রশংসনীয়। তবে কতিপয় আলেম বলেন যে, উত্তর ভারতের অবস্থা দক্ষিণ ভারতের থেকে ভিন্নতর। সেখানে অমুসলিমদের সাথে মেলামেশার ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে অনেক খারাপ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যেগুলো বন্ধ করার জন্যে অনেক মেহনত করা প্রয়োজন। উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার লোকেরা তাদের সামর্থ্য মোতাবেক এ পথ বন্ধ করার চেষ্টা করছেন।

এ বিষয়টিও সুস্পষ্ট চোখে পড়ে যে, উলামায়ে কেরামের মধ্যে এমনকি তরুণ আলেমদের মধ্যেও ইলমী ও গবেষণাধর্মী উন্নতি লাভ করছে। নতুন নতুন কিতাব জনসম্মুখে আসছে। আলেমদের মধ্যে গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সফরকালে অনেক আলেম ও লেখক তাদের লিখিত যেসব কিতাব আমাকে হাদিয়া দেন, সেগুলো একত্রিত করলে নিঃসন্দেহে কয়েক আলমারী ভরে যাবে। আমার নিকট এছাড়া অন্য কোন পথ ছিলো না যে, আমি সেগুলোর মধ্য থেকে আমার প্রয়োজনীয় কিতাবসমূহকে বাছাই করে সেগুলোকে কার্গোযোগে করাচী পাঠিয়ে দেই। অবশিষ্ট কিতাবসমূহ থেকে ভাসা ভাসাভাবে জ্ঞানার্জন করে সেগুলোকে সেখানেই বিতরণ করে দিই। মোটকথা, এখানকার মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা আমি পূর্বের চেয়ে অনেক উন্নত দেখতে পাই। যা অত্যন্ত আশাব্যাঞ্জক। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বদনজর থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

জর্দান সফর

(শাওয়াল, ১৪৩১ হিজরী, সেপ্টেম্বর, ২০১০ ঈসায়ী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَا لَمِيْنَ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান সত্তার, যিনি এ বিশ্বজগতকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এবং দরূদ ও সালাম তাঁর শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর, যিনি পৃথিবীতে সত্যের বাণী সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

জর্দানে আমার ইতিপূর্বের দুই সফরের ইতিবৃত্ত 'উহুদ থেকে কাসিউন' সফরনামায় লিখেছি। 'জাহানে দীদাহ'র মধ্যে তা প্রকাশিত হয়েছে। এর পরেও সেখানে বার বার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। তবে শাওয়াল ১৪৩১ হিজরীতে জর্দানে আমার যে সফর হয়, সেখানে দু'টি বিষয় নতুন জানতে পারি। বক্ষমান প্রবন্ধে সংক্ষেপে তা পাঠকসমীপে তুলে ধরছি।

জর্দান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় 'মুয়াসসাসাতু আলিল বাইতি লিল ফিকরিল ইসলামী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যার প্রধান ব্যক্তি শাহযাদা গাযী বিন মুহাম্মাদ (জর্দানের বাদশা মালিক আব্দুল্লাহর চাচাতো ভাই ও বিশেষ উপদেষ্টা)। তিনি অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব। আমার আরবী ও ইংরেজী কিতাবসমূহের সুবাদে আমাকে দূর থেকে চেনেন শুধু তাই নয়, বরং অত্যন্ত মহব্বতও করেন। তাঁর সঙ্গে পত্রযোগাযোগও রয়েছে। তিনি কয়েক বছর ধরে এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে দাওয়াত দিয়ে আসছেন। কিন্তু আমি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে সে সব অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারিনি। এবার শাওয়াল মাসে তিনি সে প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে 'ইসলাম ও পরিবেশবাদ' বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঘটনাচক্রে আমার জন্যে এ সময় যাওয়া সহজ ছিলো। আমি 'পরিবেশবাদ' বিষয়ে শাস্ত্রীয় তথ্যও সংগ্রহ করতে চাচ্ছিলাম। আমার কিছু আরবী কিতাব ছাপার বিষয়ে জরুরী

কাজও ছিলো। এ সব কারণে আমি সেখানে অংশ গ্রহণের নিয়ত করি। ১৫ শাওয়াল শনিবার দুপুরে আম্মান পৌঁছি।

সেই বৃক্ষটি

বিকাল পাঁচটায় শাহযাদা গাযী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে হোটেলে আসেন। বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার মাঝে তিনি বলেন যে, জর্দানের সেই জায়গা আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিশোর বয়সে চাচা আবু তালেবের সঙ্গে তাশরীফ এনেছিলেন। যেখানে বুহাইরা পাদ্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিলো। সেখানে ঐ বৃক্ষটি এখনো রয়েছে, যার ছায়ায় নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছিলেন। আপনি যদি আমার সঙ্গে সেখানে যেতে চান তাহলে আমি আপনাকে নিয়ে যাবো। আমার জন্যে এটি ছিলো অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। আমি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে এ দাওয়াত কবুল করি। সুতরাং সম্মেলন শেষ হতেই শাহযাদা গাযী আমাকে একটি সামরিক বিমানবন্দরে নিয়ে যান। সেখানে একটি বড়ো হেলিকপ্টার প্রস্তুত ছিলো। তাতে প্রায় দশজন মানুষের বসার ব্যবস্থা ছিলো। শাহযাদার সঙ্গে তার পরিবারের কিছু শিশুও ছিলো। আমি ছাড়া নতুন শাইখুল আযহার আহমাদ আত তাইয়্যেব, মিসরের মুফতী আলী জুমুআ এবং শাহযাদার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার লোকেরাও হেলিকপ্টারে আরোহণ করে। হেলিকপ্টার আম্মান থেকে উত্তরদিকে সফর করে প্রায় পঞ্চাশ মিনিটে গন্তব্যে পৌঁছে। পুরো পথটি ছিলো লতাপাতাশূন্য মরুভূমি। যার মধ্যে কোথাও কোথাও ছোট ছোট শুষ্ক টিলা এবং মাটির সাথে লেপটানো ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড় অবশ্য চোখে পড়ে। সেগুলোও রোদে পুড়ে ঝলসানো ছিলো। পঞ্চাশ মিনিটের সফরের পর হেলিকপ্টার যখন অবতরণ করে, তখন আদিগন্ত বিস্তৃত বালুকাময় মরুপ্রান্তরের মাঝখানে একটি সবুজ-শ্যামল বৃক্ষ চোখে পড়ে। কুলকিনারাহীন এ মরুভূমিতে যা ভাস্বর হয়ে দেখা দিচ্ছিলো। ধারণা করা হচ্ছে যে, এর ছায়াতেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ এনেছিলেন।

প্রথমে সংক্ষেপে ঘটনাটি বর্ণনা করা মোনাসেব মনে করছি। ঘটনাটি হাদীস ও সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। জামে তিরমিযীতে শক্তিশালী সনদে হযরত আবু মূসা আশআরী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াত লাভের পূর্বে তাঁর চাচা আবু তালেব কুরাইশের আরো কিছু গুরুজনের সাথে সিরিয়া সফরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর সাথে ছিলেন। (মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ.-এর বর্ণনায় আছে যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর সাথে যাওয়ার জন্যে ইচ্ছা প্রকাশ

করেছিলেন। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. 'আস সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ' ১/১৪০-এ লিখেছেন, তখন তাঁর বয়স বারো বছর ছিলো।) যখন তাঁরা সিরিয়া অঞ্চলে পৌঁছেন, তখন সেখানে এক খ্রিস্টান পাদ্রীর (গীর্জার) নিকট যাত্রা বিরতি করেন। (মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক রহ.-এর বর্ণনায় সে পাদ্রীর নাম বুহাইরা বর্ণনা করা হয়েছে)

এ বিষয়ে সব বর্ণনা একমত যে, সিরিয়ায় সফরকালে কুরাইশের লোকেরা ইতিপূর্বেও এই পাদ্রীর নিকট দিয়ে অতিক্রম করতো, কিন্তু ইতিপূর্বে কখনো তিনি নিজের গীর্জা থেকে বের হতেন না বা তাদের দিকে মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু এবার যখন তারা এখানে যাত্রা বিরতি করে, তখন এই পাদ্রী তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাত ধরে বলতে আরম্ভ করেন- 'ইনি সারা জাহানের সরদার, ইনি রাব্বুল আলামীনের পয়গম্বর, যাঁকে আল্লাহ তাআলা রহমাতুল লিল আলামীন বানিয়ে পাঠাবেন।'

কুরাইশের লোকেরা জিজ্ঞাসা করে- আপনি কী করে তা জানতে পারলেন?

পাদ্রী বলেন- তোমরা যখন সামনের প্রান্তরে এলে, তখন প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথর তাঁকে সিজদা করছিলো। বৃক্ষ ও পাথর নবী ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করে না। তাছাড়া আমি তাঁকে 'মহরে নবুয়াত' দ্বারা চিনতে পারছি। যা তাঁর কাঁধের হাড্ডির নিচে আপেলের ন্যায় বিদ্যমান রয়েছে। তারপর তিনি কাফেলার লোকদের জন্যে খাবার তৈরী করেন। তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আছে যে, তিনি খাবারগুলো বৃক্ষের নিকটে নিয়ে আসেন। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চরাতে গিয়েছিলেন। তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন সবাই গাছের ছায়ার নিচে বসে পড়েছে। গাছের ছায়ায় বসার মতো আর কোন জায়গা ছিলো না। কিন্তু নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলে গাছের ডাল ঝুঁকে গিয়ে তাঁকে ছায়া করে দেয়। তখন পাদ্রী সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, দেখো! গাছ তাঁর দিকে ঝুঁকে গিয়ে ছায়া করে দিচ্ছে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন- এঁর অভিভাবক কে? লোকেরা বলে- আবু তালেব। তখন পাদ্রী আবু তালেবের নিকট জোর দাবি জানান যে, আপনি তাঁকে সম্মুখে নিয়ে যাবেন না। কারণ, রোমের লোকেরা তাঁকে চিনতে পারলে হত্যা করে ফেলবে। তখন হযরত আবু বকর রাযি. তাঁকে হযরত বেলাল রাযি.-এর সঙ্গে ফেরৎ পাঠিয়ে দেন।

(জামে তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, বাবু বাদয়ি নুবুয়্যাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাদীস নং- ৩৬২০)

তিরমিযী শরীফের এ বর্ণনার রাবীগণকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম 'সেকা' তথা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে বর্ণনার শেষাংশে উক্ত 'যখন রাহেব রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফিরে পাঠানোর পরামর্শ দেন, তখন হযরত আবু বকর

রাযি. ঐ কাফেলায় ছিলেন। তিনি হযরত বেলাল রাযি.-এর সঙ্গে তাঁকে ফেরৎ পাঠান।' এ অংশটিকে মুহাদ্দিসীনে কেরাম নিশ্চিতভাবে ভুল আখ্যা দিয়েছেন। কারণ, যে সময়ের এ ঘটনা, তখন হযরত বেলাল রাযি.-এর হয় জন্মই হয়নি। না হয় তিনি এতো ছোট ছিলেন যে, তার সঙ্গে ফেরৎ পাঠানোর প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযি. তাঁকে ক্রয় করেছিলেন তাঁর ইসলাম গ্রহণ করার পর। আর এ ঘটনা ঘটেছিলো হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের অনেক পূর্বে। এ কারণে কেউ কেউ এ বর্ণনাকে বিশুদ্ধ মানতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু কতিপয় মুহাদ্দিস যেমন হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন- এ কারণে পুরো বর্ণনাকে ভুল বলা ঠিক নয়। কারণ, হাদীসের সনদ শক্তিশালী। তবে শেষাংশে কোন রাবীর 'ওয়াহাম' হয়েছে বলে মনে হয় (তুহফাতুল আহওয়াযী, ১০/৯৩)

সহীহ বর্ণনাসমূহের মধ্যে এধরনের আংশিক ভুল অনেক সময় হয়ে থাকে। বর্ণনার মূল বক্তব্যের উপর তার কোন বিরূপ প্রভাব পড়ে না। এ কারণে পুরো বর্ণনাকে ভুল বলা যায় না। এই একই বর্ণনা মুসনাদে বাযযারের মধ্যেও এসেছে। সেখানেও ঘটনার বিবরণ সেভাবেই বর্ণিত হয়েছে, যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তিরমিযী শরিফে। কিন্তু সেখানে 'হযরত আবু বকর রাযি. হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত বেলাল রাযি.-এর সঙ্গে ফেরৎ পাঠান' কথাটি নেই।

(মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আব মুসা আল আশায়ারী, ১/৪৬৭, হাদীস নং ৩০৯৬)

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাকের বিভিন্ন বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বিবৃত হয়েছে যে, কাফেলাটি যখন বুহায়রা রাহেবের গীর্জার নিকট পৌঁছে, তখন বুহায়রা দেখেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একটি মেঘখন্ড ছায়া বিস্তার করে আছে। গাছের ডালও তাঁর দিকে ঝুঁকে আছে। এটি দেখে বুহায়রার অন্তরে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হয়। তিনি কফেলার লোকদের দাওয়াত দিয়ে বলেন- আমি আপনাদের জন্যে খাবার তৈরী করেছি, আপনারা সবাই আমার এখানে খেতে আসুন। সকলেই আসলো। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন না। বুহাইরা লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনাদের সকল সাথী এসেছে কি? তারা বললো- সবাই এসেছে, তবে অল্প বয়স্ক একটি ছেলে হাওদার মধ্যে রয়ে গেছে। বুহাইরা পীড়াপীড়ি করে তাকে ডেকে আনালেন। তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনেক প্রশ্ন করলেন। তাঁর পবিত্র কাঁধে নবুয়তের মোহর দেখতে পেলেন। আবু তালেবকে জিজ্ঞাসা করলেন এ ছেলে আপনার কী হয়? আবু তালেব বললেন- এটি আমার ছেলে। বুহায়রা রাহেব বললেন- এটি আপনার ছেলে নয়। তার বাবা জীবিত থাকতে পারে না। তখন আবু তালেব বললেন যে- এটি আমার ভাতিজা। তাঁর মা-বাবার

ইনতিকাল হয়েছে। বুহায়রা তখন পরামর্শ দিলেন যে, আপনি 'এঁকে ফেরত নিয়ে যান'। ইহুদীদের হাত থেকে এঁকে হেফাজত করুন। আবু তালেব নিজে তখন তাঁকে ফেরত আনলেন। (সীরাত ইবনে হিশাম, ১/১৮২-১৮৩)

হাফেয ইবনে আসাকির রহ. তারীখে দামেস্কের মধ্যেও ঘটনাটি সমস্ত সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কিছু রয়েছে তিরমিযীর বর্ণনার অনুরূপ, আর কিছু রয়েছে ইবনে ইসহাকের বর্ণনার অনুরূপ। (তারীখে ইবনে আসাকির, ৩/৪-১২)

যাইহোক, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে বর্ণনাসমূহের বিভিন্নতা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে সমস্ত বর্ণনা একমত যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সফরে বুহায়রা রাহেবের গীর্জার একটি গাছের নিকটে অবস্থান করেছিলেন। এবং গাছের ডালগুলো তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো। এছাড়াও তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের আরো কিছু আলামত দেখতে পান। যে কারণে তিনি কাফেলার লোকদেরকে দাওয়াত দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে তিনি শেষ নবীরূপে চিনতে পেরে আবু তালেবকে তাঁকে ফেরত পাঠানোর পরামর্শ দেন। মূলত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবীরূপে আগমন করার সংবাদ তাওরাত ও ইঞ্জীলে সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছিলো। অনেক বিকৃতি সত্ত্বেও বাইবেলে আজও কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। সেসব ভবিষ্যদ্বাণীর লক্ষ্য হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। হযরত মাওলানা রহমতুল্লাহ সাহেব কীরানবী রহ. তাঁর 'ইযহারুল হক' কিতাবে সেগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ 'বাইবেল সে কুরআন তক' নামে উর্দুতে তার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আরো অনুমিত হয় যে, এ সব ভবিষ্যদ্বাণী ছাড়াও বিভিন্ন নবী মৌখিকভাবেও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক আলামতের কথা বলে গেছেন, যা বংশপরম্পরায় আহলে কিতাবের নিকট মুখস্থাকারে সংরক্ষিত হয়েছে। একথাও প্রমাণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পূর্বে আহলে কিতাবগণ শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। মূর্তিপূজারীদের সাথে তাদরে যুদ্ধ বাঁধলে তাঁকে দ্রুত প্রেরণ করার জন্যে তারা আল্লাহ তাআলার নিকট দুআ করতো। কুরআনে কারীমে সূরায়ে বাকারার ৮৯ নং আয়াতে এ কথা বর্ণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় বুহায়রা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমস্ত আলামত প্রত্যক্ষ করে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে, ইনিই শেষ নবী।

শাহযাদা গাযী বলেন- সেই বৃক্ষটি কোন্ জায়গায় ছিলো তা উদ্ঘাটনের জন্যে বাদশাহের পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ঐতিহাসিক

নিদর্শনসমূহ যাচাই করার তিনি আমাকে নির্দেশ দেন। সুতরাং আমি সরকারের নিকট সংরক্ষিত এতদসম্পর্কিত দলিল-দস্তাবেজসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আরম্ভ করি। সম্ভবত ওসমানী খেলাফতের যুগ থেকে সংরক্ষিত এ সমস্ত দস্তাবেজের মধ্যে আমি সেই বৃক্ষের উল্লেখ পাই, যার নিচে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছিলেন। আমি আরো উল্লেখ পাই যে, সেই বৃক্ষটি এখনোও তাজা রয়েছে। দস্তাবেজের আলোকে আমি তা অনুসন্ধান করে জানতে পারি যে, কিছুদিন পূর্বে তেলের পাইপ লাইনের সার্ভে করার সময় সে সড়ক আবিস্কৃত হয়েছে, যা কোন এক বাইজেন্টাইন বদশাহ হেজাযের ব্যবসায়ীগণ যেন নিশ্চিন্তে সিরিয়া সফর করতে পারে, সে উদ্দেশ্যে বানিয়েছিলেন। এ তথ্য উদঘাটনের ফলে আমি আরো সহযোগিতা পাই। এ সড়ককে ভিত্তি বানিয়ে এতদঞ্চলের সার্ভে করলে বিরল-বিস্ময়কর এ বৃক্ষটি আবিস্কৃত হয়। যা ছিলো শত শত বর্গ কিলোমিটার ব্যাপী বিস্তৃত মরুপ্রন্তরের মাঝে একমাত্র সজীব ও সবল বৃক্ষ। সেই বৃক্ষ থেকে কিছু দূরে একটি ভবনের ধবংসাবশেষও দেখতে পাই। যা বুহায়রা রাহাবের গীর্জা হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। আশেপাশের বসবাসকারী বেদুইনদের কাছে তথ্য তালাশ করলে তারা বলে যে, আমাদের খানদানের মধ্যে একথা 'তাওয়াতুরে'র পর্যায়ে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এ বৃক্ষের নিচে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান করেছেন। এ সমস্ত দলীল-প্রমাণের আলোকে জর্দান সরকার জায়গাটি সংরক্ষণের জন্যে এর চতুর্দিকে প্রচীর তৈরী করেন। শাহযাদা গাযী প্রথম যখন এ বৃক্ষ আবিষ্কার করেন, তখন তা পুরো সজীব ছিলো। তবে ডালগুলো কিছুটা শুকিয়ে গিয়ে ছিলো। পরে যত্নের সাথে তাতে পানি দেয়া হয়। ফলে তা পরিপূর্ণ রূপে সবুজ ও সজীব হয়ে ওঠে।

সেখানে গিয়ে দেখার পর সুস্পষ্টই চোখে পড়ে যে, এটি অসাধারণ একটি বৃক্ষ। কারণ, শত শত বর্গকিলোমিটারের মধ্যে কোথাও কোন গাছের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সেখান পর্যন্ত পানি পৌঁছার কোন পথও চোখে পড়ে না। তাই এটি কোন অসম্ভব বা অবাক বিষয় নয় যে, এ বৃক্ষের মাধ্যমে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মোজেযা প্রকাশ পেয়েছিলো এবং তার ভিত্তিতে বুহায়রা রাহেব হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে শেষ নবীর অনেক আলামত দেখতে পেয়েছিলেন, যে কারণে আল্লাহ তাআলা অলৌকিকভাবে বৃক্ষটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। বিশেষ করে এ বৃক্ষ থেকে একশো মিটার দূরে এমন একটি ভবনের ধ্বংসাবশেষও রয়েছে, যার সম্মুখ ভাগ রয়েছে এই বৃক্ষের দিকে।

এ ঘটনার অবস্থানস্থল সম্পর্কে সীরাতের কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে যে, বুহায়রার সঙ্গে সাক্ষাতের এ ঘটনা সিরিয়ার বসরা শহরে ঘটেছিলো। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. ইবনে আসাকিরের উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেছেন যে, বুহায়রা

রাহেব 'কাফ্ফার' নামক একটি জনবসতিতে বাস করতেন। যা ছিলো বসরা থেকে ছয় মাইল দূরে। এখানে এ কথাটি পরিষ্কার করা ভালো যে, সে যুগে প্রত্যেক জনবসতীকে 'কাফ্ফার' বলা হতো। সেগুলোর পরস্পরকে পৃথক করার জন্যে 'কাফ্ফার' শব্দের সঙ্গে অন্য কোন শব্দ যোগ করা হতো। যেমন, 'কাফ্ফারে নাহুম'। বর্তমানেও সিরিয়া ও জর্দানের অনেক জনবসতীর নাম 'কাফ্ফার' রয়েছে।

বুহায়রার জনবসতী বসরা থেকে ছয় মাইল দূরে, একথা মেনে নেয়া হলে বৃক্ষের এ জায়গাটি বাহ্যত সে জায়গা নয়। কারণ, বসরা শহর এখান থেকে বেশ দূরে সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এ অঞ্চলের মানচিত্র দ্বারা জানা যায় যে, এখানকার সবচেয়ে নিকটবর্তী এলাকা হলো 'আযরাক'। সেখান থেকে সিরিয়ার সীমানা শুরু হয়। তারপর প্রথম শহর হলো বসরা। বসরা এখান থেকে কতো দূরে তা আমি যাচাই করতে পারিনি। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, এর দূরত্ব ছয় মাইলের অধিক। তবে বসরা যেহেতু সে সময় অনেক বড়ো শহর ছিলো, তাই বসরা শব্দটি ঐ শহরের জন্যেই শুধু নয়, বরং তার শহরতলীর বিস্তৃত এলাকার জন্যেও বলা হতো। তার মধ্যে 'আযরাক' এবং এ জায়গাটিও অন্তর্ভুক্ত। তারপরও নিম্নোক্ত আলামতগুলো এ আবিষ্কারের পক্ষে পাওয়া যায়।

১. হিজায থেকে সিরিয়া যেতে বানিজ্যিক কাফেলা সে যুগে যে সড়কটি ব্যবহার করতো, এ জায়গাটি তার নিকটে অবস্থিত ।

২. এটি উত্তর-পূর্বের সে দিকেই অবস্থিত, যে দিকে অবস্থিত বসরা শহর।

৩. এর মাঝে এবং বসরার মাঝে বড়ো কোন শহর নেই। 'আযরাক' ছোট একটি জনপদ।

৪. এতদঅঞ্চলের লোকদের মধ্যে এ কথা 'তাওয়াতুরে'র পর্যায়ে প্রসিদ্ধ যে, এটি সেই বৃক্ষ, যার নিচে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম করেছিলেন।

৫. এ লতাগুল্মহীন ঊষর মরুপ্রান্তরে এ বৃক্ষটি সজীব থাকা নিশ্চয়ই একটি অসাধারণ ঘটনা।

৬. এ বৃক্ষের নিকটেই এখনো পর্যন্ত একটি পুরাতন গীর্জার ভাগ্নাবশেষ রয়েছে।

৭. শাহযাদা গাযী পুরাতন দলিল-দস্তাবেজে এ জায়গার যে আলামত পেয়েছেন, তা এ আবিষ্কারের সঙ্গে মিলে যায়।

৮. সুদূর বিস্তৃত গাছের শিকড় এর প্রাচীনতার আলামত বহন করে।

এ সব কারণে চূড়ান্ত নিশ্চিত হওয়া যায় না ঠিক, তবে জোরালো সম্ভাবনা অবশ্যই রয়েছে যে, এটিই সে বৃক্ষ। আর এ জোরালো সম্ভাবনা একজন প্রেমিকের চোখকে শীতল করার জন্যে যথেষ্ট। সুতরাং আমরা ঐ বৃক্ষ

যিয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করি। এটি একটি পেস্তা বৃক্ষ। শাহযাদা গাযী বললেন, এতে এখনো পেস্তা ধরে। আমি তা খেয়েছি। গাছের ছায়া এমনিতেও মনোমুগ্ধকর হয়ে থাকে, কিন্তু কল্পনার চোখ এখানে যে হৃদয়-প্রেমাস্পদকে উদ্ভাসিত দেখতে পায়, তা এ ছায়ার মধ্যে এমন মাধুর্য সৃষ্টি করে, যা অন্য কোথাও হতে পারে না।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

এ বৃক্ষ ও তার পরিবেশে কিছু সময় কাটানোর পর আছরের নামাযের সময় হয়ে যায়। আল্লাহর মেহেরবানীতে এর ছায়াতেই আছরের নামায আদায়ের তাওফীক লাভ হয়। নামায ও দুআর পর আমরা পুনরায় হেলিকপ্টারে করে আম্মানে ফিরে আসি।

দ্বিতীয় আবিষ্কারঃ

হেরাক্লিয়াসের নিকট রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র

মুসলমানদের সিরিয়া বিজয় সম্পর্কে এ পর্যন্ত যেসব কিতাব আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গবেষণামূলক কিতাব সেটি, যা সাম্প্রতিক কালের এক গবেষক আহমাদ আদিল কামাল 'আত্ তরিক ইলা দামেশক' নামে লিখেছেন। ১৪০০ হিজরী সনে 'দারুন নাফাইস' বৈরুত থেকে প্রথমবার তা প্রকাশিত হয়। এর লেখক একজন সমরবিদ। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রম করে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহকে যাচাই-বাছাই করেছেন। নকশার মাধ্যমে পুরো বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। জর্দানের এ সফরেই আমার ইয়ারমুক যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। ময়দানটি আরবাদ শহরের নিকটে জাওলান পাহাড়সারির সম্মুখে অবস্থিত। এবার যেহেতু আমি ঐ কিতাবটি পড়েছিলাম, তাই রণাঙ্গনের চিত্র বুঝতে তার দ্বারা খুব সহযোগিতা পাই।

কিতাবটি অধ্যয়নকালে আমি (তার ১৩৮ পৃষ্ঠায়) দেখেছিলাম যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের নিকট যে পত্র লিখেছিলেন, তার সে মূলপত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে। তিনি লিখেছেন- এক শাহী খান্দানের আরব মহিলা লন্ডনে বাস করতেন। তিনি দাবি করেছিলেন যে, হেরাক্লিয়াসের নামে লেখা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রটি তার নিকট সংরক্ষিত আছে। যা বংশানুক্রমে তার খান্দানের মধ্যে চলে আসছে। তিনি এ শর্তে তা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেন যে, কোন মুসলমান শাসক ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি যেন এতে হস্তক্ষেপ না করে। তার এ দাবি শুনে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংস্কৃতি বিষয়ক উপদেষ্টা মিসরীয় বংশোদ্ভূত ডঃ ইযযুদ্দীন সরকার ঐ মহিলার নিকট যান এবং চিঠির মৌলিকত্ব যাচাই করার জন্যে বিভিন্ন

বৈজ্ঞানিক পন্থা অবলম্বন করেন। যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটি আসল চিঠি। এর পক্ষে তিনি নিম্নোক্ত প্রমাণসমূহ তুলে ধরেন-

১. চিঠির বক্তব্য আদ্যপান্ত তাই, যা হাদীস ও ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে উল্লেখ রয়েছে।

২. বিভিন্ন প্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জানা যায় যে, পত্রটি যে চামড়ায় লেখা হয়েছে, তার শোধন সেই প্রাচীন পদ্ধতিতে করা হয়েছে, যা হিজরী প্রথম শতব্দীতে প্রচলিত ছিলো। চামড়া শোধনের অধিকতর শক্তিশালী পদ্ধতি হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত হয়। যেমন বৃটিশ যাদুঘরে সংরক্ষিত বিভিন্ন দলিল-দস্তাবেজ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়। এই চামড়ার শোধন পদ্ধতি এ রকম নয়।

৩. বেগুনি রশ্মি ফেলে দেখা হলে তার কালি অনেক পুরাতন বলে প্রমাণিত হয়। তাছাড়া একথাও প্রমাণিত হয় যে, এই চামড়ার উপর এ চিঠির 'ইবারত' ছাড়া অন্য কিছু লেখা হয়নি।

৪. কালির উপাদান পৃথক করায় এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কালি অত্যন্ত গাঢ়। এখনো তা স্পষ্টভাবে পড়া সম্ভব। এটি সেই কালি, যা সে যুগে অন্যান্য লেখনীতে ব্যবহার হতো। যার অনেক সাক্ষী এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

ডঃ যায়েদ এসব গবেষণা চালিয়েছেন। তিনি চামড়া গবেষণা ও তার বিশ্লেষণে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেন যে, এ চামড়ার বয়স কম পক্ষে এক হাজার বছর। (অর্থাৎ, এক হাজার বছরের অধিক হতে পারে, কম নয়।)

ঐ কিতাবের মধ্যে কথাটি পড়েছিলাম ঠিক, কিন্তু আমার জানা ছিলো না যে, এখন চিঠিটি কোথায় এবং কার কাছে রয়েছে। তবে জর্দানের এ সফরে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদেরকে জর্দানের ঐতিহাসিক নিদর্শনের পরিচয়সম্বলিত একটি পুস্তিকা দেয়া হয়। তাতে লেখা ছিলো যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ পবিত্র চিঠি এখন জর্দান সরকারের নিকট রয়েছে। জর্দান সরকার একটি যাদুঘরে তা সংরক্ষণ করেছেন। আমি চিঠিটি দেখতে আগ্রহী হয়ে শাহযাদা গাযীর নিকট এ বাসনা প্রকাশ করি। কিন্তু তিনি বলেন যে, চিঠিটি এখনো আমরা সাধারণভাবে দেখানোর জন্যে খুলতে পারিনি। (কারণ, তা সংরক্ষণের জন্যে আরো কিছু কাজ হচ্ছে) এ কারণে এ সফরে তার যিয়ারত সম্ভব হয়নি। তবে এটি গবেষকদের কাজের একটি ময়দান। যখন তা সামনে আসবে, তখন এর সম্পর্কে তারা নিজেদের গবেষণার ফলাফল উম্মতকে অবহিত করবেন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী রচিত সফরনামার অন্যান্য খণ্ড

আমার দেখা পৃথিবী-১

ফোরাত নদীর তীরে

[দক্ষিণ আফ্রিকা, সৌদী আরব, ইরাক, মিসর ও আলজিরিয়ার ঐতিহাসিক সফরনামা]

আমার দেখা পৃথিবী-২

উহুদ থেকে কাসিয়ুন

[সৌদী আরব,জর্দান ও সিরিয়ার ঐতিহাসিক সফরনামা]

আমার দেখা পৃথিবী-৩

হারানো ঐতিহ্যের দেশে

[তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ কাতার ও চীনের ঐতিহাসিক সফরনামা]



মাকতাবাতুল আশরাফ
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
রচিত সফরনামার অন্যান্য খণ্ড

আমার দেখা পৃথিবী-৪

অমুসলিম দেশে মুসলিম পর্যটক

[আমেরিকা, ব্রিটেন, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা কানাডা
ও ফ্রান্সের ঐতিহাসিক সফরনামা]

আমার দেখা পৃথিবী-৫

দুনিয়াজোড়া বিস্ময়কর সফর

[স্পেন, ব্রুনাই, তুরস্ক, রি ইউনিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা
কাতার, হল্যান্ড, কানাডা, আমেরিকা, ওয়েস্টইন্ডিজ
সৌদী আরব ও কেনিয়ার বিস্ময়কর সফরনামা]

আমার দেখা পৃথিবী-৬

রাতের সূর্য

[কানাডা, আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড
ইয়েমেন, মালয়েশিয়া, নরওয়ে, সুইডেন ও
ফিনল্যান্ডের বিস্ময়কর সফরনামা]

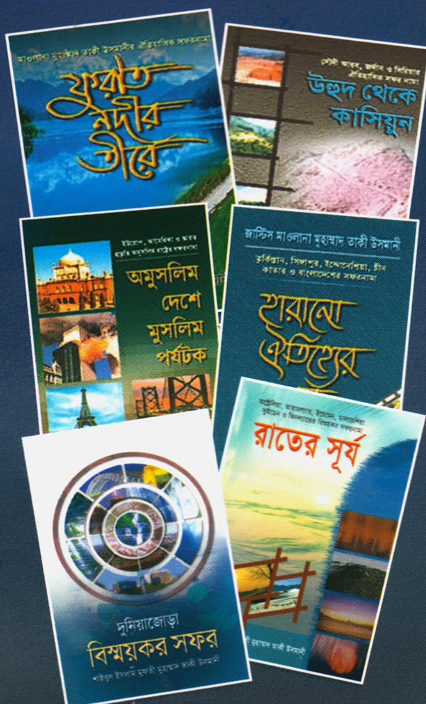


মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৮৮-০২-৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী রচিত অনবদ্য কয়েকটি গ্রন্থ

মাকতাবাতুল আশরাফ কর্তৃক প্রকাশিত
আপনার সংগ্রহে রাখার মত কয়েকটি গ্রন্থ





মাকতাবাতুল আশরাফ

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫ ৭৮৫
ই-মেইল: support@maktabatulashraf.net
ওয়েব সাইট: www.maktabatulashraf.net